http://thejobstudy.com

বিসিএস, ব্যাংক, এমবিএ ভর্তিসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য বই, নোটস ও আনুষঙ্গিক তথ্যাদি পাওয়ার এক নির্ভরযোগ্য প্লাটফর্ম। প্রতিদিনই থাকছে অন-লাইনে Random basis এ নিজেকে যাচাই করার জন্য পরীক্ষা ও মেধা-যাচাইয়ের ব্যবস্থা। প্রতিমাসের শেষে থাকছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের উপর টেস্ট। নিজে অংশগ্রহণ করুন এবং শেয়ার করে আপনার বন্ধুকেও অংশগ্রহণের সুযোগ দিন। আপনার facebook চালু থাকা অবস্থায় Connect with social media থেকে facebook আইকনে ক্লিক করে সহজেই Registration করে নিতে পারবেন। "Follow" বাটনে ক্লিক করে এই সাইটের প্রতিদিনের আপডেট জানতে পারবেন। প্রতিদিনই আসবো নতুনরূপে। সাইটটি ওপেন করতে উপরের লিংকে অথবা লোগোতে ক্লিক করুন।

প্লাটফর্মটির উন্নয়ণের জন্য আপনার সুচিন্তিত মতামত একান্তভাবে কাম্য।

ISBN 984-410-428-9

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূলনীতি | মো: আবদুল হালিম

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূলনীতি

মো: আবদুল হালিম

http://thejobstudy.com

প্রকাশনার সাত দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

© লেখক
চতুর্থ মুদ্রণ
এপ্রিল ২০১৫
প্রথম মাওলা ব্রাদার্স সংস্করণ
১ জানুয়ারি ২০০৫
প্রথম প্রকাশ
১৯৮৪

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৯৫৮০৭৭১ ৯৫৬৮৭৭৩
ই-মেইল : mowlabrothers@gmail.com

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

কম্পোজ
বাংলাবাজার কমপিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
একুশে প্রিন্টার্স
১৮/২৩ গোপাল সাহা লেন ঢাকা ১১০০

দাম
দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

অনলাইনে বই কিনুন
www.rokomari.com/mowlabrothers
www.pora.com.bd/mowlabrothers

ISBN 984 410 428 9

ANTARJATIK SAMPARKER MULNITI : (Principles of International Relations) by Md. Abdul Halim. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers 39/1 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Qayyum Chowdhury. Price : Taka Two Hundred and Fifty only.

উৎসর্গ

আমার জান্নাতবাসিনী মায়ের
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

Job Study
To make you prepared & confident

Job Study
To make you prepared & confident

ভূমিকা

সমকালীন বিশ্বে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। একদিকে ঔপনিবেশিকতাবাদের অবসানের ফলে যেমন তৃতীয় বিশ্বে নবজাগরণের সূত্রপাত হয়েছে, তেমনি অপর দিকে প্রযুক্তিবিদ্যা ও যোগাযোগব্যবস্থার বিস্ময়কর অগ্রগতির কারণে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের, বিশেষত ক্ষুদ্র, অনগ্রসর রাষ্ট্রসমূহের ভাগ্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দ্বারা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

উক্ত পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সামাজিক বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বিষয়টি যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বিশিষ্ট স্থান লাভ করবে, তাই স্বাভাবিক। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, স্বাধীনতা লাভের তের বছর পরেও আমরা এ-ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হই নি। যা হোক আমি আনন্দিত যে, আমার স্নেহভাজন ছাত্র ও বর্তমান সহকর্মী মোঃ আবদুল হালিম 'আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূলনীতি' শীর্ষক পুস্তকটি প্রণয়ন করে আমাদের এ-দীনতা আংশিকভাবে লাঘবের চেষ্টা করেছে। আমি এ জন্য তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমাদের দেশে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূলনীতি ও তত্ত্ববিষয়ক কোন পুস্তক ইংরেজি অথবা বাংলায় এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি। এ-দিক দিয়ে বিবেচনা করলে বর্তমান গ্রন্থকে এ-ক্ষেত্রে পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। গ্রন্থটিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রাথমিক ধারণাগুলোর ব্যাখ্যাসহ রয়েছে বিষয়টির বিভিন্ন তত্ত্বের আলোচনা ও বিশ্লেষণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির উপযোগী করে এটি প্রণীত হলেও স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ পাঠকেরাও এতে উপকৃত হবেন বলে আমার বিশ্বাস। আমি লেখকের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

নূরুল মোমেন
সহযোগী অধ্যাপক
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কলাভবন
১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৪

http://thejobstudy.com

Job Study
To make you prepared & confident

মাওলা ব্রাদার্স সংস্করণের ভূমিকা

ব্র্যাক প্রকাশনা থেকে ১৯৮৪ সনে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থার সহযোগিতায়) প্রথম সংস্করণ, ১৯৯০ সনে দ্বিতীয় মুদ্রণ ও ১৯৯৫ সনে দ্বিতীয় সংস্করণ বের হবার পর একাদিক্রমে প্রায় সবগুলো কপি বিক্রি হয়ে যাবার ফলে ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ পাঠিকা/পাঠকের চাহিদার কথা বিবেচনা করে *আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূলনীতি* শীর্ষক গ্রন্থটির আরো অধিক কপি ছাপানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু যেহেতু ব্র্যাক কর্তৃপক্ষ পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম আপাতত স্থগিত করে দেয়, তাই আমাকে বাধ্য হয়ে অন্য প্রকাশনা সংস্থার সাহায্য নেবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হয়। এমতাবস্থায় এ দেশে পাঠ্যপুস্তকসহ অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশনার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী মাওলা ব্রাদার্স বর্তমান গ্রন্থটির নতুন সংস্করণ বের করতে আগ্রহ প্রকাশ করে বিধায় আমিও সঙ্গে-সঙ্গে রাজি হয়ে যাই। এ ছাড়াও, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিগত সিকি শতাব্দীতে, বিশেষত গত এক দশকে, তত্ত্বীয় গবেষণায় যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, যা সহজে বোধগম্য কারণে পূর্ববর্তী দুটো সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি, সেগুলো এ নতুন সংস্করণটিতে সন্নিবেশিত করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। অধিকন্তু, পূর্বের লেখা অধ্যায়গুলোতে যে সকল জায়গায় খানিকটা অপূর্ণতা ছিল বলে আমার মনে হয়েছে, সেখানেও আমি আমার সাধ্যমত নতুন নতুন তথ্য ও বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্তিকরণের চেষ্টা করেছি।

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় "আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বিশ্লেষণের পর্যায়সংক্রান্ত সমস্যা" শীর্ষক অধ্যায়ের কথা যেখানে আমি মোটামুটি ব্যাপক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিয়েছি যার ফলে এটি অনেকটা নতুনভাবে লিখিত বলে মনে হতে পারে। এরপর "আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠে বিভিন্ন পদ্ধতি" শীর্ষক অধ্যায়ের *দার্শনিকগণ ও তাঁদের*

মতবাদ উপ-শিরোনামে আমি আরও কয়েকজন বিশিষ্ট দার্শনিক, যথা কৌটিল্য, হবস, রুশো (তাঁর সম্পর্কে নতুন অন্তর্দৃষ্টি যোগ করা), কান্ট (তাঁর চিন্তাধারা সম্পর্কেও নতুন পরিপ্রেক্ষিত সন্নিবেশ করা), ও নরম্যান অ্যাঞ্জেলের উপর আলোকপাত করেছি। এ ছাড়াও এ অধ্যায়ের *বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি* উপ-শিরোনামে এ পদ্ধতিটির অধিক সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এরপর "জাতীয় শক্তি" শীর্ষক অধ্যায়ে শক্তির সংজ্ঞা প্রদানে কার্ল ডয়েস ও রবার্ট ডাহ্‌লের অভিমত সংযোজন করা হয়েছে। এ ছাড়াও জাতীয় শক্তির উপাদান সম্পর্কেত আলোচনা, এবং *সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর সংখ্যার* গুরুত্ব বুঝার ব্যাপারে খানিকটা আলোচনা যুক্ত হয়েছে। এভাবে "শক্তিসাম্য" শীর্ষক অধ্যায়েও কিঞ্চিৎ নতুন তথ্য যোগ করা হয়েছে। কিন্তু "ক্রীড়াতত্ত্ব" শীর্ষক অধ্যায়টিতে ব্যাপক তথ্যের পাশাপাশি অন্তর্দৃষ্টিও সংযুক্ত করার ফলে এটিও নতুনভাবে লিখিত হয়েছে বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। আবার "শক্তি পরিবর্তন তত্ত্ব" শীর্ষক অধ্যায়ে অরগানস্কির একটি ধ্রুপদী বিবৃতি যুক্ত করা হয়েছে। অতঃপর "সিস্টেম তত্ত্ব" শীর্ষক অধ্যায়ে এ তত্ত্বটিতে বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন এমন একজন পণ্ডিত মরটন কাপলানের উদ্ভাবিত ছয়টি বৈকল্পিক মডেলের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যা গ্রন্থটির পূর্বের সংস্করণ দুটোতে থাকা উচিত ছিল কিন্তু আমার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তখন তা করা হয়নি। এ ছাড়াও এ অধ্যায়টিতে মেরুসংখ্যা ও যুদ্ধের মধ্যে সম্বন্ধ সন্ধানকারী কয়েকজন পণ্ডিতের গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলেরও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। এরপর "সংহতি তত্ত্ব" শীর্ষক অধ্যায়ে নিরাপত্তা সম্প্রদায়ের উপর আলোচনা ও আঞ্চলিক সংহতির উপকার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। এভাবে "পার্শ্বীয় চাপ তত্ত্ব" শীর্ষক অধ্যায়ে এ তত্ত্বটির মূল বক্তব্যের উপর অতি সংক্ষিপ্ত মন্তব্যসহ এটির মডেলের চিত্র সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আর "পররাষ্ট্রনীতি" শীর্ষক অধ্যায়ে যথাক্রমে জাতীয় স্বার্থের গুরুত্ব সম্পর্কে হিউজের চমৎকার মন্তব্য, পররাষ্ট্রনীতির সার্বিক উদ্দেশ্যাবলি এবং বাংলাদেশের পক্ষে কতটুকু লক্ষ্য নির্ধারণ সম্ভব এতদ্‌সম্পর্কিত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরিশেষে "আন্তর্জাতিক সমাজের মাধ্যম ও প্রতিষ্ঠান" শীর্ষক অধ্যায়ে *আন্তর্জাতিক নৈতিকতা* উপ-শিরোনামের মধ্যে নৈতিকতা ও বিশ্ব জনমত সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্ত মতামত যোগ করা হয়েছে। এ ছাড়াও, আমার প্রাক্তন ছাত্র ও ভূতপূর্ব সহকর্মী জনাব ভূমিত্র চাকমা লিখিত "ভূ-রাজনীতি" শীর্ষক অধ্যায়টিতে, যেটি গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, কমপক্ষে দুজন ভূ-রাজনীতিবিদের নামের বাংলা বানানে যে ত্রুটি ছিল তা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং সেখানে ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বের একটি মানচিত্রও সংযুক্ত করা হয়েছে।

এরপর গ্রন্থটির বর্তমান সংস্করণের জন্য নতুনভাবে লিখিত চারটি অধ্যায় সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক। প্রথমত, একাদশ অধ্যায়ে "সনাতনপন্থা, আচরণবাদ ও উত্তর-আচরণবাদ"-এর উপর আলোকপাত করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সংস্করণ দুটিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠের সূচনা ও অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনায় এগুলোর উল্লেখ করা হলেও তখন আলাদাভাবে এর প্রত্যেকটির উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্যের বিবরণ প্রদান করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, দ্বাদশ অধ্যায়ে "বাস্তববাদ ও নব্য-বাস্তববাদ" বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য জনাব চাকমার লিখে দেয়া, "আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বাস্তববাদ : মৌলিক ধারণাসমূহের একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক একাদশ অধ্যায়টিকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেয়া হয়েছে। তদ্‌স্থলে বর্তমান দ্বাদশ অধ্যায়টিতে ধ্রুপদী বাস্তববাদের আপাত গুরুত্ব হ্রাসের ফলস্বরূপ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এর পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে পূর্ব গৌরবকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় যারা নিজেদের নিয়োজিত করেছেন সেই নব্য-বাস্তববাদীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুজন বিশিষ্ট পণ্ডিত যথাক্রমে ওয়াল্টযের কাঠামোগত বাস্তববাদ, এবং জিলপিনের আবর্তনশীলতার ধারাবাহিকতা ও কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রসমূহের পড়ন্ত অবস্থায় পতিত হবার কারণ অনুসন্ধানের উপর ঈষৎ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয়ত, গত শতাব্দীর আশির দশকে শুরু হওয়া আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বীয় গবেষণায় যুক্ত নতুন ধারা, যেটি উত্তর-দৃষ্টবাদ বা উত্তর-আধুনিকতাবাদ নামে পরিচিত যা বিচারবাদের উন্মেষ ঘটায়, সম্পর্কে "আন্তর্জাতিক সম্পর্কে তত্ত্ব উন্নয়নে সাম্প্রতিক পরিবর্তনসমূহ" শীর্ষক চতুর্দশ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। মূলত ফ্রাঙ্কফুর্ট চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবান্বিত ও বহুলাংশে ফরাসি সামাজিক তাত্ত্বিকগণ কর্তৃক অনুপ্রাণিত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিচারবাদীদের প্রতিনিধিত্বকারী দুজন তাত্ত্বিক যথাক্রমে সিনথিয়া ওয়েবার এবং নারীবাদীদের অন্যতম প্রতিভূ ক্রিস্টিন সিলভেস্টারের গবেষণাকর্মের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে বিচারমূলক আন্তর্জাতিক তত্ত্বের সত্তা সম্পর্কিত মতবাদ ও জ্ঞানতত্ত্বমূলক প্রশ্নাবলির ব্যাখ্যাসহ এ তত্ত্বটির সমালোচনা উপস্থাপনা করা হয়েছে। চতুর্থত এবং সর্বশেষে, "বিশ্বায়ন" শীর্ষক ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে বর্তমানকালে বহুল আলোচিত এ প্রক্রিয়াটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশিত করে মূল বক্তব্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বগত দিক, বিশেষত বাস্তববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এটির ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে যেটিতে পাঠিকা/পাঠক এ সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তাভাবনার খোরাক পাবেন বলে লেখক আশা করে।

গ্রন্থটির এ সংস্করণটি বের করার ব্যাপারে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেকের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় আমার প্রাক্তন ছাত্রী ও বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের চেয়ারপারসন অধ্যাপক আমেনা মহসিনের নাম। ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক পরিসরে খ্যাতি অর্জনকারী আমাদের দেশের অন্যতম বিশিষ্ট এ পণ্ডিত ও গবেষক কয়েক বছর পূর্বে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে তত্ত্বীয় গবেষণার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতিসমূহ সাধিত হয়েছে তা অন্তর্ভুক্ত করে গ্রন্থটির নতুন সংস্করণ প্রকাশ করার জন্য আমাকে অনুরোধ জানানোয় আমি এ কাজে এক ধরনের বাধ্যবাধকতা, এবং আমার নিজের তরফ থেকেও অনেকটা তাগিদ অনুভব করি, বিশেষত এ কারণে যে গ্রন্থটি আমার পরলোকগত মায়ের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। এরপরে আমাদের বিভাগে এশিয়া ফেলো হিসেবে আগত

http://thejobstudy.com

বিশিষ্ট ভারতীয় গবেষক (দিল্লির *ইনস্টিটিউট ফর ডিফেন্স স্টাডিজ এ্যান্ড অ্যানালাইসেস*-এ কর্মরত) ড. স্মৃতি শিতা পাটনায়েকও শেষোক্ত বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমাকে এ কাজটি সমাপ্ত করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। আমি তাঁদের উভয়কে ধন্যবাদ জানাই। আমার আরেক প্রাক্তন ছাত্র, যিনি প্রথমে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে পড়ান ও পরে আমার সহকর্মী হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং বর্তমানে ফুলব্রাইট ফেলোশিপ নিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন, জনাব এএসএম আলী আশরাফ কয়েক মাস পূর্বে আমাকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বের উপর লেখা সম্প্রতি প্রকাশিত অতি চমৎকার একটি পুস্তকের জেরক্স কপি উপহার দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এ কথা বলাই বাহুল্য যে বর্তমান সংস্করণের জন্য চারটি অধ্যায়ই লেখার কাজে আমি উক্ত গ্রন্থটির উপর বহুলাংশে নির্ভর করেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক বন্ধুবর প্রদীপ কুমার রায়ের সাথে কয়েকটি পরিভাষা নিয়ে আলোচনা করে আমি যথার্থই উপকৃত হয়েছি। এ জন্য তাঁকে আমি জানাই বিশেষ ধন্যবাদ।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মাওলা ব্রাদার্স এ গ্রন্থটির নতুন সংস্করণ বের করার ব্যাপারে আগ্রহসহকারে এগিয়ে আসায় আমি এ কাজে হাত দেই। এজন্য এর স্বত্বাধিকারী জনাব আহমেদ মাহমুদুল হককে অশেষ ধন্যবাদ। পরিশেষে, মাওলা ব্রাদার্সের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে আমাকে সাহায্য করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থার পরিচালক বাবু শঙ্কর ভট্টাচার্য, এবং মাওলা ব্রাদার্সের পক্ষে তপন দাশ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে প্রকাশনার ব্যাপারটি দেখাশোনা করায় তাদের উভয়কেও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি।

কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১১ সেপ্টেম্বর, ২০০৪

মোঃ আবদুল হালিম

দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ

১৯৮৪ সনে প্রকাশিত হবার কয়েক বছরের মধ্যে বর্তমান গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের সমস্ত কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে একটি নতুন সংস্করণ বের করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু অন্যবিধ ব্যস্ততার কারণে ঐ সময় বইটির নবতর সংস্করণ প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। শেষে ১৯৯০ সনে গ্রন্থটির দ্বিতীয় মুদ্রণ বের হয়। ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রুশ-মার্কিন ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান, পূর্ব ইউরোপের সকল দেশে বিপ্লব সংঘটিত হবার ফলে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ থেকে এগুলোর মুক্তিলাভ, জার্মানির একত্রীকরণ প্রভৃতি। এ ছাড়া বিশ্বে পরিবেশ দূষণজনিত সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করে, যা সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ বিরাজমান। এ-পরিবর্তনসমূহের আলোকে গ্রন্থটির আরেকটি সংস্করণ বের করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে।

এই প্রয়োজনগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে গ্রন্থটিতে কয়েকটি নতুন অধ্যায় সংযোজন করি এবং একই সাথে পূর্বের অংশসমূহেও কিছু কিছু পরিমার্জন করি। যে-সকল অধ্যায় নতুন সংস্করণে যোগ করা হয়েছে, তার কিছুসংখ্যক ইতঃপূর্বে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং বাকিগুলো নতুনভাবে লেখা হয়েছে। এর মধ্যে দুটো অধ্যায় আমার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী জনাব ভূমিত্র চাকমা প্রদান করেছেন।

এ-গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায় অর্থাৎ 'বিশ্ব পরিবেশগত বিচার্য বিষয়াবলি' *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*-য় (সংখ্যা ৪৫, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩) 'ধরিত্রী সম্মেলন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। 'আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বাস্তববাদ : মৌলিক ধারণাসমূহের একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক অধ্যায়টি জনাব ভূমিত্র চাকমা কর্তৃক উক্ত

পত্রিকার একই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সপ্তদশ অধ্যায় অর্থাৎ 'সিদ্ধান্ত-প্রণয়ন কাঠামো' নিবন্ধটি 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক গবেষণায় সিদ্ধান্ত-প্রণয়ন কাঠামো ও বিষয় বিশ্লেষণ' শিরোনামে অধ্যাপক আবুল কালাম সম্পাদিত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত (সেপ্টেম্বর ১৯৯২) *সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা : পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া* নামক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এখান থেকেই 'বিষয় বিশ্লেষণ' অংশটুকু প্রথম অধ্যায়ে 'পরিশিষ্ট' হিসেবে সংযোজন করা হয়েছে। এ-অধ্যায়েই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বর্তমান তত্ত্বীয় অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনায় *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*-য় (সপ্তবিংশ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭) প্রকাশিত 'আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্ব : একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক আমার নিবন্ধ থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে। 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি' শীর্ষক অধ্যায়টি আমি নতুনভাবে লিখেছি। নবম অধ্যায়টি অর্থাৎ 'ভূ-রাজনীতি' সম্পর্কে লিখেছেন জনাব ভূমিত্র চাকমা।

এই নতুন সংস্করণে দুটো অধ্যায় প্রদান করা ছাড়াও জনাব ভূমিত্র চাকমা আমাকে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। এ জন্য আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। গ্রন্থটির বর্তমান সংস্করণ প্রকাশের ব্যাপারে ব্র্যাক আমাকে যে-অকৃত্রিম সহযোগিতা প্রদান করেছে, সে-জন্য আমি এর প্রকাশনার দায়িত্বে নিয়োজিত সকল কর্মীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থার ব্যবস্থাপক শঙ্কর ভট্টাচার্য এবারও নতুন সংস্করণটি বের করার ব্যাপারে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। সে জন্য তাঁকেও অজস্র ধন্যবাদ।

মোঃ আবদুল হালিম
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কলাভবন
আগস্ট ১৯৯৫

Job Study
To make you prepared & confident

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় ১৯–৪৫
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : এর প্রকৃতি ও পরিধি
একটি স্বতন্ত্র অধীতব্য বিষয় হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ২১
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠের সূচনা ও অগ্রগতি ২৪
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠের উদ্দেশ্য ৩৫
পরিশিষ্ট : বিষয়বিশ্লেষণ, বিষয়বিশ্লেষণ কী? ৩৭
বিষয়বিশ্লেষণে অনুসৃত পদ্ধতি ৩৮
বিষয়বিশ্লেষণের সমস্যাবলি ৪১
আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গবেষণায় বিষয়বিশ্লেষণের ব্যবহার ৪২

দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৬–৫০
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

তৃতীয় অধ্যায় ৫১–৫৫
আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বিশ্লেষণের পর্যায়সংক্রান্ত সমস্যা

চতুর্থ অধ্যায় ৫৬–৭২
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠে বিভিন্ন পদ্ধতি
ঐতিহাসিক পদ্ধতি ৫৬
দার্শনিক পদ্ধতি ৫৮
বৈজ্ঞানিক নীতি পদ্ধতি ৬৩
সিস্টেমিক পদ্ধতি ৬৪
একটি সারগ্রাহী পদ্ধতি ৬৫
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে সনাতন ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারীদের মধ্যে বিতর্ক ৬৬

http://thejobstudy.com

পঞ্চম অধ্যায় ৭৩–৯২
জাতীয় শক্তি M
ভৌগোলিক অবস্থা ৭৫ M
প্রাকৃতিক সম্পদ ৭৯ M
শিল্পসামর্থ্য ৮২ M
সামরিক প্রস্তুতি ৮২ M
জনসংখ্যা ৮৫ M
জাতীয় চরিত্র ও মনোবল ৮৭ M
সরকারের দক্ষতা ৮৮ M
কূটনৈতিক নৈপুণ্য ৮৯ M

ষষ্ঠ অধ্যায় ৯৩–১০৩
শক্তিসাম্য M
শক্তিসাম্যের প্রকারভেদ ৯৫ M
আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষায় শক্তিসাম্যের ভূমিকা ৯৬ M
শক্তিসাম্য বজায় রাখার কৌশলসমূহ ৯৮ M

সপ্তম অধ্যায় ১০৪–১১০
সমষ্টিগত নিরাপত্তা M
আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় সমষ্টিগত নিরাপত্তার ভূমিকা ১০৫ M
সমষ্টিগত নিরাপত্তা ও শক্তিসাম্যের সম্পর্ক ১০৭ M

অষ্টম অধ্যায় ১১১–১৩৩
বিশ্ব পরিবেশগত বিচার্য বিষয়াবলি M
বিশ্ব পরিবেশগত সমস্যার স্বরূপ ১১২ M
মার্কিনি ভূমিকার গুরুত্ব ১১৫ M
পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা : ধরিত্রী সম্মেলনের পটভূমি ১১৭ M
ধরিত্রী সম্মেলনে সম্পাদিত কার্যাবলি ১২০ M
ধরিত্রী সম্মেলনের সাফল্য ও ব্যর্থতা ১১২ M
ধরিত্রী সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ১২৪ M
ধরিত্রী সম্মেলনোত্তর পরিবর্তিত মার্কিনি নীতি ১২৬ M
উপসংহার ১২৮ M

নবম অধ্যায় ১৩৪–১৪৯
ভূ-রাজনীতি M
ভূ-রাজনীতি : সংজ্ঞা, উদ্ভব ও বিকাশ ১৩৫ M
ভূ-রাজনৈতিক চিন্তা এবং তত্ত্বের বিবর্তন ১৩৭ M
কয়েকজন ভূ-রাজনীতিক এবং তাঁদের তত্ত্বসমূহ ১৩৭ M
রুডলফ কিয়েলেন ১৩৮ M
আলফ্রেড টি. মাহান ১৩৯ M
হ্যালফোর্ড জে. ম্যাকাইন্ডার ১৪১ M
কার্ল হাউজহফার ১৪৪ M
নিকোলাস জে. স্পাইকম্যান ১৪৬ M
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে ভূ-রাজনীতি ১৪৭ M

দশম অধ্যায় ১৫০–১৫৬
তত্ত্ব M
আন্তর্জাতিক সম্পর্কে তত্ত্বের ভূমিকা ১৫৫ M

একাদশ অধ্যায় ১৫৭–১৬২
সনাতনপন্থা, আচরণবাদ ও উত্তর-আচরণবাদ M

দ্বাদশ অধ্যায় ১৬৩–১৭৫
বাস্তববাদ ও নব্য-বাস্তববাদ M

ত্রয়োদশ অধ্যায় ১৭৬–১৭৯
মর্গেনথুর বাস্তববাদী তত্ত্ব M

চতুর্দশ অধ্যায় ১৮০–১৮৮
আন্তর্জাতিক সম্পর্কে তত্ত্ব অধ্যয়নে সাম্প্রতিক পরিবর্তনসমূহ M

পঞ্চদশ অধ্যায় ১৮৯–১৯৯
ক্রীড়াতত্ত্ব M
ক্রীড়াতত্ত্বের চিকেন মডেল ১৯২ M
ক্রীড়াতত্ত্বের চিকেন মডেলের বাস্তব প্রয়োগ ১৯৩ M
ক্রীড়াতত্ত্বের কয়েদিদের উভয়-সংকট মডেল ১৯৫ M
ক্রীড়াতত্ত্বের কয়েদিদের উভয় সংকট মডেলের বাস্তব প্রয়োগ ১৯৭ M

ষোড়শ অধ্যায় ২০০–২০৫
শক্তিসাম্য তত্ত্ব M
শক্তি পরিবর্তন তত্ত্ব ২০২ M

সপ্তদশ অধ্যায় ২০৬–২১৭
সিস্টেম তত্ত্ব M
সিস্টেম তত্ত্ব উন্নয়নে মরটন কাপলানের অবদান ২০৮ M
শক্তির বণ্টন, মেরুসংখ্যা ও যুদ্ধ-বিগ্রহের সঙ্ঘটন ২১৩ M
সিস্টেম তত্ত্ব উন্নয়নে ম্যাকলিল্যান্ডের অবদান ২১৫ M

http://thejobstudy.com

অষ্টাদশ অধ্যায় ২১৮–২২৪

সংহতি তত্ত্ব

সংহতি তত্ত্ব কী? ২১৮
কার্ল ডয়েস ২২০
আর্নেস্ট হ্যাস ২২১
অমিতাই এটজায়নি ২২২
যোহান গালটু ২২৩

উনবিংশ অধ্যায় ২২৫–২৩৬

সিদ্ধান্ত-প্রণয়ন কাঠামো

সিদ্ধান্ত-প্রণয়ন কী? ২২৬
সিদ্ধান্ত-প্রণয়নের ধারণাগত কাঠামো—বিভিন্ন মডেল ২২৭
সংকটকালীন সিদ্ধান্ত ৩২
উপসংহার ২৩৫

বিংশ অধ্যায় ২৩৭–২৪১

পার্শ্বীয় চাপ তত্ত্ব

ধারণাগত মডেল ২৩৯
গাণিতিক মডেল ২৪০

একবিংশ অধ্যায় ২৪২–২৫২

পররাষ্ট্রনীতি

পররাষ্ট্রনীতি কী? ২৪২
জাতীয় স্বার্থ কী? ২৪৩
বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি ২৪৪
জাতীয় শক্তি সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি ২৪৭
বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিসমূহ ২৪৮
বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ২৪৯

দ্বাবিংশ অধ্যায় ২৫৩–২৬৩

আন্তর্জাতিক সমাজের মাধ্যম ও প্রতিষ্ঠান

আন্তর্জাতিক সমাজ ও এর সদস্যসমূহ ২৫৩
রাষ্ট্রীয় আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী আদর্শসমূহ ২৫৫
আন্তর্জাতিক নৈতিকতা ২৫৬
আন্তর্জাতিক আইন ২৫৮
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ২৬১

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ২৬৪–২৬৯

বিশ্বায়ন

গ্রন্থপঞ্জি ২৭০

প্রথম অধ্যায়

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : এর প্রকৃতি ও পরিধি

INTERNATIONAL RELATIONS : ITS NATURE AND SCOPE

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা করে। এই আলোচনায় জাতিরাষ্ট্রের উর্ধ্বে অবস্থিত কর্তৃত্বের (supranational authority) অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রত্যেক রাষ্ট্রই স্বাধীন ও সার্বভৌম। তারা প্রত্যেকেই একে অন্যের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে এমন কোন রাষ্ট্র নেই যে সম্পূর্ণরূপে নিজের উপর নির্ভর করে অন্যদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করতে পারে। প্রত্যেক রাষ্ট্রই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে অপর রাষ্ট্রের উপর কোন-না-কোন ব্যাপারে নির্ভরশীল। এভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা (mutual interdependence)। এ-জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রের দরকার অন্য রাষ্ট্রগুলোর সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলা। বর্তমান কালে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছে, যেন সবাই এক বৃহৎ আন্তর্জাতিক পরিবারের সদস্য। এখানে একটি কথা অনস্বীকার্য যে, নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব কোন কালেই মঙ্গলজনক নয়। অপরদিকে রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহনশীল মনোভাব তাদেরকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বসবাসের নিশ্চয়তা দেবে এবং এভাবেই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। রাষ্ট্রসমূহের এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার প্রতি দৃষ্টি রেখে দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ ইত্যাদি এড়িয়ে সহযোগিতার মাধ্যমে কীভাবে বিশ্বে শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করা যায়, সে-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নামক একটি স্বতন্ত্র অধীতব্য বিষয়ের সৃষ্টি করা হয়েছে।

এখন আমরা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে কী বুঝি তা বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তির দেয়া সংজ্ঞার আলোকে আলোচনা করব।

http://thejobstudy.com

অধ্যাপক পামার ও পারকিন্স (Norman D. Palmer and Howard C. Perkins)-এর মতে, 'বিশ্বসম্প্রদায়ের মতো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যয়নও পরিবর্তনশীল' (The study of International Relations, like the world community itself, is in transition.)[১]।

অধ্যাপক কুইন্সি রাইট (Quincy Wright) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'বিশ্বের প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ দলের আচরণের অধ্যয়নই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনাভুক্ত' (International Relations is concerned with the study of the behaviour of groups of major importance in the life of the world.)[২]। তাঁর এই সংজ্ঞায় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধিকে যথেষ্ট প্রসারিত করা হয়েছে; কারণ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দলের মধ্যে বিভিন্ন জাতি, ব্যক্তিগত ও সাংস্কৃতিক সংস্থাসমূহ এবং বেসরকারি সংগঠনগুলো ও তাদের মধ্যকার সম্পর্কও অন্তর্ভুক্ত। স্পষ্টত এ-ধরনের সব কিছু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আওতাভুক্ত হলে এগুলোকে পরিচালনা করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। সুতরাং কার্যনির্বাহের সুবিধার্থ আমরা বলতে পারি যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক শুধু স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর নিজেদের মধ্যকার এবং স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান (international organization) যেমন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (The United Nations Organization), আরব লিগ (The Arab League), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization) ইত্যাদির মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু রাষ্ট্র একটি বিমূর্ত ধারণা (abstract concept) বিধায় আমরা রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে সে-রাষ্ট্রের সরকারকে (government) স্বীকার করে নিতে পারি। এ-ব্যাপারে স্নাইডার ও তাঁর সহযোগীরা (Richard Snyder *et al.*) যথাযথই বলেছেন যে, রাষ্ট্রকে আমরা তার সরকারি সিদ্ধান্ত-প্রণেতা হিসেবে বর্ণনা করতে পারি (It is one of our basic methodological choices to define the state as its official decision-makers.)[৩]। এ-দিক থেকে বিচার করলে কোন রাষ্ট্রের বৈধ্য কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক পরিচালিত সরকারি সম্পর্কই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আওতাভুক্ত।

আদি এইচ. ডকটর (Adi H. Doctor)-এর মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রাষ্ট্রসমূহের ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও আন্তঃক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে (The study of International Relations is mainly conerned with the study of actions, reactions and interactions among certain entities, usually national States.)[৪]। এখানে ক্রিয়া বলতে কোন রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত কার্যাবলিকে বোঝাবে, যা অন্য একটি রাষ্ট্র বা আন্তর্জাতিক সংগঠনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। প্রতিক্রিয়া বলতে সাধারণত বোঝায় দ্বিতীয় রাষ্ট্র কর্তৃক প্রথম রাষ্ট্রের গৃহীত কার্যাবলির জবাবে কোন নির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ করা। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি যে, রাষ্ট্র ক যদি খ-র সীমানায় সৈন্য সমাবেশ করে, তবে খ প্রথমত ক-কে তার সীমানা থেকে সৈন্যদের সরিয়ে নিতে বলবে এবং ক যদি তাতে রাজি না হয় তবে খ পরবর্তী কর্মপন্থা

Go to Contents
http://thejobstudy.com

হিসেবে ক-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া নিয়ে ইতঃপূর্বেই কিছু তত্ত্ব ও মডেল উন্নয়ন করা হয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনাসম্পর্কিত স্টানফোর্ড দলের (Stanford group) উত্তেজনা-প্রতিক্রিয়া (Stimulus-Response) মডেল। আর রাষ্ট্রসমূহের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার যোগফলই হল তাদের মধ্যকার আন্তঃক্রিয়া।

উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি যে, দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে কোন মৈত্রীচুক্তি (alliance) থাকলে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আদান-প্রদান বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ অধিক আন্তঃক্রিয়ার সুযোগ ঘটে। অপরপক্ষে, দুটি পরস্পরবিরোধী মৈত্রীজোটও—যেমন ন্যাটো (NATO) ও ওয়ারশ চুক্তি (Warsaw Pact)—তাদের মধ্যে আন্তঃক্রিয়ার নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে কোন রাষ্ট্র তার আচরণকে বহির্বিশ্বে তুলে ধরে। রাষ্ট্রীয় আচরণ সাধারণত দুধরনের হতে পারে, যথা (১) দ্বন্দ্বমূলক আচরণ (conflict behaviour) ও (২) সহযোগিতামূলক আচরণ (cooperative behaviour)। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, কোন রাষ্ট্র কোন বিশেষ সময় কেন দ্বন্দ্বমূলক অথবা সহযোগিতামূলক আচরণ প্রকাশ করে।

পরিশেষে স্টানলি হফম্যান (Stanley Haffmann)-এর সাথে একমত হয়ে আমরা বলতে পারি যে, 'যে-সকল উপাদান এবং কার্যকলাপ বর্তমান বিশ্বের মৌলিক সত্তাগুলোর (স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ) পররাষ্ট্রনীতি ও শক্তিকে প্রভাবিত করে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সেগুলোর অধ্যয়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে।' (The discipline of International Relations is concerned with the factors and activities which affect the external policies and the power of the basic units into which the world is divided.)[৫]।

একটি স্বতন্ত্র অধীতব্য বিষয় হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (International Relations as a separate independent discipline)

আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে একটি স্বতন্ত্র অধীতব্য বিষয় হিসেবে গণ্য করা যায় কি না তা বিচার করতে গেলে প্রথমেই আমাদের জানা দরকার 'বিষয়' (discipline) বলতে আমরা কী বুঝি। ফুলার (C. Dale Fuller)-এর মতে 'বিষয় হচ্ছে এমন একটি উপাত্তের সমষ্টি যাকে প্রণালীবদ্ধ করা হয়েছে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি দ্বারা এবং যার ক্ষমতা রয়েছে যথার্থতার সাথে ভবিষ্যদ্বাণী করার' (A discipline is comprised of a body of data systematized by a distinctive analytical method and capable of permitting predications with exactitude.)[৬]। এই নীতিমালা দ্বারা বিচার করে দেখা যাক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটি বিষয় কি না। গত তিন দশকেরও অধিককালব্যাপী বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যয়নের সুবিধার্থ রাষ্ট্রীয় আচরণের বিভিন্ন দিকের উপর যথেষ্ট

http://thejobstudy.com

উপাত্ত (data) সংগ্রহ করেছেন। ষাটের দশকের প্রথমদিকে রিচার্ডসন (Lewis F. Richardson) যুদ্ধের উপর উপাত্ত সংগ্রহ করে তা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন (Lewis F. Richardson, *Statistics of Deadly Quarrels;* Pittsburg : Boxwood Press, 1960)। এর এক দশক পর জে. ডেভিড সিঙ্গার ও মেলভিন স্মল (J. David Singer and Melvin Small) তাঁদের Correlates of War Project-এর মাধ্যমে ১৮১৫ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত যে-সব যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে, তার মোট সংখ্যা এবং সেই সাথে ঐ দীর্ঘ ১৫০ বছর পর্যন্ত সর্বমোট যে-যুদ্ধ হয়েছে, তার উপাত্ত সংগ্রহ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন (J. David Singer and Melvin Small, *The Wages of War : 1815-1965—A Statistical Handbook;* New York : Wiley, 1972)। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে উপাত্তের উপর আর একখানা বিখ্যাত বই হল ব্রুস রাসেট ও কার্ল ডয়েসের (Bruce M. Russett and Karl W. Deutsch) *World Handbook of Political and Social Indicators*। পরবর্তী সময়ে এ-উপাত্তসমূহকে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে রাষ্ট্রীয় আচরণের ব্যাপারে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করার কাজে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং ফুলারের সংজ্ঞা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে একটি বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

অধ্যাপক কুইন্সি রাইটের মতে, একটি অধীতব্য বিষয় (academic discipline) হিসেবে স্বীকৃতি লাভের জন্য দরকার লেখকদের মাঝে এ-সচেতনাটুকু যে, এক ধরনের মিল সহকারে বিষয়টি বিদ্যমান রয়েছে (An academic discipline implies consciousness by the writers that there is a subject with some sort of unity.)[৭]। সেই সাথে বিষয়টির পরিধি (scope) এবং অন্যান্য বিষয় থেকে কোন্ সীমারেখা দ্বারা এটা পৃথক—এ-ব্যাপারেও তাদের মধ্যে ঐকমত্য থাকা দরকার। এ-দিক থেকে বিচার করলে আমরা বলতে পারি যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটি স্বতন্ত্র অধীতব্য বিষয়। যদিও আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যখন আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে একটি আলাদা বিভাগ হিসেবে প্রথমদিকে চালু করা হয়, তখন অনেকেই এর আলাদা অস্তিত্বের ব্যাপারে আপত্তি তোলেন। কারণ, তাঁদের মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে যা পড়ানো হয়, তা রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science) অথবা আধুনিক ইতিহাসের (Modern History) আওতার মধ্যেই পড়ানো সম্ভব। তাঁদের মতে, এতে অনেক সময় বাঁচবে, পরিশ্রম লাঘব হবে এবং আর্থিক দিক থেকে লাভবান হওয়া যাবে। কিন্তু তাঁরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল বিষয়বস্তু অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আধুনিক ইতিহাস—এই উভয় বিষয় থেকেই সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী বিষয়বস্তুকে ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করে থাকে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাথে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পার্থক্য হল এই যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান যেখানে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয় যেমন সরকারের গঠন ও কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে,

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সেখানে রাষ্ট্রের বহিঃসম্পর্ক নিয়ে সংশ্লিষ্ট থাকে। তা ছাড়া কোন সরকার রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যাদের আচরণ নিয়ে ব্যস্ত, সেই স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো যে-কোন ব্যাপারে সমতার ভিত্তিতে অংশগ্রহণ করে এবং সেখানে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ (central authority) বলে কিছু থাকে না। কোন রাষ্ট্রই তার কোন ইচ্ছাকে অপর রাষ্ট্রের উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে পারে না এবং কোন আন্তর্জাতিক সংগঠনও এখন পর্যন্ত এমনভাবে গড়ে তোলা হয় নি, যা স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের উপর কর্তৃত্ব খাটাতে পারে। বর্তমান বিশ্বের সব সদস্য রাষ্ট্রই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (U.N.O) বিভিন্ন প্রস্তাব (resolution) মেনে চলতে নীতিগতভাবে সম্মত। কিন্তু কোন রাষ্ট্র এগুলো মেনে না চললে জাতিপুঞ্জ বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তাকে এ-ব্যাপারে বাধ্য করতে পারে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যয়নের পরিধি ভিন্ন। অতএব, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের জন্য দরকার স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি।

এখন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আধুনিক ইতিহাসের, বিশেষভাবে কূটনৈতিক ইতিহাসের (diplomatic history) পার্থক্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা বলতে পারি যে, যদিও উভয় শাস্ত্রই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘটনা নিয়ে আলোচনা করে তবু তাদের মধ্যে পদ্ধতিগত পার্থক্য বিদ্যমান। ইতিহাস সাধারণভাবে বিভিন্ন ঘটনার একটি ধারাবাহিক দলিল সংরক্ষণ করে। এখানে জোর দেয়া হয় কোন ঘটনা কখন এবং কীভাবে সংঘটিত হল তার উপর; পক্ষান্তরে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দেখতে চায় ঘটনাটি কেন সংঘটিত হল এবং এ-ব্যাপারে কার্যকর বিভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে যে, ভবিষ্যতে এ-ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কী কর্মপন্থা নিতে হবে। সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে একটি আলাদা বিষয় হিসেবে পড়ানোর পেছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে।

এখন আমাদের দেখা দরকার যে, এ-ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কতটুকু অগ্রগতি লাভ করতে পেরেছে। স্টানলি হফম্যান মনে করেন যে, বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব এবং সে-জন্য একে স্বতন্ত্র অধীতব্য বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা উচিত (It is possible to distinguish the field of International Relations for analytical porposes and therefore it should be treated as an autonomous discipline.)[৮]।

পরিশেষে মরটন কাপলান (Morton Kaplan)-এর নির্ণয়নের ভিত্তিতে আমাদের আলোচনার পরিসমাপ্তি টানব। তাঁর মানদণ্ড অনুযায়ী একটি অধীতব্য বিষয়ের কতগুলো নৈপুণ্য ও কলাকৌশল থাকা দরকার, থাকা দরকার কিছু তত্ত্ব ও প্রতিজ্ঞা এবং একটি বিষয়বস্তু (A discipline implies a set of skills and techniques; a body of theory and of propositions, and a subject matter.)[৯]। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ফলপ্রসূ অধ্যয়নের জন্য পণ্ডিতগণ নৈপুণ্যসহকারে অনেকগুলো কলাকৌশল প্রণয়ন করেছেন যেগুলোর মাধ্যমে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের বিভিন্ন দিক উন্মোচন করা

http://thejobstudy.com

সহজতর হয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের (content analysis) কথা উল্লেখ করতে পারি (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। স্টানফোর্ড গ্রুপ তাদের সংকটকালীন সিদ্ধান্ত-প্রণয়ন (crisis dicision-making) সংক্রান্ত অধ্যয়নে এ-কৌশলটি অতি দক্ষতাসহকারে ব্যবহার করেছেন। রাষ্ট্রীয় আচরণের সুষ্ঠু ব্যাখ্যাদানের সহায়ক এবং ভবিষ্যদ্বাণী করার ব্যাপারে সক্ষম অনেকগুলো তত্ত্ব ইতঃপূর্বে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পণ্ডিতগণ উন্নয়ন করেছেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আদি প্রকাশ ও অগ্রগতি শিরোনামে এ-ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। এ-তত্ত্বগুলোকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে এদের উপকারিতা দেখা গেছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত গবেষণা পদ্ধতিসহ রয়েছে অনেকগুলো তত্ত্ব এবং এর বিষয়বস্তুও অন্যান্য পরিপূর্ণ বিষয় থেকে পৃথক। তাই এ-ব্যাপারে আর এখন কারও কোন সন্দেহ নেই এবং থাকা উচিত নয় যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অধীতব্য বিষয়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠের সূচনা ও অগ্রগতি (The Origin and Development of the Study of International Relations)

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠের অগ্রগতি ও বিকাশের ক্ষেত্রে পাঁচটি প্রধান ধারা লক্ষ করা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছু পূর্ব থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত কূটনৈতিক ইতিহাস (diplomatic history)-এর উপরই মনোযোগ নিবিষ্ট ছিল। যুদ্ধ অন্তর্বর্তীকালে চলতি ঘটনার (current events) দিকেও নজর দেয়া হত। একই সময় এমন ধারণাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান (international law and international organizations)-এর অধ্যয়নের মাধ্যমেই আন্তঃরাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্বের সমাধান সম্ভব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যয়ন, অভিজ্ঞতার আলোকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা সঞ্চালিত এবং সেই সাথে রাষ্ট্রীয় আচরণ বিশ্লেষণ ও এতদসম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য অনেকগুলো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দ্বারা সমৃদ্ধ। এই ধারাগুলোকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা উচিত নয়। কারণ এর প্রত্যেকটিই একে অপরের সাথে সম্বন্ধযুক্ত অথবা তার পূর্বেরটার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ উদ্ভূত। সমসাময়িক পণ্ডিতগণ তাঁদের লেখার মাধ্যমে এর সবগুলো ধারায় প্রকাশিত চিন্তাধারাকে একত্র করেছেন। এ-কথা অনস্বীকার্য যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রত্যেকটিরই কিছু-না-কিছু অবদান আছে। এখন আমরা বিভিন্ন ধারায় অগ্রগতির স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করব।

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় কূটনৈতিক ইতিহাসের ধারা সম্পর্কে। এ-সময় ঐতিহাসিক বর্ণনা ও পদ্ধতিগুলোর উপর জোর দেয়া হত বেশি। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যয়ন তখন কোন নির্দিষ্ট সময় অথবা গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক ঘটনার বিশদ বিবরণে পূর্ণ থাকত। কোন নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনাকে যত্নসহকারে পরীক্ষা করে দেখার জন্য যতটুকু সম্ভব দলিলপত্র দ্বারা সমর্থিত প্রমাণ সংগ্রহের দিকে ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ

Go to Contents
http://thejobstudy.com

ছিল। ইতিহাসের খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর অধিক জোর দেয়ার ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের উপযোগী কোন তত্ত্ব এ-সময় গড়ে উঠতে পারে নি।

চলতি ঘটনার প্রতি কূটনৈতিক ঐতিহাসিকদের গুরুত্ব দেয়ার অভাবহেতুই দ্বিতীয় ধারার উদ্ভব হয়। ফলত এ-সময় অতীত ইতিহাসে লিপিবদ্ধ বিষয়াবলিকে বাদ দিয়ে চলতি ঘটনার প্রতিই আলোকপাত করা হয়। ঐতিহাসিক বিবরণবিবর্জিত ও প্রায় সম্পূর্ণরূপে *নিউইয়র্ক টাইমস (The New York Times)*-এ বর্ণিত বিবরণের উপর ভিত্তি করে গঠিত বর্ণনামূলক এই পদ্ধতি তাই অগভীর ও কাল্পনিক। এ-ক্ষেত্রেও তাত্ত্বিক অনুসন্ধানকে হয় অস্বীকার করা হত, নয়তো তা অসম্ভব বলে মনে করা হত।

প্রথম দুটো ধারা থেকে অনেকটা ধার করে ও সংস্কারের মাধ্যমে গঠিত তৃতীয় ধারাটি বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এ-ধারার প্রবক্তাদের মতে, সামাজিক পরিবর্তন আনয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হওয়া দরকার। যে-বিশেষ কারণে এ-ধারণা সক্রিয় হয়ে ওঠে, তা হল লিগ অব নেশনস বা জাতিসংঘের (The League of Nations) সৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্বের নিকট, বিশেষ করে বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতি (policy of isolationism) অনুসরণকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট, জাতিসংঘের চিন্তাধারা পৌঁছে দেয়া। একটা দৃঢ় আন্তর্জাতিক সংগঠনের মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে উদ্ভূত বিভিন্নমুখী সমস্যার সমাধান সম্ভব—এ-ধারণা অনেক পণ্ডিতকেই আকৃষ্ট করে।

সাধারণত যুদ্ধ অন্তর্বর্তীকালের (inter-war period) প্রথম দিকে ধ্যানধারণা ছিল আশাবাদী। তখন মনে করা হত যে, আন্তর্জাতিক সংগঠনের খুঁটিনাটি ও প্রক্রিয়াগত সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে একদিন বিশ্ব সরকার (world government) গঠন করা সম্ভব হবে এবং তার মাধ্যমেই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা মানুষের হাতের নাগালে আসবে। তাই আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রক্রিয়াগত ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যাগুলোর প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যা হোক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে ব্যবহারিক বাস্তববাদ (empirical realities) এ-আশাকে অতিক্রম করে। গত শতাব্দীর ত্রিশের দশকে ইউরোপ ও দূরপ্রাচ্যের রাজনৈতিক আন্দোলন, একনায়কের আবির্ভাব এ-সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘের দুর্বলতা বিশ্ববাসী ও পণ্ডিতদের মধ্যে হতাশা ও বৈরাগ্য এনে দেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পণ্ডিতসমাজে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, বৈরাগ্য ও হতাশা এমন প্রকট হয়ে ওঠে যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের সংশোধনবাদী (reformist) ধারাকে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করা হয়। ঐ সময় পণ্ডিতগণের মতামত ছিল যে, সংশোধনবাদীরা ভুল জিনিসে বিশ্বাস করতেন। কারণ কোন ব্যক্তি নির্দোষ অথবা দোষমুক্ত হওয়ার যোগ্য নয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে ও ব্যবহারে যুক্তি অথবা আদর্শের কোন ভূমিকা নেই এবং কোন প্রতিষ্ঠানকে সংশোধন করা অথবা যুদ্ধকে এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। শক্তি অথবা সামরিক দক্ষতাই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একমাত্র চূড়ান্ত এবং শক্তিধর রাজনীতি নীতিহীন অথবা অযৌক্তিক নয় বরং এটা অনিবার্য।

http://thejobstudy.com

যুদ্ধের চাপে ও মোহমুক্তির ফলে সৃষ্ট তিক্ত এই রায় যুদ্ধের পরেও বহাল ছিল। ১৯৪৮ সালে অধ্যাপক মর্গেনথু (Hans J. Morgenthau) তাঁর *পলিটিক্স এমং ন্যাশনস (Politics Among Nations)* গ্রন্থে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রণয়ণের মাধ্যমে এ-যুক্তিকেই সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি হচ্ছে শক্তির লড়াই (International politics is a struggle for power.)। রাষ্ট্রসমূহ শক্তি অর্জন, সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির তাড়নায় চালিত; প্রত্যেকের কাছে শক্তিই একমাত্র জাতীয় স্বার্থ (national interest)। তিনি আরও বলেন যে, রাষ্ট্রীয় আচরণের এ-অন্তর্নিহিত ব্যাপারটিই আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রহেলিকার দ্বার খুলে দেবে এবং পণ্ডিতদেরকে এ-প্রক্রিয়টি বোঝার অন্তর্দৃষ্টি ও রাজনীতিকদের প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করবে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এই চতুর্থ ধারাটি বাস্তববাদী (realist) পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত লাভ করে। এটা যুদ্ধ অন্তর্বর্তীকালের আদর্শবাদী (idealist) প্রকল্পগুলো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এক সময় ছিল যখন বাস্তববাদী-আদর্শবাদী তর্ক একটা প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু আজকাল এ-তর্ক অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে, এমনকি মর্গেনথু নিজেও শেষ জীবনে রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের ক্ষেত্রে শক্তির প্রতি যে-আকাঙ্ক্ষা, তার উপর জোর দেয়া অনেকটা কমিয়ে দিয়েছিলেন।

যদিও বর্তমানে মর্গেনথুর বাস্তববাদী তত্ত্ব (realist theory)-কে তেমন একটা গুরুত্ব দেয়া হয় না এবং তাঁর শক্তির ধারণা (concept of power)-কে তেমন বেশি সমর্থন করা হয় না, তবু আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এর অবদান অপরিসীম। তাঁর পুস্তক যা পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচিত, তাতে তিনি আমাদের দেখিয়েছেন কীভাবে আন্তর্জাতিক বিষয়ে সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করতে হয়, অন্য কথায়, শুধু কোন ঘটনা বা প্রতিষ্ঠানের উপর ভিত্তি না করে বরং ধারণার (concept) সাহায্যে কীভাবে চিন্তাশক্তিকে উন্নত করা যায়।

পরবর্তীকালে মর্গেনথুর প্রদর্শিত পথে তরুণ পণ্ডিতগণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে সুষ্ঠু ও ধারণাগতভাবে নতুন ভাবনাচিন্তা শুরু করে দেন। এভাবে পঞ্চাশের দশক থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের পঞ্চম ধারাটির সূত্রপাত হয়। এ-ব্যাপারে কয়েকটি মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় যেমন প্রিন্সটন (Princeton), ইয়েল (Yale), শিকাগো (Chicago), নর্থ ওয়েস্টার্ন (Northwestern) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এ-ধারার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল বৈজ্ঞানিক উপায়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়ন (scientific study of international relations)। তারা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা এবং এ-সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তত্ত্ব উন্নয়নের দিকে জোর দেন। এভাবেই শুরু হয় ব্যবহারবাদী দশকে (behavioural decade) তত্ত্ব উন্নয়ন যা পরবর্তীকালে ব্যবহারোত্তর দশক (post-behavioural decade) অতিক্রম করে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। এই গোটা সময়ে যে-সব তত্ত্ব উন্নয়ন করা হয় সে-সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

ওয়ারেন ফিলিপস (Warren Phillips) 'তত্ত্বগুলো গেল কোথায়' (Where have all the theories gone?) এই শিরোনামে 'ফিল্ড তত্ত্ব' (Field theory), 'র‍্যাঙ্ক তত্ত্ব' (Rank theory), 'অস্ত্র প্রতিযোগিতা' (Arms Races) ও 'স্বার্থের দ্বন্দ্ব' (Conflict of interest) এ-চারটি তত্ত্ব পরীক্ষা করে মন্তব্য করেন যে, তত্ত্বগুলোর প্রণেতাগণ যথার্থভাবেই প্রমাণ করেছেন যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটেছে।[১০] এরেন্ড লিফার্ট (Arend Lijphart)-এর মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কিছু তত্ত্ব, বিশেষত সনাতন পদ্ধতিতে উন্নীত তত্ত্বগুলো টমাস কুন (Thomas S. Kuhn)-এর বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের রূপরেখায়ও (The Structure of Scientific Revolution) তত্ত্ব হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।[১১] শক্তিসাম্য (Balance of power), সমষ্টিগত নিরাপত্তা (Collective security), বিশ্ব সরকার (World government) ইত্যাদি প্রচলিত তত্ত্ব এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

চার্লস ম্যাকলিল্যান্ড (Charles A. McClelland) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের ইতিহাসে চারটি ধাপ লক্ষ্যকারী কার্ল ডয়েস (Karl Deutsch)-এর চিন্তাধারাকে বর্ধিত করেন। ডয়েস ১৯৫০ সালেই অগ্রগতির তৃতীয় ধাপ লক্ষ্য করেন। এ-ধাপে সামাজিক ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের (Social and behavioural sciences) বিভিন্ন শাখা যেমন মনোবিজ্ঞান (Psychology), নৃতত্ত্ববিজ্ঞান (Anthropology), সমাজবিজ্ঞান (Sociology) ও অর্থনীতি (Economics) থেকে লব্ধ জ্ঞানকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্ব উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা হয়। এর পরের ধাপে এগুলোকে আরও শক্তিশালী করা হয় এবং বিশ্লেষণাত্মক ও পরিমাণবাচক গবেষণার (analytical and quantitative research) ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারণা ও মডেল (model)-কে কাজে লাগিয়ে এমন কতগুলো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উদ্ভাবন করা হয় যেগুলোকে প্রয়োজনীয় উপাত্তের (data) সাহায্যে প্রমাণ করা যায়।

গত-শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে অনেকগুলো তত্ত্বের উদ্ভব হয়, যেমন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ তত্ত্ব (Decision-making theory), ফিল্ড তত্ত্ব (Field theory), সিস্টেম তত্ত্ব (System theory), নিবারণী তত্ত্ব (Deterrence theory), দক্ষতার তত্ত্ব (Capability theory), যোগাযোগ তত্ত্ব (Communications theory), সংহতি তত্ত্ব (Integration theory), দ্বন্দ্বের তত্ত্ব (Conflict theory), ক্রীড়া তত্ত্ব (Game theory), উন্নয়ন তত্ত্ব (Development theory), পরিবেশগত তত্ত্ব (Environmental theory), ইত্যাদি। চতুর্থ ধাপে স্ট্যাটাস-ফিল্ড তত্ত্ব (Status-field Theory), পার্শ্বীয় চাপ তত্ত্ব (Lateral Pressure theory), স্টানফোর্ড গ্রুপ (Stanford group) ও কোরিলেটস অব ওয়ার প্রজেকট (Correlates of War Project) প্রভৃতি কর্তৃক সৃষ্ট তাত্ত্বিক কাঠামো (Theoretical Framework) ইত্যাদি উন্নয়ন করা সম্ভব হয়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বসমূহকে প্রধানত দু ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত, আদর্শবাদী তত্ত্ব (normative theory) অথবা দার্শনিক তত্ত্ব, যেগুলো সাধারণত নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যেগুলোর বক্তব্য হল মানুষের কী করা উচিত অথবা কোন জিনিসের কীভাবে থাকা উচিত সে-সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়া। যখন

Job Study
To make you prepared & confident
http://thejobstudy.com

কেউ বলেন যে, মানুষের আইন মেনে চলা উচিত তখন সকলেই উপলব্ধি করতে পারেন যে, এর কারণ হল এটাই তাদের জন্য সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত কাজ। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অনেকগুলো সনাতন তত্ত্ব (traditional theory), যেমন শক্তিসাম্য, সমষ্টিগত নিরাপত্তা, বিশ্ব সরকার, জাতীয় স্বার্থের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বাস্তববাদী তত্ত্ব ইত্যাদি আদর্শবাদী তত্ত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

শক্তিসাম্য তত্ত্বে সাধারণত বলা হয় যে, রাষ্ট্রসমূহের উচিত শক্তির সমতা রক্ষা করা, কারণ এর ফলে কোন একটি বিশেষ রাষ্ট্র এককভাবে অথবা অন্য রাষ্ট্রের সমবায়ে এমন অধিক ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে পারবে না, যাতে সে অন্যান্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হিসেবে দেখা দিতে পারে এবং এভাবে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। সমষ্টিগত নিরাপত্তা তত্ত্বে বলা হয় যে, যদি আক্রমণকারী রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে একটি বিশ্ব ফ্রন্ট গড়ে তোলা যায়, যা আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তবেই কেবল বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। আদর্শবাদী তত্ত্বসমূহ সাধারণত এমন অনেকগুলো অনুমতি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেগুলোকে অভিজ্ঞতালব্ধভাবে সঠিক বলে মনে করা হয়।

দ্বিতীয়ত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অবশিষ্ট তত্ত্বসমূহকে কার্যকারণ তত্ত্ব (Causal Theory) বলা হয়। এগুলো অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এগুলোতে বলা হয় যে, আন্তর্জাতিক ঘটনাসমূহ এলোপাতাড়িভাবে সংঘটিত হয় না, তাদের পেছনে অবশ্যই অন্য কোন ঘটনা অথবা বিষয়ের হাত আছে, অর্থাৎ প্রথমোক্ত ঘটনাসমূহ দ্বিতীয়োক্ত ঘটনা অথবা বিষয়সমূহের উপর নির্ভরশীল। যদিও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রায় সকল তত্ত্বকে কার্যকারণবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়, তথাপি দ্বিতীয় ধরনের এ-তত্ত্বসমূহ, যা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব (Scientific Theory) হিসেবে বহুলপরিচিত, শুধু অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে কোন ঘটনা অথবা বিষয় সম্পর্কে কেবল ধারণা প্রকাশ করেই দায়িত্ব পালন শেষ করে না, বরং বাস্তবতার আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এগুলোকে হয় অনুমোদন করা হয় নতুবা বাদ দেয়া হয়। ব্যবহারবাদী ও ব্যবহারোত্তর দশকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে যে-তত্ত্বসমূহ উদ্ভাবন করা হয়েছে, সেগুলো এ-দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

যে-কোন তত্ত্বের, তা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে হোক বা সামাজিক বিজ্ঞানে হোক, যথার্থতার সাথে ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। যথার্থতার সাথে ভবিষ্যদ্বাণী করার এ-ক্ষমতাতেই যে-কোন তত্ত্বকে সাফল্যের সাথে নীতি নির্ধারণের কাজে ব্যবহার করা যায় এবং এভাবেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এখানে একটি কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে সৌর জগতের গতিবিধি সম্পর্কে চমৎকার তত্ত্ব থাকা সত্ত্বেও মানুষের পক্ষে যেভাবে গ্রহনক্ষত্রকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, অনুরূপভাবে সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ-কথাটি আরও অধিক প্রযোজ্য। তাই সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা, যেমন অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদির মতো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তত্ত্বের উপকারিতাকে তার

Go to Contents
http://thejobstudy.com

ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতার সাথে সাথে যে-কোন ঘটনা অথবা বিষয়কে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতার দ্বারা বিবেচনা করতে হবে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্ন তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় যে, উল্লেখযোগ্যসংখ্যক পণ্ডিত ও গবেষক এখানে অস্ত্র প্রতিযোগিতা ব্যাখ্যা করা ও অস্ত্রশস্ত্র খাতে ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার উপযোগী মডেল নির্মাণে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছেন। এ-ব্যাপারে লুই রিচার্ডসন (Lewis F. Richardson) পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। তিনি যে-গাণিতিক মডেল উদ্ভাবন করেন তা নিম্নরূপ :

$$\frac{dx}{dy} = ky - ax + g$$

যেখানে, $\frac{dx}{dy}$ = যে-হারে কোন একটি রাষ্ট্র তার অস্ত্রশস্ত্র বাড়ায়

x = ঐ রাষ্ট্রের নিজের ক্ষমতা

y = ঐ রাষ্ট্রের বিপক্ষের ক্ষমতা

k = অস্ত্রশস্ত্র বাড়ানোর ঔৎসুক্য

a = ক্লান্তি ও খরচ

g = অভিযোগ

উক্ত মডেলটি যদি রাষ্ট্র x-এর অস্ত্রশস্ত্র খাতে ব্যয়বরাদ্ধকে বোঝায়, তবে তার প্রতিপক্ষ রাষ্ট্র y-এর অস্ত্রশস্ত্র খাতে ব্যয়কে নিচের গাণিতিক মডেল দিয়ে বর্ণনা করা যায় :

$$\frac{dy}{dt} = mx - by + h$$

এভাবে দেখা যায় যে, রিচার্ডসনের মডেলে দুটো পরস্পরবিরোধী ও দ্বন্দ্বে-লিপ্ত রাষ্ট্রের উত্তেজনা-প্রতিক্রিয়ার (stimulus-response) উপর জোর দেয়া হয়েছে। এভাবে এ-রাষ্ট্র দুটো পরস্পরের সাথে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। রিচার্ডসনের এই আদি মডেলের উপর আরও অনেক পণ্ডিত গবেষণা চালিয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চার্লস ওস্ট্রম (Charles W. Ostrom, Jr.)-এর গবেষণা যেখানে তিনি যথোপযুক্ত উপাত্তের সাহায্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা মডেলের সাথে সাংগঠনিক-রাজনীতি মডেলের (Organisational politics model) তুলনা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক খাতে ব্যয়বরাদ্ধকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।[১২] তাঁর গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, রিচার্ডসনের মডেল ও সাংগঠনিক মডেল উভয়ই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রশস্ত্র খাতে ব্যয়বরাদ্দকে ব্যাখ্যা করার কাজে তেমন সফল নয়। এ-জন্য তিনি নতুন মডেল উদ্ভাবনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্ব নির্মাণে আরেকটি বৃহৎ প্রচেষ্টা হল ক্রীড়াতত্ত্ব উদ্ভাবন। ক্রীড়া তত্ত্ব হল এমন একটি সাধারণ ছাঁচ যার মধ্যে অনেকগুলো মডেল থাকতে পারে।

http://thejobstudy.com

তবে সবগুলো মডেলের মূল বক্তব্য হল যে, এখানে পরস্পরনির্ভরশীল রাষ্ট্রসমূহের সিদ্ধান্তপ্রণেতাগণ যৌক্তিক সিদ্ধান্তগ্রহণ সম্পর্কে এমন সমস্যাবলির সম্মুখীন হন, যেখানে বিপক্ষ কী কর্মপন্থা নেবে, সে-সম্বন্ধে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা থাকে। এখানে প্রত্যেক পক্ষেরই দৃষ্টি থাকে তার বিপক্ষ যে-কর্মপন্থাই নিক না কেন, নিজে সে এমন কর্মপন্থা নেবে, যা তার লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে অথবা ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করবে।

পরবর্তীকালে অনেক বিশিষ্ট পণ্ডিত রিচার্ডসনের মডেল ও ক্রীড়াতত্ত্বের মডেলসমূহকে তাত্ত্বিক দিক দিয়ে আরও অগ্রগতির পথে নিয়ে যান। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কেনেথ বোল্ডিং (Kenneth Boulding) রিচার্ডসনের মডেল থেকে কিছু প্রতিজ্ঞা ও ক্রীড়াতত্ত্ব থেকে কতগুলো ধারণাগত কাঠামো আহরণ করে এগুলোর উপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দ্বন্দ্বসম্পর্কিত একটি সাধারণ তত্ত্ব উদ্ভাবনের উপর কাজ করেন।[১৩] অনুরূপভাবে, উইলিয়াম রিকার (William Riker) বহুসংখ্যক ব্যক্তির (N-person) আন্তঃক্রিয়ারসম্পর্কিত ক্রীড়াতত্ত্বের মধ্যে আরও অতিরিক্ত কিছুসংখ্যক অনুমেয় সত্য যোগ করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংযোগের (political coalition) উপর একটি তত্ত্ব নির্মাণ করেছেন।[১৪] বোল্ডিং এবং রিকার উভয়েই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বাস্তব সমস্যা সযত্নে পরীক্ষা করে দেখার জন্য তাঁদের নিজ নিজ তত্ত্বকে সাফল্যজনকভাবে প্রয়োগ করেছেন।

এর কিছুকাল পরে রিকারের রাজনৈতিক সংযোগ ব্রুস রাসেটকে মৈত্রীগঠন সম্পর্কিত তত্ত্ব (theory of alliance-formation)[১৫] উদ্ভাবনে সহায়তা করে। ক্রীড়া তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তিনি মনে করেন যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রই এমন মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হতে চাইবে, যেখানে শুধু ততটুকু শক্তি থাকবে, যা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনের জন্য যথেষ্ট কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত নয়, কারণ তাদের দৃষ্টি থাকবে যাতে বিজয়ের সুফল অপ্রয়োজনীয় সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দিতে না হয়।

অতি সম্প্রতি ফ্রাঙ্ক জাগারে (Frank Zagare) পারস্পরিক নিবারণী তত্ত্ব (theory of mutual deterrence)[১৬] পুনর্গঠনের কাজে দেখিয়েছেন যে, একে কীভাবে ক্রীড়াতত্ত্বের কাঠামোর মধ্যে সংঘবদ্ধ করা যায়। এ-সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি প্রথমেই বলেছেন যে, ক্রীড়াতত্ত্বের, বিশেষত কয়েদিদের উভয় সংকট মডেলটি, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কতগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন অগ্র-সামরিক আঘাত (preemptive military strikes), পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তার, অস্ত্র প্রতিযোগিতা ইত্যাদি ব্যাখ্যা করার কাজে ফলপ্রসূভাবে ব্যবহার করা যায়। তিনি নিবারণী তত্ত্ব নিয়ে কাজ করেছেন, কারণ তিনি মনে করেন যে, বর্তমান অরাজক বিশ্বে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব আনয়নের জন্য দরকার সনাতন শক্তিসাম্য ব্যবস্থা, যা পারস্পরিক নিবারণী সম্পর্কের মাধ্যমে বজায় রাখা সম্ভব। তিনি দেখিয়েছেন যে, পারস্পরিক নিবারণী তত্ত্ব প্রকারান্তরে কয়েদিদের উভয় সংকট মডেলের অন্তর্নিহিত ক্রীড়া পরিস্থিতি সৃষ্টিকে উৎসাহিত করে। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, নিবারণীর যুক্তিসমূহ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে অনেকগুলো বিষয়ে একে অপরের সাথে সহযোগিতা করার সামর্থ্য সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি জোগায়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্যতম ফলপ্রসূ তত্ত্ব হল অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত পরনির্ভরশীলতার তত্ত্ব। এ-তত্ত্বটি তিনটি মূল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলো হল অসমতা, পরনির্ভরশীলতা এবং শোষণ। এ-ধারণাগুলোর সংজ্ঞা দিতে গেলে অতি সংক্ষেপে বলা যায় যে, অসমতা হল রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার আকাঙ্ক্ষিত সম্পদের পার্থক্য, পরনির্ভরশীলতা হল একটি (সাধারণত ক্ষুদ্র ও দুর্বল) দেশকে অপর একটি (সাধারণত বৃহৎ ও শক্তিশালী) দেশ কর্তৃক অপ্রতিসম নিয়ন্ত্রণ (asymmetric control), এবং শোষণ বলতে বোঝায় তাদের মধ্যে অসমান এবং মূলত অসৎ মূল্য স্থানান্তর (value transfer)।[১৭] যদি দুটো দেশের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনাকালে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে এই তিনটি ধারণা বিদ্যমান, তবে আমরা মনে করতে পারি যে, নির্ভরশীল দেশটি, যে-দেশটির উপর নির্ভর করে, তার সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের শিকার। আমরা এ-তিনটি ধারণা পরিমাপ করতে পারি[১৮] এবং এভাবে যে সংখ্যাবাচক শব্দগুলো পাব তাদের গুণফলই নির্দেশ করবে পরনির্ভরশীলতা তত্ত্ব অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদের গভীরতা। এখানে উল্লেখ না করলেও পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, এই তিনটি ধারণার গুণফলকে সাম্রাজ্যবাদ হিসেবে দেখানো হয়েছে, যোগফলকে নয়, কারণ এর যে-কোন একটি ধারণা অনুপস্থিত থাকলে তা সাম্রাজ্যবাদকে নির্দেশ করবে না।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আরও একটি ফলপ্রসূ তত্ত্ব হল সংহতি তত্ত্ব। ব্যবহারবাদী দশকে উদ্ভাবিত এ-তত্ত্বটিতে ধরে নেয়া হয় যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিরাজমান স্বার্থ-সংঘাত, দ্বন্দ্ব, ভয়, সন্দেহ, ঈর্ষা ইত্যাদি যা তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, তা ভুলে গিয়ে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের জনগণ যদি পদ্ধতিগতভাবে একত্র হতে পারে, তবে তারা একে অপরের ভালোমন্দ এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জানতে পারবে এবং এর ফলে তাদের মধ্যকার পারস্পরিক শত্রুতা কমে যাবে। তাত্ত্বিকগণ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এ-তত্ত্বটির বিকাশে অবদান রেখেছেন। আচরণবাদী দশকের তত্ত্ব বিকাশের ধারা অনুযায়ী সংহতি তত্ত্ব ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে এর নিজস্ব ক্ষেত্রে এবং এর সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য ক্ষেত্র, যেমন কার্যকারণবাদী তত্ত্ব (Functionalist theory), সিস্টেম তত্ত্ব, যোগাযোগ তত্ত্ব, সিদ্ধান্তগ্রহণ তত্ত্ব, শিক্ষণ তত্ত্ব (Learning theory) ইত্যাদি থেকে ধার করা জ্ঞান থেকে।

কার্ল ডয়েস সংহতি তত্ত্ব উদ্ভাবনের কাজে নরবার্ট উইনার (Norbert Wiener)-এর যোগাযোগ তত্ত্ব এবং টালকট পারসন্‌স্ (Talcot Parsons)-এর সিস্টেম তত্ত্ব থেকে সাহায্য নিয়েছেন। তিনি সিস্টেমিক পরিপ্রেক্ষিতে গঠনমূলক এককগুলো ও পুরো সংহতি এককটির মধ্যে যোগাযোগ ও লেনদেনের ব্যাপারে জোর দিয়েছেন, কেননা তিনি মনে করেন যে, উঁচু পর্যায়ের লেনদেন বজায় থাকলে উঁচু পর্যায়ের উদ্বেগ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টির সম্ভাবনা কম।[১৯]

আর্নেস্ট হ্যাস (Ernst Haas) তাঁর তাত্ত্বিক কাঠামোতে বলেন যে, সংহতির সঙ্গে অগ্রসর হওয়া অথবা এর বিরুদ্ধাচারণ করা নির্ভর করে সংহতি একক গঠনে নিয়োজিত বৃহৎ দলগুলোর লাভ অর্জন অথবা ক্ষতি স্বীকারের সম্ভাবনার উপর।[২০] তিনি শিক্ষণ

http://thejobstudy.com

তত্ত্বের সাহায্য নিয়ে বলেন যে, দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে যদি একটি ক্ষেত্রে সংহতি স্থাপিত হয়, তবে তা অন্য অনেক ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যাবে। তিনি সিস্টেম তত্ত্ব থেকেও সাহায্য নেন যখন তিনি input-output ধারণাকে সংহতি স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। তাঁর মতে, গঠনমূলক এককগুলোর সরকারের নীতিসমূহ হচ্ছে input, যেগুলো প্রক্রিয়াজাত হয়ে সংহতি পদ্ধতির মাধ্যমে যৌথ সিদ্ধান্ত হিসেবে output বেরিয়ে আসে।

অপর একজন তাত্ত্বিক অমিতাই এটজায়নি (Amitai Etzioni) অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের মধ্যকার পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে সংহতি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হিসেবে বর্ণনা করেন।[২১] তাঁর মতে, গঠনমূলক এককগুলো যদি মনে করে যে, সংহতি এককটি তাদের সকলের স্বার্থ রক্ষা করবে, তবে তারা নিজেরা যেভাবে এতে যোগদান করবে অন্যদেরকেও সেভাবে উৎসাহিত করবে।

সংহতি তত্ত্ব উদ্ভাবনে বিশেষ অবদান রেখেছেন এরকম আরেকজন পণ্ডিত যোহান গালটুং (Johan Galtung) মনে করেন যে, সংহতি স্থাপনে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার ভাবের আদান-প্রদান বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। তিনি আরও বলেন যে, এ-পদ্ধতি ততদিনই ক্রমাগত উন্নয়ন লাভ করবে এবং ধীরে ধীরে স্থায়িত্ব লাভের দিকে এগিয়ে যাবে, যতদিন এতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকেই এর প্রতি দৃঢ় সমর্থন দিয়ে যাবে।[২২] এই সমর্থনদান নির্ভর করবে সংহতি এককটি তাদের প্রত্যেকের জন্য কী সুফল বয়ে আনতে পারবে তার উপর।

সংহতি তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এই যে, প্রায় সকল তাত্ত্বিকই তাঁদের নিজ নিজ উক্তিকে (proposition) অভিজ্ঞতালব্ধ উপাত্ত দিয়ে যথার্থভাবে সত্য বলে প্রমাণ করেছেন।

উক্ত তত্ত্বসমূহ ছাড়াও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্ন গবেণালব্ধ ফল কতগুলো ধারণাগত কাঠামোর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে ধারণাগত কাঠামো নির্ধারণ করে একজন তাত্ত্বিক কোন্ বিষয়টি ব্যাখ্যাযোগ্য বলে মনে করেন এবং এ-ব্যাখ্যার কাজে তিনি কোন্ কোন্ চলক অর্থাৎ উপাদান অন্তর্ভুক্ত করবেন। একটি নতুন ধারণাগত কাঠামো নির্মাণ জ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো আন্তর্জাতিক সম্পর্কেও একটি বিশিষ্ট ঘটনা, কারণ এটা অন্যান্য পণ্ডিত ও গবেষকের চিন্তাজগতে ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্পর্কে গঠনমূলক প্রভাব রাখতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মর্গেনথুর শক্তি অথবা জাতীয় স্বার্থের উপর ভিত্তি-করে-গড়ে-তোলা বাস্তববাদী কাঠামো পরবর্তীকালের অনেক পণ্ডিত ও গবেষককে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্ব উদ্ভাবনে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে, যার ফলে পঞ্চাশের ব্যবহারবাদী দশকের শুরু থেকে আমরা অনেক তত্ত্ব পাই, যে-কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এর চেয়েও অধিক উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ব্যবহারোত্তর দশকের বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্প, যেমন সংকটকালীন সিদ্ধান্ত-প্রণয়ন সম্পর্কিত স্টানফোর্ড দলের গবেষণা, জাতিসমূহের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কারণ ও সামর্থ্য অনুসন্ধানসম্পর্কিত

Go to Contents
http://thejobstudy.com

যথাক্রমে কোরিলেটস অব ওয়ার প্রজেক্ট ও ডিমেনশনালিটি অব ন্যাশনস প্রজেক্ট (Dimensionality of Nations Project) কর্তৃক উদ্ভাবিত তাত্ত্বিক কাঠামোসমূহ, যা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উৎসাহী পাঠক ও চিন্তাবিদদেরকে আন্তঃরাষ্ট্রীয় যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব সম্পর্কে নতুন আলোক দান করে।

উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা ও ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা ও এতদ্‌সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য বিভিন্ন পণ্ডিত ও গবেষক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বেশ কিছুসংখ্যক তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন। আমরা দশম অধ্যায়ে কোন তত্ত্বকে মূল্যায়নের জন্য যে-নির্ণায়কসমূহের উল্লেখ করব, সেগুলোর ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এ-তত্ত্বগুলোকে মোটামুটিভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ, বিভিন্ন বাস্তব ঘটনা ও সমস্যা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে এবং সেই সাথে নীতি-নির্ধারকদের প্রয়োজন মেটাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সক্ষম এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে নিত্যনতুন গবেষণা চালিয়ে যাবার জন্য এগুলো বিশেষ দিকনির্দেশ দিতে সমর্থ বলে গণ্য করা যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনাসম্পর্কিত স্টানফোর্ড দল সংকটকালীন সিদ্ধান্ত প্রণয়ন সংক্রান্ত গবেষণায়[২৩] দেখতে পান যে, যুদ্ধ পূর্ববর্তী সংকটসমূহের সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রধান সিদ্ধান্তপ্রণেতাগণের মধ্যে স্বাভাবিক যোগাযোগব্যবস্থা ব্যাহত হয়, যার ফলে তাঁরা একে অপরের মনোভাব বুঝতে পারেন নি, পরিণামে যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে। পরবর্তীকালে ১৯৬২ সনে কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডি (John F. Kennedy) ও সোভিয়েত নেতা ক্রুশ্চেভ (Nikita S Khrushchev) বিশেষ ধরনের যোগাযোগ রক্ষা করে এ-সংকটটি যাতে আরেকটি বিশ্ব যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করতে না পারে, তা নিশ্চিত করে বিশ্ববাসীকে এক সম্ভাব্য চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবে স্টানফোর্ড দলের গবেষণা বাস্তব সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বীয় জ্ঞান নীতিনির্ধারকদের যে-কাজে লাগতে পারে, ক্রীড়াতত্ত্ব ও সংহতি তত্ত্বের আলোচনায় সে-ব্যাপারে যথাক্রমে পঞ্চদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে আভাস দেয়া হবে। সম্প্রতি যে-দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সঙ্ঘ (সার্ক) গঠন করা হয়েছে, তার কার্যকারিতা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হলে সংহতি তত্ত্বের বিভিন্ন প্রকল্প (hypothesis) আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে।[২৪] অনুরূপভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বসমূহের উপযোগিতা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা থেকে যায়। অবশ্য পরবর্তীকালের গবেষণায় সে-সমস্যাসমূহ দূর করবার প্রচেষ্টাও চালানো হয়। এখানে একটি উদাহরণই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। পূর্বেই আমরা দেখেছি, ওস্ট্রমের গবেষণা প্রমাণ করেছে

http://thejobstudy.com

যে, ১৯৫৪ সন থেকে ১৯৭৩ সন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক খাতে ব্যয়-বরাদ্দকে ব্যাখ্যা করার কাজে রিচার্ডসনের মডেল ও সাংগঠনিক রাজনীতি মডেল তেমন উপকারী নয়, যে-জন্য তিনি নতুন মডেল উন্নয়নের পরামর্শ দিয়েছেন। পরবর্তীকালে রবিন মারা (Robin F. Marra) ১৯৪৭ সন থেকে ১৯৮০ সন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ব্যয়সংক্রান্ত নীতি-নির্ধারণ ব্যাখ্যা করার কাজে সাইবারনেটিক মডেল (cybernetic model) ব্যবহার করে সফলকাম হয়েছেন।[২৫] তাঁর গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, উল্লিখিত সময় সামরিক খাতে ব্যয়ের অনুরোধ, সুপারিশ, অনুমোদন ও প্রকৃত বরাদ্দের ব্যাপারে উক্ত মডেল সাধারণ ও পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদানে সক্ষম।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বীয় গবেষণা একটি ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রচেষ্টা। পণ্ডিত ও গবেষকগণ এ-ক্ষেত্রে নিত্যনতুন অবদান রাখছেন। বহুদিন পূর্বে গুলিক (Edward Gulick)[২৬] ও ক্লড (Inis L. Claude)[২৭] গুণগত গবেষণার মাধ্যমে শক্তিসাম্য সম্পর্কে যে-বক্তব্য পেশ করেন, পরবর্তীকালে দিনা জিনেস (Dina Zinnes)[২৮] এবং হিলি ও স্টেইন (Brian Healy and Arthur Stein)[২৯] প্রমুখ পণ্ডিত পরিমাণবাচক গবেষণা চালিয়ে তার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। প্রকৃতপক্ষে, শক্তিসাম্য সম্পর্কে বর্তমান গবেষণা দ্বারা আমরা দুই অথবা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে শক্তির বণ্টন (স্বাধীন চলক) ও যুদ্ধের সম্ভাবনার (নির্ভরশীল চলক) মধ্যকার সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারি। (ষোড়শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, বর্তমানে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়টি সুন্দরভাবে প্রণীত কতগুলো তত্ত্বের দ্বারা বিকশিত হয়েছে। তথাপি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বে বর্ধিতকরণের ক্ষেত্রে অনেকগুলো সমস্যা রয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আওতায় কোন বড় রকমের প্রক্রিয়া (যেমন ক্ষমতার সম্পর্ক, যুদ্ধ, সঙ্কট, আন্তঃজাতি মিত্রতা, ইত্যাদি) সম্পর্কে গঠনমূলকভাবে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করা (predict) তাত্ত্বিকদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তবু বিশেষজ্ঞদের প্রাথমিক চেষ্টা হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বগবেষণাকে জ্ঞানের একটি সমষ্টিগত রূপ হিসেবে উপস্থাপন করা। এখানে বর্ধিতকরণ (cumulation) অর্থ হচ্ছে জ্ঞান বৃদ্ধি। দিনা জিনেস যে-দুরকম বর্ধিতকরণের কথা ব্যক্ত করেছেন, তার একটা হচ্ছে সংযোজনমূলক বর্ধিতকরণ (additive cumulation) ও অন্যটি সংহতিমূলক বর্ধিতকরণ (integrative cumulation)। তাঁর মতে, সংযোজনমূলক বর্ধিতকরণের সংজ্ঞা হল 'জ্ঞানের যে-কোন শাখায় যে-সব পাঠ্যপুস্তক আছে তাতে আরও নতুন কোন তথ্য যোগ করা' (additive cumulation is any study that adds some information to the existing literature on the subject.)।[৩০] এবং সংহতিমূলক বর্ধিতকরণ হচ্ছে 'এমন কোন অধ্যয়ন যা গবেষণার ফলাফলকে ব্যাখ্যা করে এবং তাদের সমন্বয় সাধন করে। এই অর্থে প্রাথমিক গবেষণা অতি জরুরি। কেননা এটা ইঙ্গিত দেয় কোন্ কোন্ প্রক্রিয়া এবং চলক পরবর্তী গবেষণাতে পরীক্ষা করা উচিত' (Integrative

cumulation means that a study ties together and explains a set of research findings. In this sense the earlier research is 'crucial' since it suggests what processes and variables should be examined in the later one.)[৩১]। জি. আর. বনটনও (G. R. Boynton) তত্ত্বগত সংহতির (theoretical integration) শর্ত হিসেবে বর্ধিতকরণের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছেন। 'একই প্রক্রিয়ার উপর একটি গবেষণাপ্রচেষ্টার সঙ্গে আরেকটা গবেষণাপ্রচেষ্টার আবিষ্কারের ফলাফলের বুদ্ধিগত সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে তত্ত্ব কার্যকর ভূমিকা পালন করে' (cumulation is important for theoretical integration. Theory plays the useful function of intellectually co-ordinating the findings from one research effort with such other research on the same phenomena.)।[৩২]

পণ্ডিতগণ একত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে খুবই সচেতন, বিশেষ করে বিমূর্ত তত্ত্বসমূহ (abstract theories) ও পররাষ্ট্রনীতির সিদ্ধান্তপ্রণয়নকারীদের (foreign policy decision-makers) মারফত এগুলোর বাস্তব প্রয়োগের মধ্যকার ব্যবধান কমানোর জন্য অভিজ্ঞতালব্ধ গবেষণার (empirical research) মাধ্যমে নীতি সম্পর্কিত (policy relevant) তত্ত্ব উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁরা আরও বেশি সচেতন। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কে তত্ত্বের একত্রীকরণের ক্ষেত্রে যে-প্রধান সমস্যাটি দেখা দেয় সেটা হল আন্তর্জাতিক সিস্টেমে (international system) অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত অলিগোপলি (oligopoly)-র মতো অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যেগুলো সম্পর্কে সঠিকভাবে কোন কিছু বলা সব সময়ই কষ্টকর। এতে সন্দেহের খুব কমই অবকাশ আছে যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিসর অত্যন্ত জটিল। তথাপি এর প্রতিকার শুধু হতাশা প্রকাশের মধ্যে নয় বরং এ জটিলতাকে সঙ্ঘবদ্ধ করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে এবং এটা নিয়েই বিশেষজ্ঞরা বর্তমানে বেশি মাথা ঘামাচ্ছেন। গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদান ও ভবিষ্যদ্বাণী করার ব্যাপারে সফলতা লাভের জন্য পণ্ডিতগণ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্ন জটিলতাকে সংগঠিত এবং শ্রেণিবদ্ধ করে তত্ত্ব উন্নয়নের কাজে বর্তমানে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছেন।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠের উদ্দেশ্য (The Purpose of the Study of International Relations)

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ও অর্থপূর্ণ জীবনযাপন করতে হলে তাকে সমাজজীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে-সব সমস্যার উদ্ভব হওয়া সম্ভব তা মোকাবিলা করার জন্য তৈরি থাকতে হয়। কী উপায়ে সমাজজীবনের বিভিন্ন সমস্যা সুষ্ঠুভাবে সমাধান করা সম্ভব, সে-ব্যাপারে আলোকপাত করার জন্য সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজে শাসক ও

http://thejobstudy.com

শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক অর্থাৎ অধিকার, কর্তব্য ও ক্ষমতার বণ্টন নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়। অর্থনীতির কাজ হল কোন সমাজে উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও বিনিয়োগের ব্যাপারে সুসামঞ্জস্য বজায় রাখার প্রচেষ্টা চালানো, যাতে ঐ সমাজ আর্থিক দিক থেকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারে। অনুরূপভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভিন্ন সমাজে বসবাসকারী মানুষের পরস্পরের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে করণীয় কার্যাবলি সম্পর্কে ধারণা দিয়ে থাকে।

বিশ্ব মানবসমাজ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র নামে পরিচিত ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক এককে আলাদাভাবে বাস করে। কিন্তু কোন রাষ্ট্রই এককভাবে মানুষের সমস্ত অভাব-অভিযোগ মিটিয়ে তার সর্বাঙ্গীণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, রাষ্ট্রসমূহ একে অপরের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই মানুষের বিভিন্নমুখী প্রয়োজন মেটানোর খাতির অপর রাষ্ট্রগুলোর সাথে লেনদেন করতে হয়। এ-লেনদেন যাতে সুচারুরূপে নির্বাহ করা যায়, সে-ব্যাপারে দরকার তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক রক্ষা করা। তাই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের প্রধান উদ্দেশ্য হল কীভাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করা ও বজায় রাখা যায় সে-সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

বর্তমান বিশ্বে আরেকটি মারাত্মক সমস্যার উদ্ভব আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যয়নকে অধিক গুরুত্বপুর্ণ করে তুলেছে। এটি হল আন্তর্জাতিক পরিবেশ দূষণজনিত সমস্যা যা সমগ্র মানবজাতিকে উদ্বিগ্ন করে রাখছে।

এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, ব্যক্তিজীবনের মতো রাষ্ট্রীয় জীবনেও শান্তি মানুষের পরম কাম্য। রাষ্ট্রসমূহ পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করলে বিশ্বশান্তির অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হবে। এতে করে সবাই লাভবান হবে, অন্যথায় নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও উত্তেজনা যুদ্ধের জন্ম দিয়ে ধ্বংস ডেকে আনবে। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রসমূহের কী করণীয় সে-সম্বন্ধে ধারণা দিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্বশান্তি রক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বর্তমানকালে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটি পরিপূর্ণ অধীতব্য বিষয় হিসেবে যতই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করছে, ততই আমরা পূর্বের ঐতিহাসিক বর্ণনামূলক ও আদর্শবাদী গবেষণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর রাষ্ট্রের প্রকৃত আচরণকে বিশ্লেষণের উপযোগী তত্ত্ব উন্নয়নের দিকে পণ্ডিতদের ঝোঁক দেখতে পাচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে কোন রাষ্ট্র কেন ও কী অবস্থায় সহযোগিতামূলক আচরণ (cooperative behaviour) ও দ্বন্দ্বমূলক আচরণ (conflict behaviour) প্রদর্শন করে, তা যদি আমরা জানতে পারি, তবে আন্তর্জাতিক সমস্যা বোঝা ও তার সমাধানের পথ নির্দেশ করা সহজতর হয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বর্তমান বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলো এই বিশেষ দিকটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারকদেরকে এ-ব্যাপারে বাস্তবমুখী করে তোলে। সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যয়নও রাষ্ট্রীয় আচরণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য অতি প্রয়োজনীয় ও উপকারী।

Go to Contents
http://thejobstudy.com

পরিশিষ্ট

বিষয়বিশ্লেষণ
Content Analysis

বিষয়বিশ্লেষণ কী?

সামাজিক বিজ্ঞানের উর্বর ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে যেখানে প্রায়শ মানুষের বহুমুখী আচরণ সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা ও ঐগুলোর সমাধানের উপায় খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে সুসংবদ্ধ গবেষণা পরিচালনা করা হয়, যেমন অর্থনীতিবিদগণ জানতে চান যে, কোন দেশের অর্থনীতিতে বেসরকারি বিদেশী বিনিয়োগের ফলাফল কী; সমাজ বিজ্ঞানিগণ জানতে চান যে, উঠতি বয়সের যুবক-যুবতীদের নেশাসক্তি সমাজে কীরূপ প্রভাব ফেলতে পারে; মনোবিজ্ঞানিগণ জানতে চান যে, বর্তমান বিশ্বে অধিক সংখ্যক হতাশাগ্রস্ত যুবক-যুবতীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কী করা দরকার; রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ জানতে চান যে, কোন নির্বাচনের সময় কোন একটি বিশেষ রাজনৈতিক ইস্যুতে ভোটারগণ কী ধরনের আচরণ করবে ইত্যাদি; অনুরূপভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন পণ্ডিত ও গবেষক সর্বদাই গবেষণাকার্যে নিয়োজিত, যার অধিকাংশের উদ্দেশ্য হল সিদ্ধান্তপ্রণেতাদের কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কীরূপ প্রভাব ফেলতে পারে অথবা কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে কী ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত, সে-সম্পর্কে তাঁদেরকে তাত্ত্বিক জ্ঞান সরবরাহের মাধ্যমে সহায়তা করা। এ-ধরনের গবেষণাকে সুসংবদ্ধ করতে বিষয় বিশ্লেষণ বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গবেষণার মূল প্রচেষ্টা হল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উদ্ভাবন ও উন্নয়ন, যা নীতিনির্ধারকদেরকে তাঁদের প্রণীত নীতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে, সে-সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টির জোগান দিয়ে তাঁদেরকে অবশ্য করণীয় সম্পর্কে অবহিত করতে পারে। এ-ধরনের তত্ত্ব উন্নয়নের একটি প্রয়োজনীয় ধাপ হল বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প (hypothesis) প্রস্তাব করে তা উপাত্তের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা। গবেষকগণ এখন বিষয়বিশ্লেষণকে এরূপ উপাত্ত সংগ্রহের একটি কৌশল হিসেবে বহুলভাবে ব্যবহার করছেন।

সাধারণভাবে কোন পণ্ডিত তাঁর গবেষণা প্রকল্প পরিচালনার সময় অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন, যেগুলোকে কোন বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে উপাত্তে পরিণত করা হয়, যা তাঁর প্রকল্প পরীক্ষার কাজে লাগে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে, বিশেষত সিদ্ধান্ত-প্রণয়ন কাঠামো উদ্ভাবন ও উন্নয়নে, প্রধান সিদ্ধান্তগ্রহণকারীর সঠিক মনোভাব তাঁর বিভিন্ন বক্তব্য ও অন্যান্য দেশের সাথে যে-সব গুরুত্বপূর্ণ দলিল বিনিময় করা হয়, তা থেকে বিষয়বিশ্লেষণ প্রণালীর মাধ্যমে উদ্ধার করা হয়। তাঁদের এ-ধরনের বক্তব্য সংবলিত

http://thejobstudy.com

পুস্তকাদি ও সরকারি দলিলদস্তাবেজ দীর্ঘাকৃতি হয়ে থাকে। এগুলো থেকে তাঁদের মূল মনোভাব আহরণ করতে যে-কৌশল অবলম্বন করা হয়, তার নাম বিষয় বিশ্লেষণ। আলেক্সান্ডার জর্জ (Alexander George)-এর মতে, 'কোন বক্তার উদ্দেশ্যমূলক আচরণের কিছু দিক সম্পর্কে বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বিষয় বিশ্লেষণকে একটি বৈশিষ্ট্যমূলক যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়।'[৩৩]

বিষয়বিশ্লেষণকে দীর্ঘায়িত মৌখিক প্রতিবেদনকে সার-সংক্ষেপে কমিয়ে আনতে এবং এরপর একই ধরনের প্রতিবেদনকে শ্রেণিতে বিভক্ত করতে যেগুলোকে সংখ্যায় প্রকাশ করা যায় এরূপ পদ্ধতি হিসেবে[৩৪] সংজ্ঞায়িত করা হয়। বার্নার্ড বেরেলসন (Bernard Berelson), যিনি বিষয়বিশ্লেষণের উপর প্রথমবারের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেন এবং এটাকে জনপ্রিয় করে তোলেন, বিষয়বিশ্লেষণকে 'যোগাযোগের প্রকাশ্য বিষয়কে বস্তুগত, সুসংবদ্ধ ও পরিমাণগতভাবে বর্ণনা করার জন্য' একটি গবেষণা কৌশল হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।'[৩৫] আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশিষ্ট পণ্ডিত অধ্যাপক হলস্টি (Ole R. Holsti) বিষয়বিশ্লেষণকে একটি পদ্ধতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যার মাধ্যমে 'অবিশ্লেষিত উপাত্তকে নিয়মবদ্ধভাবে এককে রূপান্তরিত ও একত্র করা হয়, যার ফলে প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহকে যথাযথভাবে বর্ণনা করতে সুবিধা হয়।[৩৬] এভাবে বলা যায় যে, বিষয়বিশ্লেষণ হল একটি কৌশল, যা দ্বারা যে-কোন প্রকার যোগাযোগের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করা ও এতদসম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়।

বিষয়বিশ্লেষণে অনুসৃত পদ্ধতি

বিষয়বিশ্লেষণের জন্য পদ্ধতি অবলম্বনের ক্ষেত্রে, দুটো দিকের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে : যে-বিষয়বৈশিষ্ট্যগুলোকে পরিমাপ করতে হবে, তা স্বতন্ত্র করা এবং উপাত্তের বৈশিষ্ট্যগুলোর শনাক্তকরণ ও তালিকাভুক্তির জন্য মাপদণ্ড প্রয়োগ করা।

প্রথমেই ঠিক করে নিতে হয় সরকারি নথিপত্র অথবা পরস্পরের মধ্যে বিনিময়কৃত দলিলদস্তাবেজের মধ্য থেকে কী ধরনের বৈশিষ্ট্যমূলক বিষয় আহরণ করতে হবে। এটা অনেকটা নির্ভর করে গবেষক সিদ্ধান্তপ্রণেতাদের কোন বিশেষ দিকটি সম্পর্কে জানতে চান তার উপর। এরপর তাঁকে পরিমাপের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয়। এ-জন্য তিনি পরিমাপের দুটো মূল এককের একটিকে তাঁর প্রয়োজনানুযায়ী বেছে নিতে পারেন। এ দুটো হল : সংকেত একক (coding unit) ও বর্ণনা একক (context unit)। সংকেত একক সাধারণত আহরণ করা হয় কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয় কোন একটি নথিতে একই অথবা সমার্থক শব্দ অথবা ভাব দ্বারা কতবার উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো গণনার মাধ্যমে। এবং বর্ণনা একক অনুরূপভাবে আহরণ করা হয় বক্তা কতবার কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে কতবার বর্ণনা করেছেন তার গণনার মাধ্যমে। এ-ধরনের গণনার কাজ শেষ হলে তিনি যথোপযুক্ত পরিসংখ্যান পরীক্ষার মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করেন যে, তাঁর নাস্তি-প্রকল্প বর্জন করতে হবে কি না অথবা তা সাময়িকভাবে গ্রহণযোগ্য কি না।

বিষয় বিশ্লেষণের উদাহরণ হিসেবে অধ্যাপক হলস্টির 'চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে বাইরের দ্বন্দ্ব ও অভ্যন্তরীণ ঐকমত্য' শীর্ষক গবেষণাকর্মটির উল্লেখ করা যায়।[৩৭] এখানে হলস্টি যে-প্রকল্পটি পরীক্ষা করেন তা হল : ব্লক অভ্যন্তরস্থ সম্পর্ক দুই ব্লকের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মাত্রা অথবা প্রকল্পের প্রচলিত উক্তি অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যকার তীব্র উত্তেজনা চলাকালে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার সম্পর্কে অধিক ঐকমত্য পরিলক্ষিত হবে, কিন্তু পক্ষান্তরে উত্তেজনা কমে গেলে ঐকমত্যের মাত্রাও নেমে যাবে।

যেহেতু হলস্টিন গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মনোভাব সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছা, তাই তিনি তাঁর প্রকল্পকে নিম্নরূপে কার্যকরভাবে ব্যক্ত করেন :

দুই ব্লকের মধ্যে যখন পারস্পরিক দ্বন্দ্বের পরিমাণ বেশি থাকে তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের একই ধরনের মনোভাব ব্যক্ত করার ঝোঁক থাকবে, পক্ষান্তরে উত্তেজনা কম থাকলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতির প্রতি তাদের মনোভাব ভিন্নমুখী হবে।

অধ্যাপক হলস্টি তাঁর গবেষণায় উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করেন ৩৮টি সোভিয়েত ও ৪৪টি চীনা নথি, যাতে সর্বমোট প্রায় ১৫০,০০০ শব্দ ছিল। ঐগুলো ১৯৫০ থেকে ১৯৬৫ সন পর্যন্ত সাতটি নির্বাচিত সময়পরিধির প্রতিনিধিত্ব করে, যার মধ্যে নিম্নবর্ণনা অনুযায়ী দুটো সময়পরিধি ছিল, যখন পূর্ব-পশ্চিম সম্পর্ক ছিল তুলনামূলকভাবে শান্ত, চারটির ক্ষেত্রে তা ছিল তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ এবং একটি সময় পরিধিতে যুদ্ধে না গিয়ে তারা বিরাট একটি সংকট সমাধানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল :

১.	জুন ২৮-২৯, ১৯৫০	কোরিয়ার যুদ্ধের সূচনা।
২.	সেপ্টেম্বর ১৫-২৫, ১৯৫৯	প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর।
৩.	এপ্রিল ১২-২৫, ১৯৬১	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিউবা আক্রমণ।
৪.	অক্টোবর ২২-২৫, ১৯৬২	কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের চরম মুহূর্ত।
৫.	অক্টোবর ২৬-৩১, ১৯৬২	'দর কষাকষির সময়' যা কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট সমাধান করে।
৬.	জুলাই ২৫-আগস্ট ৫, ১৯৬৩	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গ্রেটব্রিটেন কর্তৃক পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি স্বাক্ষর।
৭.	ফেব্রুয়ারি ৮, ১৯৬৫	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণের সিদ্ধান্ত।

অধ্যাপক হলস্টি পূর্বোক্ত নথিগুলোর বিষয়বিশ্লেষণ করে যে-উপাত্ত পান, তা নিম্নের সারণিতে দেখানো হল :

রাষ্ট্রীয় নীতি-গুরুত্ব আরোপকৃত (ঘটমান সংখ্যা × তীব্রতা) মোট পরিমাণ

http://thejobstudy.com

সোভিয়েত ইউনিয়ন

	জুন ২৮-২৯ ১৯৫০	সেপ্টেম্বর ১৫-২৫ ১৯৫৯	এপ্রিল ১২-২৫ ১৯৬১	অক্টোবর ২২-২৫ ১৯৬২	অক্টোবর ২৬-৩১ ১৯৬২	জুলাই ২৫-আগস্ট ৫ ১৯৬৩	ফেব্রুয়ারি ৮ ১৯৬৫
ধনাত্মক	৭	৭৫৪	৩৯	২৩	৬১	১০	৬
ঋণাত্মক	৪৯	২২৬	২১১	২৫৮	৮০	১০	১০৪
শক্তিশালী	৮৭	৭৪৬	২৭৯	৩৫৯	১২৬	৩৫	১৩৫
দুর্বল	৩	১১৭	২৭	১৬	২৫	৩	৩
সক্রিয়	৭৬	৫৩০	২৬৪	২৮৯	১৫৯	২১	১৩৯
নিষ্ক্রিয়	১০	২৪২	৬৩	৫৩	৫০	৫	২

চীন

	জুন ২৮-২৯ ১৯৫০	সেপ্টেম্বর ১৫-২৫ ১৯৫৯	এপ্রিল ১২-২৫ ১৯৬১	অক্টোবর ২২-২৫ ১৯৬২	অক্টোবর ২৬-৩১ ১৯৬২	জুলাই ২৫-আগস্ট ৫ ১৯৬৩	ফেব্রুয়ারি ৮ ১৯৬৫
ধনাত্মক	১৬	৩১	১২৫	৩	২৭	৮৬	১
ঋণাত্মক	১২৭	৭০	১১৯৬	২৬৯	১০৪০	৭৭৪	১২৫
শক্তিশালী	১২০	১৪০	১০৫৫	২৪৩	৮১৬	৬৭৫	১১৬
দুর্বল	২	১১	৮১	১৭	৬৩	২০	২
সক্রিয়	১৪২	১১৪	৯৫৪	২১৬	৮১৮	৪৯৯	১১৫
নিষ্ক্রিয়	৮	২১	৭৫	১৮	৭৫	৫৯	২

পরিশেষে, চীন-সোভিয়েত উপলব্ধিসমূহের সমকেন্দ্রিকতার উপর দুই ব্লকের মধ্যকার পারস্পরিক উত্তেজনার প্রভাব সম্পর্কিত প্রকল্প পরীক্ষার জন্য তিনি পূর্ব-পশ্চিম দ্বন্দ্বের তীব্রতা ও হ্রাসপ্রাপ্ত অবস্থাসমূহ ভাগ করে উপাত্তকে যেভাবে একত্রে সন্নিবেশ করেছেন, তা নিচের সারণিতে দেখানো হল :

দুই ব্লকের মধ্যে তীব্র বিরোধ (জুন, ১৯৫০; এপ্রিল, ১৯৬১; অক্টোবর ২২-২৫, ১৯৬২; ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫)		দুই ব্লকের মধ্যে স্বল্প বিরোধ (সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯; অক্টোবর ২৬-৩১ ১৯৬২; জুলাই-আগস্ট, ১৯৬৩)	
সোভিয়েত ইউনিয়ন	চীন	সোভিয়েত উইনিয়ন	চীন
ধনাত্মক	৭৫ (১০.৮%)	১৪৫ (৭.৭%)	৮২৫ (৭২.৩%)	১৪৪ (৭.১%)
ঋণাত্মক	৬২২ (৮৯.২%)	১৭৪৭ (৯২.৩%)	৩১৬ (২৭.৭%)	১৮৮৪ (৯২.৯%)
শক্তিশালী	৮৬০ (৯৪.৬%)	১৫৩৪ (৯৩.৮%)	৯০৭ (৮৬.২%)	১৬৩১ (৯৪.৬%)

Go to Contents
http://thejobstudy.com

দুই ব্লকের মধ্যে তীব্র বিরোধ (জুন, ১৯৫০; এপ্রিল, ১৯৬১; অক্টোবর ২২-২৫, ১৯৬২; ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫)		দুই ব্লকের মধ্যে স্বল্প বিরোধ (সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯; অক্টোবর ২৬-৩১ ১৯৬২; জুলাই-আগস্ট, ১৯৬৩)	
সোভিয়েত ইউনিয়ন	চীন	সোভিয়েত উইনিয়ন	চীন
দুর্বল	৪৯ (৫.৪%)	১০২ (৬.২%)	১৪৫ (১৩.৮%)	৯৪ (৫.৪%)
সক্রিয়	৭৬৮ (৮৫.৭%)	১৪২৭ (৯৩.৩%)	৭১০ (৭০.৫%)	১৪৩১ (৮৯.৭%)
নিষ্ক্রিয়	১২৮ (১৪.৩%)	১০৩ (৬.৭%)	২৯৭ (২৯.৫%)	১৬৫ (১০.৩%)

বিষয়বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, কোরিয়া, কিউবা ও ভিয়েতনামকে কেন্দ্র করে সর্বোচ্চ সংকটজনক সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতির প্রতি চীনা ও সোভিয়েত মনোভাব অনেকটা একইরকম ছিল। উভয়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মূল্যায়ন, শক্তিমত্তা ও কার্যাবলির মাত্রাসমূহে প্রধানত ঋণাত্মক, শক্তিশালী ও সক্রিয় প্রান্তে উপলব্ধি করত। পক্ষান্তরে, যে-তিনটি সময়পরিধিতে পূর্ব-পশ্চিমের উত্তেজনা কম ছিল, তখন উল্লিখিত তিনটি মাত্রায়ই তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ সময়ের চেয়ে চীনা ও সোভিয়েত উপলব্ধিতে অধিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

বিষয়বিশ্লেষণের সমস্যাবলি

এ-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসার মানুষের আচরণ সম্পর্কে অধ্যয়নকে অধিক সাফল্যজনকভাবে সমাধা করতে সহায়তা করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের আচরণের মতো এত জটিল বিষয় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা অতি দুরূহ। মানবমন সম্পর্কে অন্যান্য অধ্যয়নের মতো মানুষের উদ্দেশ্য, আবেগ ও মনোভাব সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য বিষয়বিশ্লেষণকে ব্যবহার করতে গেলেও এই সমস্যাগুলো এড়ানো প্রায় অসম্ভব। তাই বিষয়বিশ্লেষণও সমস্যামুক্ত নয়। এ-সমস্যাসমূহের কিছুসংখ্যক ক্রিয়াপ্রণালীপ্রসূত, যা অধিক সতর্কতা অবলম্বন করলে পুরোপুরি এড়ানো না গেলেও অনেকটা দূর করা যায়। তবে যে-সমস্যাগুলো মানবপ্রকৃতিতে অন্তর্নিহিত সেগুলোর সমাধান বিশেষজ্ঞদের পক্ষেও প্রায় অসম্ভব। নিম্নে এই সমস্যাগুলোর উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হল।

প্রথমেই ধরা যাক ক্রিয়াপ্রণালীপ্রসূত (operational) সমস্যা, যার মধ্যে পরিমাপ (measurement) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর দুটো দিক আছে : বৈধতা (validity) ও নির্ভরযোগ্যতা (reliability)। বৈধতা নির্দেশ করে কোন একটি বিশেষ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির যথার্থতা সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি কতটুকু একমত পোষণ করেন। অন্য কথায় বলতে গেলে বৈধ পদ্ধতি হল সেই পদ্ধতি, যা কোন কিছু করতে গেলে সঠিকভাবে করে। বিষয়বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, এই পদ্ধতির মাধ্যমে যে-

http://thejobstudy.com

ধারণা সম্পর্কে গবেষক উপাত্ত আহরণ করতে ইচ্ছুক, তিনি যদি সংশ্লিষ্ট নথিপত্র থেকে সেটিই সমাধা করতে পারেন অর্থাৎ অন্য কোন ধারণার বিষয় যদি এখানে অনুপ্রবেশ না করতে পারে, তবে সেটি বৈধ বলে পরিগণিত হবে। বৈধতা সমস্যাটির সমাধানের জন্য কিছু সুপরিচিত পদ্ধতি যথা জুরি, পরিচিত গ্রুপ, স্বাধীন মানদণ্ড ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

নির্ভরযোগ্যতা বলতে সাধারণত বোঝায় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে কোন ভুল হয়ে থাকলেও তার পরিমাণ ন্যূনতম। বিষয়বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বলতে গেলে কোন গবেষক যে-ধারণা সম্পর্কে উপাত্ত আহরণ করতে চান, তিনি যদি সংশ্লিষ্ট নথিপত্র থেকে মোটামুটি সবগুলো—অর্থাৎ বেশিও না, কমও না—উদ্ধার করতে পারেন তবে তা নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে কিছু প্রামাণ্য পরীক্ষা যথা পরীক্ষা-পুনঃপরীক্ষা (test-retest), দ্বিধাবিভক্তি (split-halves) প্রভৃতির আশ্রয় নেয়া যায়।

এভাবে ক্রিয়াপ্রণালীপ্রসূত সমস্যার আংশিক সমাধান করা গেলেও মানবমনে অন্তর্নিহিত যে-সমস্যা বিদ্যমান তা দূর করা অতি দুরূহ। অধ্যাপক হলস্টি নিজে এ-ব্যাপারে যথার্থই বলেছেন যে, 'সমস্যা হল যে-কোন ব্যক্তির বক্তব্য ও তার অভিপ্রায়, ব্যক্তিত্ব, উদ্দেশ্য ইত্যাদির মধ্যকার সম্পর্ক বড়জোর অস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয়'।[৩৮] শুধু যে অনেক বক্তৃতা, বিবৃতি, আত্মজীবনী প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজে না লিখে তাঁর ব্যক্তিগত সচিব অথবা অন্যান্য বিশেষজ্ঞকে দিয়ে লেখান এবং এর ফলে এগুলো পুরোপুরিভাবে তাঁর মনোভাবকে প্রতিফলিত করে না, তাই নয়, 'অনেক সরকারি কর্মকর্তা তাঁদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র এবং আত্মজীবনীতে হয় ব্যক্তিগত প্রবৃত্তিজনিত কারণে অথবা তাঁদের রীতিগত ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেক কথাই প্রকাশ করেন না।[৩৯] এতে অবশ্য নিরুৎসাহিত হওয়া ঠিক নয়, কারণ সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণায় এ-ধরনের সীমাবদ্ধতা থাকবেই। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যেকানে বিষয়বিশ্লেষণের প্রধান লক্ষ্য হল 'বক্তা অথবা লেখকের অভিপ্রায়গত, আবেগগত ও মনোভাবগত অবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া' সেখানে এটা যথার্থই 'স্বজ্ঞালব্ধ, বিষয়গত সংনির্ণয়ের উপর বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে'।[৪০]

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গবেষণায় বিষয়বিশ্লেষণের ব্যবহার

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গবেষণায় বিষয়বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে বিভিন্নভাবে ফলপ্রসূরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে। বিষয়বিশ্লেষণের মাধ্যমেই বোঝা সম্ভব যে, কোন দেশের সরকার পরিবর্তন অথবা অন্য কোন কারণে সে-দেশের পররাষ্ট্রনীতিতে কোন পরিবর্তন এসেছে কি না। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কোন গবেষক যদি জানতে চান যে, শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর জেনারেল জিয়া, অথবা জিয়ার মৃত্যুর পর জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় আসার পর বহির্বিশ্বের সাথে, বিশেষত ভারত অথবা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর সাথে, বাংলাদেশের সম্পর্কে কোন লক্ষণীয়

পরিবর্তন এসেছে কি না, তবে এ-তিন সরকারের আমলের গুরুত্বপূর্ণ নথিগুলোর বিষয়বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবেন। একইভাবে আয়াতুল্লাহ খোমেনির মৃত্যুর পর ইরান-ইরাক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইরাকের মনোভাব প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের বিভিন্ন বক্তব্যের বিষয়বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝা সহজ। সোভিয়েত নেতা গর্বাচেভ (Mikhail Gorbachev) ক্ষমতায় আসার পর তিনি যে-বক্তব্য প্রদান করতে শুরু করেন, তার সুষ্ঠু বিষয়বিশ্লেষণ করলে কোন গবেষক সোভিয়েত নীতিতে সুস্পষ্ট পরিবর্তনের আভাস লক্ষ করতে পারতেন।

পাদটীকা

১. Norman D. Palmer and Howard C. Perkins, *International Relations : The World Community in Transition* (Calcutta : Scientific Book Agency, 1970), p. xi.
২. দেখুন Adi H. Doctor, *International Relations : An Introductory Study* (New Delhi : Vikas Publications, 1969), পৃ. ২-৩।
৩. দেখুন, ঐ, পৃ. ৩।
৪. ঐ, পৃ. ২।
৫. দেখুন, Palmer and Perkins, *op. cit., p. xiv.*
৬. C. Dale Fuller, *Training of Specialists in International Relations* (Washingston, D. C. : American Council on Education, 1971), p. 26. Quoted in Palmer and Perkins, *op. cit., p. xii.*
৭. দেখুন, Doctor, প্রাগুক্ত, পৃ. ১।
৮. Introduction in Stanley Hoffmann (ed.), *Contemporary Theory in International Relations* (New Jersey : Prenticee-Hall, 1960), p. 1, quoted in Palmer and Perkins, *op. cit., p. xii.*
৯. Morton A. Kaplan, 'Is International Relations a Discipline?' in *The Journal of Politics*, XXIII (August 1961), p. 464. Quoted in Ibid.
১০. Warren R. Phillips, 'Where have all the Theories Gone?' in *World Politics*, Vol, xxvi, No. 2 (January, 1974), pp. 155-88.
১১. Arend Lijphart, 'The Structure of the Theoretical Revolution in International Relations', in *International Studies Quarterly*,Vl. xviii, No. 1 (March 1974).
১২. Charles W. Ostrom, Jr., 'Evaluating Alternative Foreign Policy Decision Making Models', in *Journal of Conflict Resolution*, Vol. XXI, no. 2 (September, 1968).
১৩. Kenneth Boulding, *Conflict and Defense*, (New York, 1962).
১৪. William Riker, *The Theory of Political Coalitions* (New Haven, 1962).
১৫. Bruce M. Russett, 'Components of an Operational Theory of Alliance Formation', *Journal of Conflict Resolution*, Vol. XII, no. 3 (September, 1968).

http://thejobstudy.com

১৬. Frank C. Zagare, 'Toward a Reformulation of the Theory of Mutual Deterrence', in *International Studies Quarterly*, vol. XXIX, No. 2 (June 1985), pp. 155-69.
১৭. দেখুন, James Caporaso, 'Methodological Issues in the Measurement of Inequality, Dependence and Exploitation', in Stephen J. Rosen and James R. Kurth (eds.), *Theories of Economic Imperialism* (Lexington Books, 1974), pp. 93-94.
১৮. *Ibid., p. 92.*
১৯. দেখুন, Michael P. Sullivan, *International Relations : Theories and Evidence* (New Jersey : Prentice-Hall Inc., 1976), p. 212.
২০. দেখুন, James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *Contending Theories of International Relations* (New York: J. B. Lippincot Co., 1971), p. 293.
২১. *Ibid.*, p. 288.
২২. *Ibid., p. 283.*
২৩. স্টানফোর্ড দলের প্রকাশনাসমূহের মধ্যে নিচেরগুলো উল্লেখযোগ্য :
Ole R. Holsti, 'The 1914 Case', in John E. Mueller (ed), *Approaches to Measurement in International Relations* (New York : Meredith Corporation, 1969); Ole R. Holsti, *Crisis, Escalation, War* (Montreal : McGill-Queens University Press, 1972): Ole R. Holsti, Robert C. North and Richard A. Brody, 'Perception and Action in the 1914 Crisis', in J. David Singer (ed.), *Quantitative International Politics : Insights and Evidence* (New York : The Free Press, 1968); and Dina A. Zinnes, Robert C. North and H. E. Koch, 'Capability, Threat and the Outbreak of War', in James N. Rosenau (ed.), *International Politics and Foreign Policy* (New York : The Free Press, 1969), pp. 469-82.
২৪. এ-সম্পর্কে ২১.১২.৮৫ তারিখে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির চতুর্থ জাতীয় সম্মেলনে পঠিত আমার 'SAARC : A Theoretical Assessment' শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
২৫. Robin F. Marra, 'A Cybernetic Model of the U.S. Defense Expenditure Policy-making Precess', in *International Studies Quarterly*, vol. xxiv, no. 4 (December 1985), pp. 357-84.
২৬. Edward Gulick, *Europe's Classical Balance of Powerr* (New York : Cornell University Press, 1955).
২৭. Inis L. Claude, *Power and International Relations* (New York : Random House, 1962).
২৮. Dina Zinnes, 'An Analytical Study of the Balance of Power Theories', in *Journal of Peace Research*, Vol. IV, no. 3 (1967), pp. 270-88.
২৯. Brian Healy and Arthur Stein, 'The Balance of Power in International History : Theory and Reality', in *Journal of Conflict Resolution*, vol. XVII, no. 1 (March 1973).

৩০. Dina Zinnes, 'The Problem of Cumulation', in James N. Rosenau (ed.), *In Search of Global Patterns* (New York : The Free Press, 1976), p. 162.
৩১. ঐ।
৩২. G. R. Boynton, 'Cumulativeness in International Relations', in ঐ, পৃ. ১৪৭।
৩৩. Alexander L. George, 'Quantitative and Qualitative Approaches to Content Analysis', in Ithiel de Sola Pool (ed.), *Trends in Content Analysis* (Urbana : Univ. of Illinois Press, 1961), p. 7.
৩৪. Doris Muehl (ed)., *A Manual for Coders* (a publication of Survey Research Center, Univ. of Michigan, Ann Arbor, Michigan, 1961), p. 9.
৩৫. Ole R. Holsti, *Content Analysis in Communication Research* (New York : The Free Press, 1952, p. 18
৩৬. Ole R. Holsti, *Content Analyssis for the Social Sciences and Humanities* (Reading, Mass : Addison Wesley, 1969), p. 94.
৩৭. Ole R. Holsti, 'External Conflict and Internal Consensus : The Sino-Soviet Case', in Philip J. Stone, Dexter C. Dunphy, Marshall S. Smith, Daniel M. Ogilvie and associates, *The General Inquirer : A Computer Approach to Content Analysis* (Cambridge, Mass : The M. I. T. Press, 1966), pp. 343-356. For a better understanding, largely quoted from it.
৩৮. Holsti, O. R., *Content Analysis for the ... op. cit.*, p. 32.
৩৯. Pool, *op. cit., p. 187.*
৪০. George F. Mahl, 'Exploring Emotional States by Content Analysis', in Pool, *op. cit.*, p. 89, and John A. Garraty, 'The Application of Content Analysis to Biography and History', in Pool, *op. cit.*, p. 185.

Go to Contents
http://thejobstudy.com

Job Study
To make you prepared & confident

দ্বিতীয় অধ্যায়

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

VARIOUS PERSPECTIVES OF INTERNATIONAL RELATIONS

আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকেন। এটা অনেকটা নির্ভর করে তাঁদের ব্যক্তিগত অতীত অভিজ্ঞতা, শিক্ষাদীক্ষা, পরিবেশ প্রভৃতির উপর। তাঁরা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে কীভাবে ব্যাখ্যা ও পরীক্ষা করবেন, তা স্বভাবতই তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি (perspective) দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এ-ব্যাপারে বিশিষ্ট জার্মান মনীষী ম্যাক্স ভেবার (Max Weber) যথার্থই বলেছেন যে, 'সাংস্কৃতিক বাস্তবতা সম্পর্কিত সকল জ্ঞান সর্বদা কোন বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে উৎসারিত' (All knowledge of cultural reality is always knowledge from particular points of view.)[১]। তাই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নেও এই দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক।

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কে তিনটি বিকল্প ভাবমূর্তি অথবা দৃষ্টিভঙ্গি (three alternative images or perspectives) সম্বন্ধে আলোচনা করব। এগুলো হল : বাস্তববাদ (realism), বহুত্ববাদ (pluralism) ও বিশ্ববাদ (globalism)। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রকে এরূপ তিনটি ভাবমূর্তি দ্বারা চিত্রায়িত করার অনুপ্রেরণা প্রদান করেন বিশিষ্ট তাত্ত্বিক রোজনু (James N. Rosenau), যিনি সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক রাজনীতি অধ্যয়নের ব্যাপারে রাষ্ট্র-কেন্দ্রিক (state-centric), বহু-কেন্দ্রিক (multi-centric) ও বিশ্ব-কেন্দ্রিক (global-centric) এ-তিনটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।[২] পল ভিয়ট্টি (Paul Viotti) ও মার্ক কাউপ্পি (Mark Kauppi) চমৎকারভাবে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিককে ব্যাখ্যা করতে যে তত্ত্ব উন্নয়নের আবশ্যক, এ-ভাবমূর্তিসমূহ সে-ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ভিত্তি জোগায়।[৩] প্রত্যেকটি ভাবমূর্তি বিশ্বরাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ যথা কর্মক,

বিচার্যবিষয়াবলি ও পদ্ধতিসমূহ (actors, issues and processes) ইত্যাদি সম্পর্কে নির্দিষ্ট পূর্বানুমান (assumption) ধারণ করে। এভাবে একজন গবেষক যদি কোন একটি বিশেষ ভাবমূর্তিতে আস্থা স্থাপন করেন তবে তিনি ঐ দৃষ্টিভঙ্গির আওতার মধ্যেই বিশেষ ধরনের প্রশ্ন তুলবেন এবং এগুলোর উত্তর খুঁজেপেতে বিশেষ ধরনের গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করে প্রকল্প (hypothesis) প্রণয়ন ও তত্ত্ব উন্নয়ন করবেন। এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক যে, যদিও বাস্তববাদী, বহুত্ববাদী ও বিশ্ববাদী ভাবমূর্তিসমূহ সকল দিক থেকে পারস্পরিকভাবে বর্জনশীল (mutually exclusive) নয়, তবু তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও গুরুত্ব প্রদানের পার্থক্য তাদের মধ্যকার আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান সাদৃশ্যাবলি থেকে অনেক বেশি।

এখন আমরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তিনটি ভাবমূর্তির মধ্যকার সবচেয়ে স্পষ্ট অথবা তাৎক্ষণিকভাবে আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান দুটো পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা করব। এগুলো হল : আন্তর্জাতিক সম্পর্কের (১) প্রধান কর্মক অথবা বিশ্লেষণের একক (unit of analysis) এবং (২) তাদের সম্পর্কে সত্য বলে ধরে নেয়া হয়েছে এমন উক্তিসমূহ (assumptions)।

বাস্তববাদ দিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক। বাস্তববাদ চারটি প্রধান পূর্বানুমানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। প্রথমত, রাষ্ট্র হল প্রধান অথবা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মক। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে প্রাচীন গ্রিসের নগররাষ্ট্র থেকে শুরু করে আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের যুগ পর্যন্ত সবসময়ই রাষ্ট্রই প্রধান বিশ্লেষণের একক। বহুজাতিক কর্পোরেশনসমূহ, সন্ত্রাসী দলসমূহ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনকে বাস্তববাদীরা প্রায়শ স্বীকার করে নিলেও তাঁরা মনে করেন যে, এ-সকল অ-রাষ্ট্রীয় কর্মকের (non-state actors) স্থান অনেকটা গৌণ ও কম গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে তাঁরা রাষ্ট্রসমূকেই কর্তৃত্বপূর্ণ কর্মক মনে করেন।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রকে ঐকিক কর্মক (unitary actor) হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে, অর্থাৎ কোন রাষ্ট্রের সরকার এক ও অভিন্ন কণ্ঠে সমগ্র রাষ্ট্রের পক্ষে কথা বলে। এখানে কোন সরকারি সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমলাদের মধ্যকার মতপার্থক্য, সরকারবর্হিভূত অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ইত্যাদি গণনার মধ্যে আনা হয় না।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রকে মূলত যৌক্তিক কর্মক (rational actor) হিসেবে দেখা হয়। যৌক্তিক পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক সিদ্ধান্ত প্রণয়নের ব্যাপারে বলা চলে যে, যদি একবার উদ্দেশ্যাবলি নির্ধারণ করা হয়, তবে এরপর দেখা হয় যে, এগুলো অর্জনের জন্য কী কী বিকল্প পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে এবং প্রত্যেকটি বিকল্পে কী সুবিধা আছে ও তা অর্জনে কতটুকু খরচ করতে হবে। এ-পদ্ধতি অবলম্বন করে সরকারি সিদ্ধান্ত প্রণেতাগণ বিভিন্ন বিকল্পকে মূল্যায়ন করেন এবং যেটি বেশি উপযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়, সেটি গ্রহণ করেন। অর্থাৎ যৌক্তিক সিদ্ধান্ত বলতে সেইটিকে বোঝায়, যেটি কম খরচে অধিক সুবিধা আদায়ের নিশ্চয়তা দেয়।

http://thejobstudy.com

চতুর্থত, বাস্তববাদিগণ সত্য বলে ধরে নেন যে, আন্তর্জাতিক বিচার্য বিষয়াবলির প্রাধান্য পরম্পরায় জাতীয় নিরাপত্তা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের দাবি রাখে। তাঁদের নিকট শক্তিই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। তাঁরা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে প্রায় একচেটিয়াভাবে শক্তির লড়াই (struggle for power) হিসেবে মনে করেন। বাস্তববাদীরা সামরিক নিরাপত্তা অথবা রণকৌশলগত বিষয়াবলিকে উচ্চ রাজনীতি (high politics) এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াবলিকে নিম্ন রাজনীতি (low politics) বলে অভিহিত করে থাকেন।

এরপরের দৃষ্টিভঙ্গিটি হল বহুত্ববাদ। এটিও চারটি মূল পূর্বানুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত, বহুত্ববাদিগণ মনে করেন যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে অ-রাষ্ট্রীয় কর্মকসমূহও গুরুত্বপূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তা (entity), যেগুলোকে অবহেলা করা যায় না। বর্তমানের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার যুগে কিছুসংখ্যক অ-রাষ্ট্রীয় কর্মক, যেমন, বহুজাতিক কর্পোরেশনসমূহকে কম গুরুত্বপূর্ণ বলে হিসেবের মধ্যে গণ্য না করার প্রবণতা পরিত্যাগ করে এগুলো যে বাস্তবিকপক্ষে অনেক সরকারের চেয়েও শক্তিশালী বলে বিবেচনার দাবি রাখে, সে-সত্যকে স্বীকার করে নিতে হবে।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র ঐকিক কর্মক নয়। বস্তুতপক্ষে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত বিভিন্ন আমলা, দলীয় স্বার্থ ইত্যাদি দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত। তাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, কোয়ালিশন গঠন, দ্বন্দ্ব, আপোস ইত্যাদিও রাজনীতির অংশ। এটা শুধু রাষ্ট্রের অভ্যন্তরের আন্তঃক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ নয়; সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হল এর আন্তর্জাতিক মাত্রা, যা জাতীয় সীমানার বাইরেও কাজ করে। এভাবে বহুত্ববাদী ভাবমূর্তি রাষ্ট্রসমূহ ঐকিক কর্মক—এ-ধরনের সরল ভাবমূর্তির চেয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অনেক জটিল সে-সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে দেয়।

তৃতীয়ত, বহুত্ববাদীরা রাষ্ট্র যৌক্তিক কর্মক বাস্তববাদীদের এ-পূর্বানুমানের উপযোগিতাকে চ্যালেঞ্জ করেন। তাঁদের মতে, পররাষ্ট্রনীতির সিদ্ধান্ত প্রণয়ন পদ্ধতি হল এর সাথে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বার্থের সংঘাত, দর কষাকষি ও আপোসের ফল। অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন একটি বিশেষ নীতি অন্যদের তুলনায় আমলাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি অথবা কোন বিশেষ সরকারি প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ও অবস্থান বাড়ানোর জন্য প্রস্তাব করা হয়। এ-সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটি সর্বোত্তম নাও হতে পারে। এভাবে যৌক্তিক সিদ্ধান্তের পরিবর্তে অনেক সময় সকলের মতামত নিতে গিয়ে সংযত যৌক্তিক (bounded rational) সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হতে হয়। এ ছাড়াও সিদ্ধান্ত প্রণেতাগণ অসম্পূর্ণ তথ্য, পক্ষপাতিত্ব এবং অনিশ্চয়তার কারণে যে উপলব্ধির ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিতে পারেন—বহুত্ববাদী পণ্ডিতগণ এ-বিষয়ে সচেতন।

চতুর্থত, বহুত্ববাদিগণ মনে করেন যে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচ্যসূচি বিশাল। তাঁরা আন্তর্জাতিক রাজনীতি যে সামরিক-নিরাপত্তা বিষয়াবলি দ্বারা নিরঙ্কুশভাবে প্রভাবিত, বাস্তববাদীদের এ-অভিমত প্রত্যাখ্যান করেন। বরং তাঁরা যুক্তি

Go to Contents
http://thejobstudy.com

দেখান যে, গত চার দশকেরও অধিককাল যাবৎ, বিশেষত ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তরকালে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াবলিই পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক বিতর্কে প্রধান আসন দখল করে আছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি 'বিশ্ববাদ' অন্য দুটো দৃষ্টিভঙ্গি 'বাস্তববাদ' ও 'বহুত্ববাদ' থেকে মৌলিকভাবে পৃথক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকাল থেকে বাস্তববাদিগণ প্রায় একচেটিয়াবাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একক দৃষ্টিভঙ্গির দাবিদার ছিলেন। সত্তরের দশক থেকে বহুত্ববাদিগণ তাঁদের এই দাবিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে থাকেন। আর বিশ্ববাদের সূচনা অতি সাম্প্রতিক কালের। বিশ্ববাদিগণ প্রথমত পূর্বানুমান হিসেবে ধরে নেন যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষণের প্রারম্ভিক বিন্দু হল বিশ্ব পরিসর, যার মধ্যে রাষ্ট্র ও অন্যান্য স্বতন্ত্র সত্তা আন্তঃক্রিয়ারত। এভাবে তাঁরা সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক সিস্টেমের গঠনের উপর জোর দেন। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, রাষ্ট্রসমূহের বহিঃসম্পর্ক বুঝতে হলে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ উপাদানসমূহের পরীক্ষাই যথেষ্ট নয়, আন্তর্জাতিক সিস্টেমের গঠন কী রকম এবং তা কীভাবে কোন বিশেষ কর্মককে বিশেষ কোন কাজে বাধ্য করে তাও জানা জরুরি।

দ্বিতীয়ত, বিশ্ববাদীরা সত্য বলে ধরে নেন যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা শুধু উপযোগীই নয়, অনুজ্ঞাসূচকও বটে। ইতিহাস অধ্যয়ন করেই বোঝা সম্ভব যে, বর্তমানে কী পরিবেশ বিরাজ করছে যার মধ্যে বিশ্ব রাজনীতি আবর্তিত। উদাহরণস্বরূপ, মার্ক্সবাদীরা (the Marxists) মনে করেন যে, বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গঠন থেকে জানা যায় যে, কোন কোন রাষ্ট্র এ থেকে কীভাবে সুবিধা ভোগ করেছে এবং অন্যরা এ-ব্যবস্থার ফলে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তৃতীয়ত, বিশ্ববাদিগণ কর্মক হিসেবে রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ ইত্যাদির গুরুত্ব স্বীকার করে নিলেও তাঁদের বিশ্লেষণের বিশেষ কেন্দ্রবিন্দু হল কীভাবে এ-কর্মকসকল প্রভাব বিস্তারের যন্ত্র হিসেবে কাজ করে, যার মাধ্যমে কিছুসংখ্যক রাষ্ট্র, শ্রেণি অথবা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি অন্যদের বঞ্চিত করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে সুবিধা আদায় করে।

উপরের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, বাস্তববাদী অথবা বহুত্ববাদীদের চেয়েও বিশ্ববাদীরা অর্থনৈতিক উপাদানসমূহকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। বহুত্ববাদীদের রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের পরস্পরের মধ্যকার দর কষাকষি, আপোস, কোয়ালিশন গঠন ইত্যাদির চেয়ে বিশ্ববাদীদের আন্তর্জাতিক সিস্টেমের গঠনসম্পর্কিত ভাবমূর্তি বর্তমান আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বুঝতে অনেক বেশি উপযোগী। বিশ্ববাদীরা বহুত্ববাদীদের বলে দিতে পারেন যে, বর্তমানের উত্তর-দক্ষিণ আলোচনায় (North-South dialogue) যে দর কষাকষি জড়িত, সেখানে কারা জয়লাভ করবে। যেহেতু বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ধনীরা গরিবদের শোষণ করে এবং এ-শোষণকে চালু রাখতে অনুন্নত দেশসমূহকে তাদের উপর নির্ভরশীল করে রাখে, তাই এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান যে, এ-ব্যবস্থাটিকে ভেঙে না ফেলতে পারলে গরিবদের স্বার্থ অপূরণীয় রয়ে যাবে।

http://thejobstudy.com

এভাবে দেখা যায় যে, বাস্তববাদে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হল শক্তির ধারণা ও শক্তিসাম্য; বহুত্ববাদে জোর দেয়া হয় সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ও আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের উপর; এবং বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রসঙ্গে বিশ্ববাদে গুরুত্ব আরোপ করা হয় নির্ভরশীলতার ধারণার উপর, যা নিচের সারণি থেকে অতি সহজে বোঝা যায়।

সারণি ১ : আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিকল্প ভাবমূর্তিসমূহ : মূলগত পূর্বানুমানসমূহ

	বাস্তববাদ	বহুত্ববাদ	বিশ্ববাদ
বিশ্লেষণের একক (সমূহ)	রাষ্ট্র প্রধান কর্মক	রাষ্ট্র ও অ-রাষ্ট্রীয় কর্মকসমূহ গুরুত্বপূর্ণ	শ্রেণি, রাষ্ট্র ও সমাজ এবং অ-রাষ্ট্রীয় কর্মকসমূহ বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অংশ হিসেবে কাজ করে।
কর্মকদের সম্পর্কে ধারণা	রাষ্ট্র ঐকিক কর্মক	রাষ্ট্র বিভিন্ন অংশে বিভক্ত যার কতক আন্তর্জাতিক স্বার্থে কাজ করে।	আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়, বিশেষত বিশ্ব পুঁজিবাদের নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নে।
আচরণগত সক্রিয় শক্তি	রাষ্ট্র যৌক্তিক কর্মক, যে তার নিজ স্বার্থ অথবা জাতীয় পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্যাবলিকে সর্বাধিক মাত্রায় অর্জনে নিবেদিত	পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও আন্তর্জাতিক পদ্ধতিসমূহের মধ্যে জড়িত থাকে দ্বন্দ্ব, দর কষাকষি, কোয়ালিশন ও আপোস এবং সবসময় যে সর্বোত্তম ফলাফল পাওয়া যাবে তার নিশ্চয়তা নেই।	মূল আলোচ্য বিষয় হল বিভিন্ন সমাজের অভ্যন্তরে এবং এগুলোর পরস্পরের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তারের পন্থা।
বিচার্য বিষয়াবলি	জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়াবলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ	বহুমুখী আলোচ্যসূচি যেখানে সামাজিক-অর্থনৈতিক অথবা কল্যাণকর বিষয়াবলিকে জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়।	অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

Source : Paul Viotti and Mark Kauppi, *International Relations Theory* p. 11.

পাদটীকা

১. Quoted in Paul Viotti and Mark Kauppi, *International Relations Theory* (New York : Macmillan Publishing Co., 1987), p. 2.
২. Quoted in *Ibid.*
৩. *Ibid*, pp., 1-11, এখানে আমি বিনীতভাবে বলতে চাই যে, বর্তমান অধ্যায়টি বহুলাংশে এ-পৃষ্ঠাসমূহের উপর ভিত্তি করে লেখা।

Job Study
To make you prepared & confident

তৃতীয় অধ্যায়

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বিশ্লেষণের পর্যায়সংক্রান্ত সমস্যা

LEVELS OF ANALYSIS PROBLEM IN INTERNATIONAL RELATIONS

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে আমরা সাধারণত যে-সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হই, তার মধ্যে বিশ্লেষণের পর্যায় নির্ণয় সংক্রান্ত সমস্যাটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় যে-কোন পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার জন্য যেভাবে আমাদেরকে পূর্বেই ঠিক করে নিতে হয় যে, আমাদের বিবেচ্য বিষয়টিকে আমরা কোন দিক দিয়ে দেখব অর্থাৎ আমাদের আলোচনার পরিধি হবে সমগ্র জিনিসটি না এর অংশবিশেষ, অনুরূপভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নেও আমাদেরকে প্রথমেই জানতে হবে যে, আমরা আমাদের আলোচনাকে কোন্ পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখব। এখানেই বিশ্লেষণের পর্যায় সংক্রান্ত বিশেষ সমস্যার উদ্ভব হয়। কারণ যদি কোন গবেষক এক পর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহ করে এগুলোর মাধ্যমে অন্য পর্যায়ে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তবে তিনি ভুল করবেন এবং তাঁর সে-অধ্যয়নের ফলাফলকে সঠিক বলে মেনে নেয়া উচিত হবে না।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সচরাচর দুটো মৌলিক বিশ্লেষণের পর্যায় পরিদৃষ্ট হয়। এর প্রথমটি বিভিন্ন রাষ্ট্র সমবায়ে গঠিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং এখানে জোর দেয়া হয় যে এগুলোর কোনটির কার্যাবলি অন্যদেরকে কিভাবে প্রভাবিত করে। বিশ্লেষণের দ্বিতীয় পর্যায়টি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসমূহ ও অভ্যন্তরীণ উপাদানসমূহের উপর আলোকপাত করে যা সেগুলোর পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে ভূমিকা পালন করে।

সিস্টেমিক পর্যায়ে বিশ্লেষণে যেটা অনুধাবন করা দরকার তা হল আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সিস্টেমের সামগ্রিক গঠন প্রক্রিয়া কিরূপ এবং এক রাষ্ট্রের গৃহীত পদক্ষেপ অন্যদের উপর কি প্রভাব ফেলে তা বিচার করে দেখা। জাতিরাষ্ট্র পর্যায়ে বিশ্লেষণ আমাদেরকে পররাষ্ট্রনীতি বাছাইকে অধিক ফলপ্রসূ করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ

http://thejobstudy.com

অবস্থা ও প্রক্রিয়াসমূহ পুঙ্ক্ষানুপুঙ্খরূপে সযত্নে পরীক্ষা করে দেখার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।[১] এভাবে আন্তর্জাতিক সিস্টেম পর্যায়টি প্যাটার্ন ও সাধারণীকরণের ব্যাপারে অধিক পূর্ণাঙ্গ চিত্রের যোগান দেয়। অন্যদিকে জাতি-রাষ্ট্র পর্যায়টি যে চিত্র সরবরাহ করে তার গভীরতা, ব্যাপকতা ও প্রগাঢ়তা বেশি।[২]

প্রায় অর্ধশতাব্দীপূর্বে ১৯৬১ সনে জে ডেভিড সিঙ্গার (J. David Singer) তাঁর অত্যন্ত সুলিখিত একটি নিবন্ধে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের পর্যায় সংক্রান্ত ধারণাটি প্রবর্তন করেন।[৩] তিনি প্রথমে দুটো স্পষ্ট পর্যায়কে শনাক্ত করেন : আন্তর্জাতিক সিস্টেম ও জাতিরাষ্ট্র। পরবর্তীতে পণ্ডিতগণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে রাষ্ট্রীয় আচরণ সংক্রান্ত বিশ্লেষণে অনেকগুলো পর্যায়কে বিবেচনা করা সম্ভব বলে রায় দেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তিনটি পর্যায়, যথা (ক) সিস্টেমিক পর্যায় বিশ্লেষণ (Systemic level of analysis), (খ) জাতি-রাষ্ট্র পর্যায় বিশ্লেষণ (nation-state level of analysis) ও (গ) সিদ্ধান্ত-প্রণয়ন পর্যায় বিশ্লেষণ (dicision-making level of analysis)। নিম্নে এগুলো সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

সিস্টেমিক পর্যায় বিশ্লেষণ : সিস্টেমিক পর্যায় বিশ্লেষণে সমগ্র আন্তর্জাতিক সিস্টেমের (total international system) উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে এ-পর্যায়টি অতি সুপরিচিত এবং সেই সাথে খুবই ফলপ্রসূ। এর কারণ হল যে, এটি অন্যান্য পর্যায়ের তুলনায় অধিক ব্যাপক যেখানে সিস্টেম ও পরিবেশের মধ্যে সংঘটিত সমগ্র আন্তঃক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। সিস্টেমিক পর্যায় আলোচনার মাধ্যমে আমরা সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক সিস্টেমের বিভিন্ন আন্তঃক্রিয়ার নমুনা পাই এবং এর ফলে কোন একটি বিশেষ সিস্টেমের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টনের স্থিতিকাল ও পৌনঃপুনিকতা, এর স্থায়িত্ব বজায় রাখার জন্য করণীয় কাজ এবং কোন রাজনৈতিক সংগঠন পরিবর্তিত হলে এটা কীভাবে তার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবে ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি সম্পর্কে আমরা সাধারণ শ্রেণিভুক্তিকরণে (generalizations) সমর্থ হই।

জাতি-রাষ্ট্র পর্যায় বিশ্লেষণ : জাতি-রাষ্ট্রগুলো হল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মুখ্য কর্মক (actor)। তাদের সামগ্রিক কার্যাবলিই নির্ধারণ করে যে, কোন বিশেষ অবস্থায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কোন্ সিস্টেমে রূপ পরিগ্রহ করবে। এ-দিক থেকে বিচার করলে আমরা জাতি-রাষ্ট্রসমূহকে সাব-সিস্টেম (sub-system) হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। এই পর্যায় বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা জাতিসমূহের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান চালাতে পারি।

সিদ্ধান্ত-প্রণয়ন পর্যায় বিশ্লেষণ : সিদ্ধান্ত-প্রণয়ন পর্যায় বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তারকারী বিভিন্ন উপাদান ও পরস্পরবিরোধী মতাবলম্বী ব্যক্তিবর্গ কীভাবে জাতীয় নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Go to Contents
http://thejobstudy.com

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে বিশ্লেষণের পর্যায় নির্ণয় সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাদের যে-কথাটি সবসময় মনে রাখা দরকার তা হল এই যে, গবেষক ও পণ্ডিতগণ এখানে তত্ত্ব উন্নয়নের ব্যাপারে উল্লিখিত যে-কোন একটি পর্যায়কে বেছে নিতে পারেন। এই বেছে নেয়াটা নির্ভর করবে ব্যক্তিগত পছন্দ ও তত্ত্ব উন্নয়নসংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহের উপর। এখানে প্রধান সমস্যাটি এই নয় যে, কোন একটি বিশেষ পর্যায় অন্যান্য পর্যায় থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটিই সবসময় আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। বরং সমস্যাটি হল এই যে, একবার যদি ধারণাগত কাঠামো (conceptual framework) নির্মাণের সময় বিশেষ একটি পর্যায়কে বেছে নেয়া হয়, তবে সে-পর্যায়ের উপর উপাত্ত সংগ্রহ করে সেই একই পর্যায় বিশ্লেষণকে সীমাবদ্ধ রেখে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় আচরণ সম্পর্কে সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কোন বিশেষ রাষ্ট্রীয় আচরণ সম্পর্কে দুটো ভিন্ন ভিন্ন অধ্যয়ন দুটো ভিন্ন পর্যায়ে করা সম্ভব, কিন্তু একটির মাঝখানে আরেকটিকে নিয়ে আসা ভুল হবে। যদি আমাদেরকে কখনও প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত পর্যায়টিকে অন্য একটি পর্যায় দ্বারা প্রতিস্থাপিত করতে হয়, তবে এরফলে উদ্ভূত বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণমূলক ও ভবিষ্যদ্বাণী করার ব্যাপারে ভিন্নধর্মী ফলাফল প্রাপ্তি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

বিশ্লেষণের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে পার্থক্যকরণ আমাদেরকে কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কি ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেয়া সবচেয়ে লাভজনক হবে তা অনুধাবন করতে সাহায্য করে। একই সাথে এ পদ্ধতিটি আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একই রকম বিভিন্ন সমস্যা কিভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে একই সাথে জড়িত। উদাহরণস্বরূপ, সিস্টেম পর্যায়ের বিশ্লেষকগণ যুক্তি দেখান যে যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হবার পিছনে অনেকগুলো উপাদান ক্রিয়াশীল যেগুলো বিশ্বের রাজনৈতিক সিস্টেমের সাধারণ প্রকৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট। জাতিরাষ্ট্র পর্যায়ের বিশ্লেষকগণ তাঁদের পক্ষ থেকে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, যে কারণগুলো যুদ্ধের জন্য দায়ী সেগুলো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও তার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সক্রিয় শক্তিগুলোর সাথে জড়িত। অন্যদিকে সিদ্ধান্ত-প্রণয়ন পর্যায়ের বিশ্লেষকগণ দাবি করেন যে যুদ্ধের মৌলিক কারণ মানুষের প্রকৃতির মধ্যে নিহিত। এর ভিত্তি হল হয় মানুষের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যাবলি অথবা মানবজাতির সহজাত প্রকৃতি। এভাবে যুদ্ধের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে পণ্ডিতগণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে বিশ্লেষণের বিভিন্ন পর্যায়ের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন।[৪] কিন্তু তাঁদেরকে মনে রাখতে হবে যে বিশ্লেষণের কোন পর্যায়টি নির্ধারণ করা হবে তা নির্ভর করে উপাত্তের সহজপ্রাপ্যতা ও কারও নিজস্ব তত্ত্বের উপর, কিন্তু এরূপ বাছাই খামখেয়ালিপূর্ণ হতে পারে না।[৫]

অনেকদিক থেকে বিচার করে দেখা যায় যে যুদ্ধ ও শান্তির অবস্থাসমূহ এবং একই সাথে আয় ও সম্পদের বণ্টনকে নির্ধারণের ব্যাপারে রাষ্ট্রই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একক কর্মক হিসেবে বিদ্যমান। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে বলা যায় যে ইরাক কেন ১৯৯০ সনে কুয়েত আক্রমণ করেছিল তার কারণ খুঁজতে গেলে তিনটি সম্ভাব্য-পর্যায়ে ব্যাখ্যা প্রদান করা যায়। যদি সিদ্ধান্ত-প্রণয়ন পর্যায়ের উপর আলোকপাত করা হয় তবে

http://thejobstudy.com

স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত-প্রণেতাদের (সাদ্দাম হোসেন, জর্জ বুশ) ব্যক্তিত্ব, উপলব্ধি, বাছাই ও কার্যাবলি এবং স্বতন্ত্র অংশগ্রহণকারীগণ (রাষ্ট্রদূত গ্লাসপি, সাদ্দামের উপদেষ্টাগণ) ব্যাখ্যা যোগায়। যদি জাতিরাষ্ট্র অথবা অভ্যন্তরীণ উপাদানের উপর জোর দেয়া হয় তবে ব্যাখ্যা আসতে পারে রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যাবলি (গণতন্ত্র বনাম স্বৈরতান্ত্রিক সরকার), অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধরন (ধনতান্ত্রিক বনাম সমাজতান্ত্রিক), দেশের অভ্যন্তরীণ স্বার্থান্বেষী দলসমূহ, এমনকি জাতীয় স্বার্থ থেকে। আর যদি সিস্টেমিক পর্যায়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয় তবে ব্যাখ্যা হতে পারে আন্তর্জাতিক সিস্টেমের অন্তর্নিহিত অরাজক বৈশিষ্ট্যাবলি, অথবা আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংগঠনসমূহ এবং সেগুলোর প্রতিরোধশক্তি ও দুর্বলতা।[৬] আন্তর্জাতিক সম্পর্কে তাত্ত্বিকগণ যখন তত্ত্ব উন্নয়ন করেন তখন সে তত্ত্বের আসল উদ্দেশ্য হল এ ধরনের পরিস্থিতিকে বোধগম্য করতে গিয়ে উপরে উল্লেখিত তিনটি ব্যাখ্যার মধ্যে কোনটি অনুসরণ করলে আমরা বিষয়টি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারব সে ব্যাপারে অন্তর্দৃষ্টি যোগানো।[৭]

এভাবে বিশ্লেষণের পর্যায়সমূহের উপর মনোযোগ দেয়ার যুক্তিসিদ্ধ কারণ আছে। এগুলো আমাদেরকে প্রশ্নসমূহ বিন্যস্ত করার উপায় জানিয়ে এবং সঠিক ধরনের প্রামাণিক তথ্য (evidence) খুঁজে পাবার দিক নির্দেশনা দিয়ে সাহায্য করে।[৮]

বিশ্লেষণের পর্যায় আলাদা হলে গবেষণালব্ধ ফলাফলে যে-পার্থক্য দেখা দিতে পারে, তা একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে। হার্ফ ও অন্যরা (James E. Harf *et al.)* দেখিয়েছেন যে, আন্তর্জাতিক সরকারি সংগঠনের (international governmental organization, IGO) সদস্যপদকে যদি সমগ্র আন্তর্জাতিক সিস্টেম ও জাতি-রাষ্ট্রের পর্যায়ে পৃথকভাবে সমষ্টিকরণ (aggregation) করা হয়, তবে দেখা যাবে যে, আন্তর্জাতিক সরকারি সংগঠন ও যুদ্ধের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অমিল বিদ্যমান।[৯] হার্ফ বলেছেন যে, ১৯০০ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত সময়কে যদি তেরটি পাঁচ-বছরব্যাপী সময়সীমায় ভাগ করা যায়, তবে দেখা যাবে যে, যখনই আন্তর্জাতিক সরকারি সংগঠনগুলোতে গড়পড়তা জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তখনই যুদ্ধের সংখ্যা কমে গেছে। অন্যদিকে, যখন তিনি সিস্টেমিক পর্যায় থেকে জাতি-রাষ্ট্র পর্যায়ে বিশ্লেষণ করেছেন, তখন তিনি দেখতে পেয়েছেন যে, ঐ একই সময় (অর্থাৎ ১৯০০ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত) যখন একটি জাতি অন্যদের তুলনায় অনেকগুলো আন্তর্জাতিক সরকারি সংগঠনের সদস্য, তখন ঐ জাতিটি অধিকসংখ্যক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে।[১০] যদিও তাঁদের অধ্যয়নে তাঁরা বিশ্লেষণের পর্যায়কে অতিক্রম করেন নি, তবু এ-উদাহরণটির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে বিশ্লেষণের পর্যায় নির্ণয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বিশ্লেষণের পর্যায় সম্পর্কে আলোচনায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখা দরকার। সেটি হল যে "ভাল তত্ত্বের বিশ্লেষণের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে প্রাঞ্চসমূহের ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা থাকা দরকার। অধিকতর ভাল তত্ত্বের বিশ্লেষণের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে ব্যাখ্যা প্রদান করাও উচিত। সাধারণ তত্ত্ব হল সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে

এমন ব্যাপক, যার অর্থ হল যে সেগুলো বিশ্লেষণের বিভিন্ন পর্যায়ের সবগুলোকে সজ্ঞবদ্ধ করে" ("good theory ... should be able to explain phenomena at a particular level of analysis; better theory should also offer explanations across different levels of analysis. The general theories ... are all comprehensive, meaning they incorporate all the different levels of analysis.")।[১১]

পাদটীকা

১. Robert D. Cantor, *Contemparery International Politics* (St. Paul : West Publishing Co., 1986), pp. 41-43.
২. Bruce Russett and Harvey Starr, *World Politics : The Menu for Choice* (New York : W. H. Freeman & Co., 3rd ed., 1989), p. 13.
৩. J. David Singer, "The Level-of-Analysis Problem in Inernational Relations," in Klaus Knorr and Sidney Verba (Eds.) *The International System : Theoretical Essays* (Princeton, N.J. : Princeton Univesity Press, 1961), pp. 77-92.
৪. John T. Rourke and Mark A. Boyer, *International Politics on the World Stage* (Dushkin/McGraw Hill, Brief Edition, 1996), pp. 296-97.
৫. Russett and Starr, *op. cit.*, pp. 14, 20.
৬. Karen Mingst, *Essentials of International Relations* (New York : W.W. Norton & Co., 1999), pp. 63-64.
৭. *Ibid.*, p.65.
৮. *Ibid.*
৯. দেখুন, Michael P. Sullivan, *International Relations : Theories and Evidence* (New Jersey; Prentice-hall, Inc. 1976), pp. 331-332.
১০. ঐ, পৃ. ৩৩২।
১১. Mingst, *op. cit.*, p. 66.

Job Study
To make you prepared & confident

চতুর্থ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠে বিভিন্ন পদ্ধতি

DIFFERENT APROACHES TO THE STUDY OF INTERNATIONAL RELATIONS

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠে কিছুসংখ্যক তত্ত্ব ও পদ্ধতি রয়েছে। প্রাচীন পদ্ধতিগুলো রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও আইনের ঐতিহ্যগত দিকগুলোর উপর জোর দিয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমানে পণ্ডিত ও পর্যবেক্ষকগণ আচরণ বিজ্ঞানসমূহে (behavioural sciences) প্রদত্ত দৃষ্টিকোণ অনুসরণ করতে আরম্ভ করেছেন এবং সিস্টেম বিশ্লেষণের (systems analysis) মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অধিকতর ব্যাপক তত্ত্ব উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং এ-ব্যাপারে ইতঃপূর্বেই অনেকটা সফলও হয়েছেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠে এ-তত্ত্বগুলো বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠের জন্য সাধারণত যে-পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করা হয়, সেগুলোকে প্রধানত পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়, যথা (১) ঐতিহাসিক পদ্ধতি, (২) দার্শনিক পদ্ধতি, (৩) বৈজ্ঞানিক নীতি পদ্ধতি, (৪) সিস্টেমিক পদ্ধতি ও (৫) সারগ্রাহী পদ্ধতি। এ ছাড়াও প্রাচীন পদ্ধতিগুলোর অনুসারী, যাঁরা সনাতনপন্থী নামে পরিচিত এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসারী—এই দুই পক্ষ তাঁদের নিজ নিজ পদ্ধতিকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে এক বিতর্কে জড়িয়েছেন। এখন আমরা প্রথমে পাঁচটি প্রধান পদ্ধতির প্রত্যেকটি সম্পর্কে আলোচনা করব এবং শেষে সনাতন পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারীদের বিতর্ক সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য পেশ করব।

ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical approach)

ঐতিহাসিক পদ্ধতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি প্রাচীন পদ্ধতি। সমসাময়িক বৈদেশিক নীতিমালা অতীত থেকে লব্ধ দৃষ্টিকোণ ও পূর্বদৃষ্টান্ত দ্বারা দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

Go to Contents
http://thejobstudy.com

আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের উদ্দেশ্যে প্রণীত বর্তমান নীতিমালা অনেকাংশে অতীতের দ্বন্দ্ব-বিরোধ প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ-ব্যাপারে ইতিহাস কতগুলো সাধারণ সূত্রের সন্ধান দিয়ে সহায়তা করতে পারে। কূটনৈতিক ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কীভাবে রাজনীতিবিদরা অতীতে কৃতকার্য বা অকৃতকার্য হয়েছেন, তাঁরা কোন্‌টি ভালো ও প্রয়োজনীয় মনে করতেন এবং কোন্‌টি মারাত্মক ও বিভ্রান্তিকর বলে বিবেচনা করতেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ঐতিহাসিক পদ্ধতির তাৎপর্য বিশেষভাবে অনুভূত হয়, কারণ এর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ব্যাখ্যাদান সহজসাধ্য বিবেচিত হয়। যেহেতু বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে পূর্ববর্তীকালে সংঘটিত ঘটনাবলি বিশেষ সহায়তা দান করে, তাই কূটনীতিচর্চা প্রায় সব রাষ্ট্রের জন্যই একটি আবশ্যক বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়। এর ফলে আমরা দেখতে পাই যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছুসংখ্যক পেশাদার কূটনীতিবিদ যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। কয়েক দশকের মধ্যেই ইউরোপীয় রাজনীতিকে বিশ্লেষণ করার উপযোগী এই ঐতিহাসিক পদ্ধতি বিশ্বব্যাপী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্ক দ্রুত প্রসার লাভ করে। অংশগ্রহণেচ্ছু দেশসমূহের বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের আবির্ভাব এবং অর্থনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্পদ বৃদ্ধির ফলে কূটনীতিকদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিবর্তন জানতে হলে কূটনৈতিক ইতিহাস একটি প্রয়োজনীয় যন্ত্র হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যধারা, প্রোগ্রাম প্রোজেক্টের কার্যপরম্পরা বিশ্লেষণ করতে এটা একটি উপকারী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রাজনৈতিক নীতিমালার ভিত্তিতে প্রচারিত বিভিন্ন জাতির কূটনৈতিক কার্য কোন একটি আদর্শ ও গন্তব্যের দিকে কতটুকু অগ্রসর হয়েছে, তা পরীক্ষা করার জন্য কূটনৈতিক ইতিহাস একটি ফলোৎপাদক ছাঁচ জোগাতে পারে। রাষ্ট্রীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে এবং সেই সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতির বিভিন্ন inputs ও outputs কী হতে পারে, তা বোঝার ব্যাপারেও ইতিহাস আমাদের সাহায্য করে থাকে।

বিশ্বরাজনীতিতে কারণ ও ফলাফলের (cause and effect) মধ্যকার সম্পর্ক পরীক্ষার ক্ষেত্রেও ইতিহাস বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু ইতিহাস রাজনীতিবিদদের পুরোপুরিভাবে বলে দিতে পারে না যে, নতুন পরিবেশ এবং পরিবর্তনশীল বিশ্বে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপার কীভাবে কাজ করতে হবে। কোন একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারিগণ কীভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন, ইতিহাস সে-বিষয়ে তাদের যথার্থ শিক্ষা দিতে না পারলেও অতীতের ঘটনা, বৈশিষ্ট্য এবং প্রমাণিত স্বার্থের দিকে আলোকপাত করে এটা মোটামুটিভাবে সম্ভবপর কার্যধারার সন্ধান দিয়ে সহায়তা করতে পারে।

মাঝে মাঝে বলা হয়ে থাকে যে, প্রত্যেকটা জাতি তার নিজস্ব ইতিহাস লিখে থাকে। এর ভাবার্থ হল এই যে, বর্তমানের অনেক ঘটনা অতীতের ধারণার উপর ভিত্তি

http://thejobstudy.com

করে গড়ে ওঠে। ঐতিহাসিক সত্যের বিরুদ্ধে কাজ করলে অনেক সময়ই আমাদেরকে বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, জার্মানির চ্যান্সেলর বেথম্যান-হলভেগ (Bethmann-Hollweg) ব্রিটেনের ঐতিহাসিক স্বার্থকে অগ্রাহ্য করে যখন বেলজিয়াম চুক্তি (Belgium treaty)-কে একটি গুরুত্বহীন ও লঙ ঘনীয় ব্যাপার (a scrap of paper) বলে বর্ণনা করেছিলেন, তখন তিনি বুঝতে পারেন নি যে, কত বড় ভুল তিনি করতে যাচ্ছেন। হিটলারও সেরূপ ইতিহাসের শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের ফল হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছিলেন।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দুটো গুরুত্বপুর্ণ দিকের উপর ইতিহাস জোর দিয়ে থাকে। প্রথমত, সর্বদাই একটা পরিবর্তন থাকবে এবং দ্বিতীয়ত, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাওয়াতে হবে কারণ রাজনীতিতে কোন স্থায়ী বন্ধু বা শত্রু নেই। পরিশেষে বলা যায় যে, ইতিহাসচর্চা প্রয়োজনীয় হওয়া সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে এটা একটি অপর্যাপ্ত পদ্ধতি।

দার্শনিক পদ্ধতি (Philosophical approach)

সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত নীতিমালার দ্বারা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষণের ফলে আমরা কিছু নৈতিকতার সম্মুখীন হই। বিশেষজ্ঞগণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন এবং এই নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্রের পক্ষে কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয়—এটা যে-পদ্ধতির মাধ্যমে জানা যায়, তাকেই দার্শনিক পদ্ধতি অথবা আদর্শবাদী পদ্ধতি (normative approach) বলা হয়। এর দুটো দিকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে—

(ক) শক্তির রাজনীতি (power politics) ও

(খ) আন্তর্জাতিক আইন ও সংস্থা (international law and organization)

এই দুটো দিক আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, প্রতিটি রাষ্ট্রের বৈদেশিক সম্পর্ক কিছু নীতিমালার উপর নির্ভরশীল।

দার্শনিকগণ ও তাঁদের মতবাদ : ম্যাকিয়াভেলি (Niccolo Machiavelli, 1469-1527) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *The Prince*-এ একজন রাষ্ট্রপ্রধান কীভাবে তাঁর কার্য পরিচালনা করবেন তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের স্বার্থ সংরক্ষণই প্রিন্সের প্রধান উদ্দেশ্য এবং এ-জন্য তিনি যে-কোন পন্থা অবলম্বন করতে পারেন। ধর্মীয় ও নৈতিকতার নীতি অনুসরণ করে কেউ ঠিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারেন না। বরং তিনি তাঁর স্বার্থের জন্য যত কুটিল পন্থাই অবলম্বন করুন না কেন, পৃথিবী তাকে ভালো দৃষ্টিতেই দেখবে—এমনকি রাষ্ট্রে স্বার্থের জন্য অন্যের রাষ্ট্র দখল করাও অন্যায় নয়। প্রিন্সকে লক্ষ করে ম্যাকিয়াভেলি বলেছেন যে, উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয়, তবে যে-কোন উপায়েই হোক না কেন, সে-উদ্দেশ্যে বাস্তবায়ন করার

প্রচেষ্টার মধ্যে অন্যায় কিছু নেই (End justifies the means)। ম্যাকিয়াভেলির এই মতবাদ দারুণভাবে সমালোচিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ম্যাকিয়াভেলি যখন তাঁর এ-তত্ত্ব দিয়েছিলেন, তখন ইতালির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অনেকগুলো বিদেশীদের অধীনে ছিল। অনেক ক্ষেত্রেই এগুলোর শাসকবর্গ নিজস্ব মতবিরোধ ও দ্বন্দ্বের জন্য বিভক্ত হয়েছিল এবং সেখানে এক নৈরাজ্যজনক অবস্থা বিরাজ করছিল। এরূপ অবস্থায় ম্যাকিয়াভেলির মূল উদ্দেশ্য ছিল তাঁর স্বদেশভূমি ইতালির ঐ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোকে বিদেশীদের কবলমুক্ত করে একটি একক স্বাধীন সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। যেহেতু ম্যাকিয়াভেলি মনে করতেন যে, কেবল একজন প্রিন্সের পক্ষেই এই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব, সে-জন্যই তিনি তাকে এরূপ উপদেশ দিয়েছিলেন।

ভারতবর্ষের মৌর্য্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের (Chandragupta Maurya, 326-298 B.C.) প্রধানমন্ত্রী কোটিল্য (Kautilya), যিনি চানক্য (Chanakya) নামেই সমধিক পরিচিত, তাঁর প্রভুকে ক্ষমতা বৃদ্ধি, নিরাপত্তা অর্জন, অথবা সাম্রাজ্যবাদী নীতি সফলভাবে পরিচালনা করতে কি কি বিভিন্ন উপায় অনুসরণ করতে হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মন্ত্রণা ছিল যে শত্রুর প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে মৈত্রীব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল *অর্থশাস্ত্র (Arthasastra)*, যেটি ছিল মূলত 'রাজনীতি বিজ্ঞান' ('The science of politics'), যেখানে তিনি সুপারিশ করেছেন যে কোন রাজা যদি প্রতিবেশী রাজন্য কর্তৃক আক্রমণের ভীতির সম্মুখীন হন তবে তিনি তাকে (প্রতিবেশী রাজন্যকে) কোন উৎসব, বিবাহ অথবা হাতি শিকারে যোগদানের ছলে তাঁর নিজ এলাকায় আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে এসে বন্দি করবেন, এমনকি তাঁকে হত্যা করবেন। এভাবে চানক্য শত্রুর উপর প্রভাববিস্তারে সক্ষম হবার জন্য প্রতারণা ও চাতুরীর আশ্রয় নেয়ার মত অনৈতিক কার্যাবলিতে লিপ্ত হবার উপদেশ দিয়েছেন। তাই আধুনিক যুগে ম্যাকিয়াভেলি যেভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাস্তববাদী চিন্তাধারার একজন প্রবক্তা, কৌটিল্যকেও সেভাবে বাস্তববাদী ধারার অন্যতম আদি গুরু বলা চলে।

ইংল্যান্ডের ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon, 1561-1625) রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যুদ্ধ ও আগ্রাসনের নীতির পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, দৈহিক সুস্থতার জন্য যেমন শরীরচর্চার প্রয়োজন, তেমনি একটি ন্যায়সংগত যুদ্ধ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রশিক্ষণ ও পরিচর্যা হিসেবে কাজ করে। তবে বর্তমান মারণাস্ত্রের যুগে এই মতবাদ আর গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ একবার যুদ্ধ আরম্ভ হলে কোন পক্ষেরই চূড়ান্ত বিজয়লাভ সম্ভব হয় না, বরঞ্চ উভয়ই মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

দার্শনিক হবস (Thomas Hobbes, 1588-1679) তাঁর যুক্তি উপস্থাপন করতে গিয়ে অনুমিত সত্য বলে মেনে নিয়েছেন যে বসবাসরে জন্য সমাজ সৃষ্টির পূর্বে মানুষ 'প্রকৃতির রাজ্যে' ('state of nature') অবস্থান করত সেখানকার অবস্থা ছিল "প্রত্যেকের বিরুদ্ধে প্রত্যেকের লড়াই" ("war of every one against every one.")। তখন সর্বদাই সবার মনে "হিংস্র মৃত্যুর নিরবচ্ছিন্ন ভীতি ও বিপদ" ("a

http://thejobstudy.com

continual fear and danger of violent death") বিদ্যমান ছিল, এবং মানুষের জীবন ছিল "নিঃসঙ্গ, নিঃস্ব, কদর্য, বর্বর ও সংক্ষিপ্ত" ("solitary, poor, nasty, brutish, and short.")। এ থেকে তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্কে বিরোধ ও হিংস্রতা অনুমান করা অমূলক নয়। এভাবে যদিও হবসের *লেভিয়াথান (The Leviathan)* অভ্যন্তরীণ সমাজের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তবু তাঁর পর্যবেক্ষণ আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক এবং বাস্তববাদের উপর বিরাট প্রভাব রেখেছে।

ডেভিড হিউম (David Hume, 1711-1776) রাষ্ট্রসমূহকে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার নীতি পরিহার করে অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করার আহবান জানান। কারণ তিনি মনে করেন যে, এতে সকল রাষ্ট্রই সমানভাবে উপকৃত হবে। তাঁর মতবাদ দ্বারা পরবর্তীকালে অর্থনীতিবিদগণ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন এবং অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) থেকে আরম্ভ করে বর্তমান বিশ্বের অর্থনীতিবিদগণও এ-বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

রুশো (Jean Jacques Rousseau, 1712-1778) যুদ্ধ এবং অনাচারকে মানবজাতির সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত শত্রু বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে, মানব প্রকৃতিকে হবস যতটা হেয় করে দেখেছেন আসলে তা সত্যি নয়, বরং "মানুষ প্রকৃতিগতভাবে শান্তিপূর্ণ ও লাজুক" ("man is naturally peaceful and shy.")। মানব প্রকৃতি যুদ্ধের জন্য তেমনভাবে দায়ী নয়। রুশোর মতে, রাষ্ট্র সামাজিক গঠন প্রক্রিয়ায় নিজেকে যেভাবে দেখতে পায়, যেখানে তার নিজের চেয়ে উচ্চতর কোন কর্তৃত্বকারী কেউ নেই, তারই ফলাফল হল যুদ্ধ। ইউরোপীয় মৈত্রীসঙ্ঘ (European confederation) গঠিত হলো যে তা শান্তি আনয়ন করতে পারে সেরূপ অভিমতকে তিনি অস্বীকার করেন না, কিন্তু তাঁর বিবেচনায় রাজনীতির এ রকম পুনর্বিন্যাস অর্জন অসম্ভাব্য। এভাবে রুশোর চিন্তাধারা বাস্তববাদী ও নব্য-বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি বুঝার ব্যাপারে আমাদের অনেকটা সাহায্য করে।

ইমানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant, 1724-1804) তাঁর *Perpetual Peace* গ্রন্থে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য একটি বিশ্ব সরকার (world government) প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। তিনি তাঁর শান্তি পরিকল্পনা সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কিত স্বীয় বিশ্লেষণ দিয়ে। কান্টের মতে, মানুষের দুটো দিক আছে : একদিকে তারা "স্বার্থপর অহংবাদী ও অর্জনেচ্ছু" ("selfish, egoistic, and acquisitive"), অন্যদিকে তারা 'বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন' ('reasonable')। বিচারশক্তিই তাদের প্রকৃতিগত স্বার্থপর দিকটি থেকে প্রায়শ্চিত্ত করে অনুতাপের মাধ্যমে ফেরার ব্যাপারে ভারসাম্য যোগায়। আইন ও সরকারের শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করে মানুষ রাজনৈতিক অরাজকতা থেকে যে মুক্তি পেতে পারে সে ব্যাপারেও তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধকরতে যে বিষয়টি কাজ করে তা হল বিচারশক্তি। এভাবে জাতিসমূহও যখন বিচারশক্তি প্রয়োগ করে দেখতে পায় যে যুদ্ধ অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও

Go to Contents
http://thejobstudy.com

অলাভজনক তখন তারা ক্রমশ "আন্তর্জাতিক বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে সুশৃঙ্খল অবস্থায়" ("from international anarchy to order") চলে যাবে। যেহেতু স্বৈরতন্ত্রী শাসকবর্গ শান্তিকে সম্মুখপানে এগিয়ে নিবে বলে মনে হয় না, তাই কান্ট তাঁর উল্লেখিত গ্রন্থে শান্তির আদর্শ ভিত্তি হিসেবে প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহের সমবায়ে একটি বিশ্ব সমাজকে মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ করেছেন। এ ছাড়াও তাঁর পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য দিক হল জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও বিভিন্ন দেশের মধ্যে অবাধ চলাফেরার অধিকারের স্বীকৃতি।

সমসাময়িক আন্তর্জাতিক রাজনীতির উপর ইংল্যান্ডের একজন বিশিষ্ট লেখক নরমান অ্যাঞ্জেল (Norman Angell, 1874-1967) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *দি গ্রেট ইলিউশন (The Great Illusion)*-এ জোরালো মত প্রকাশ করেন যে আধুনিককালে বিজয়ী ও বিজেতা উভয়ের জন্যই যুদ্ধ অলাভজনক। অধিকন্তু, সামরিক প্রস্তুতি সামাজিকভাবে ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অপচয় ও অকার্যকর। তিনি বিশ্বাস করতেন যে কার্যকর শান্তি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে মানুষের চিন্তা-মানসকে পরিবর্তন করতে হবে।

আদর্শবাদ (Idealism) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন (Woodrow Wilson) ছিলেন এর বিশেষ প্রবক্তা। বিশ্বযুদ্ধ অন্তর্বর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। আদর্শবাদ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন ও সংস্থার উপর বিশেষ জোর দেয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ভূমিকায়ও (Preamble to the Charter of the United Nations) আমরা এর প্রভাব লক্ষ করি। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত, তার উপর আদর্শবাদ জোর দেয়, কেমন আছে তার উপর নয়। সুতরাং যদিও এ নিয়ে অনেক বইপুস্তক রচনা করা হয়েছে, তথাপি বাস্তবে এর তেমন প্রভাব নেই। কারণ রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সবাইকে নিজ নিজ স্বার্থের উপর বিশেষ দৃষ্টি রেখে চলতে হয়।

শক্তির রাজনীতি (Power politics) : আন্তর্জাতিক সম্পর্কে শক্তি (power) একটি মৌলিক ভূমিকা পালন করে এবং প্রতিটি রাষ্ট্র নিজ নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য একে কাজে লাগায়—তা যে-কোন রূপেই হোক না কেন। কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তির মতে, 'শক্তির রাজনীতি' কথাটি বাহুল্যমাত্র, কারণ রাজনীতি কথাটির মধ্যেই শক্তির ধারণাটি নিহিত আছে। যা হোক, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তির রাজনীতি বলতে আমরা বুঝি রাষ্ট্রের সে-ধরনের প্রচেষ্টাকে, যা শুধু শক্তি অর্জন, সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত।

অধ্যাপক স্পাইকম্যানের (Nicholas J. Spykman) মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সবাইকে বাস্তবতা স্বীকার করে নিতেই হবে। ১৯৪২ সালে প্রকাশিত *America's Strategy in World Politics* গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী যে-কোন রূপই ধারণ করুক না কেন, শক্তি তার মৌলিক ভূমিকা ঠিকই পালন করবে, অর্থাৎ শক্তির রাজনীতি ঠিকই বিরাজ করবে।

http://thejobstudy.com

অধ্যাপক মর্গেনথু (Hans J. Morgenthau) তাঁর *Politics Among Nations* নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বলেছেন যে, রাষ্ট্রের স্বার্থ এবং শক্তি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে শক্তির লড়াই হিসেবে অভিহিত করেছেন। কিন্তু আধুনিক কালের ভয়াবহ যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে শক্তির রাজনীতিকে একমাত্র পন্থা হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক নয়। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা সহযোগিতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এখন শান্তি আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। তথাপি এখনও যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও শক্তির রাজনীতি পুরোপুরি বিরাজমান, তা সবাইকে স্বীকার করে নিতে হবে। এতদ্‌সত্ত্বেও বর্তমান কালে আদর্শবাদ কিছু কিছু ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। ইউরোপে শান্তির মিছিল এর জ্বলন্ত উদাহরণ।

আন্তর্জাতিক আইন ও সংস্থা (International law and organization) : ওয়েস্টফেলিয়ার চুক্তির (Treaty of Westphalia, 1648) দু দশক পূর্বে গ্রোসিয়াস (Hugo Grotius) তাঁর *The Law of War and Peace* নামক গ্রন্থে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে গেছেন। আইনবিদের মতে, কেবল আইন অনুযায়ী চললেই পৃথিবীতে নিয়মশৃঙ্খলা ফিরে আসতে পারে। হ্যান্স কেলসেন (Hans Kelsen), ফিলিপ জেসুপ (Philip C. Jessup) ও অন্য যাঁরা আন্তর্জাতিক আদালতের (International Court of Justice) বিচারক ছিলেন, তাঁদের মতে, আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলার জন্য আইন অত্যাবশ্যক এবং এর মাধ্যমেই শান্তি বিরাজ করতে পারে।

বর্তমান বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ অধিকতর ক্ষেত্রে আইন মেনে চলে। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইন অধ্যয়নকে আমরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটা পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করতে পারি। আবার অনেকের মতে আইন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে সীমিত করে। এ-জন্য তাঁরা আইনপাঠকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে একটি ফলপ্রসু পদ্ধতি হিসেবে মেনে নিতে রাজি নন।

আন্তর্জাতিক সংস্থা নিয়ে আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বহু আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা জন্ম নিয়েছে যেমন, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization), বিশ্ব ব্যাংক (World Bank), আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা (Organization of African Unity) ইত্যাদি। যদিও রাষ্ট্রসমূহ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, তথাপি এ-সব সংস্থার অবদান যথেষ্ট। কারণ এই সংস্থাসমূহ রাষ্ট্রগুলোকে অন্তত এক জায়গায় বসার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়, যেখানে তারা নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করতে পারে। ছোট রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব আরও অধিক। এ-কথা সত্যি যে, যে-সব ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তিবর্গের স্বার্থ জড়িত, সেখানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এবং অন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই সুচারুরূপে কাজ করতে পারে না। তবু বিভিন্ন আলোচনায় যেমন নিরস্ত্রীকরণ, যুদ্ধবিরতি, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতা

প্রভৃতিতে এর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। এ-সব ক্ষেত্রে এই সংস্থাসমূহের গৃহীত প্রস্তাবসমূহ আন্তর্জাতিক জনমত গঠনে যথেষ্ট শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে, যা অনেক ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তিগুলো অগ্রাহ্য করতে দ্বিধাবোধ করে।

বৈজ্ঞানিক নীতি পদ্ধতি (Policy science approach)

বর্তমানে এটা সর্বজনবিদিত যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠের জন্য কোন একটি বিশেষ পাঠক্রম পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বের জোগান দিতে পারে না। সুতরাং পণ্ডিতগণের প্রচেষ্টা হল তত্ত্ব উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় থেকে অনেকগুলো কলাকৌশল আহরণ করে একীভূত করা। যে-পদ্ধতির মাধ্যমে এটা করা হয় তাকেই বৈজ্ঞানিক নীতি পদ্ধতি নামে অভিহিত করা হয়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বিশেষত সরকার, জনগণের উদ্দেশ্য ও তাদের নেতৃত্ব এবং সেই সাথে এগুলোর প্রতিক্রিয়ার ভিত্তি সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধিকে প্রসারিত করা যায়।

সিস্টেম বিশ্লেষণ (Systems analysis) : একটু পরেই আমরা শক্তি-সাম্য, দ্বি-মেরু শক্তি ও সার্বজনীনতা—এ তিনটি সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করব। সম্প্রতি বিশেষজ্ঞগণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের জন্য সাধারণ সিস্টেম তত্ত্ব (general systems theory)-কে প্রয়োগের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এ-জন্য যা করণীয়, তা হল পরনির্ভর (dependent) ও স্বাধীন (independent) চলকগুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে তাদের কার্যাবলি সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানো। এ ছাড়াও সিস্টেম তত্ত্ব আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের জন্য আরও দুটো নতুন পদ্ধতিতে অবদান রেখেছে—সেগুলো হল সংযুক্তি (linkage) ও উপযোগী আচরণ (adaptive behaviour)। সংযুক্তি পদ্ধতিতে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলির বিভিন্ন সংযুক্তি নিয়ে অধ্যয়ন করা হয়, যাতে রাষ্ট্রীয় আচরণের একটি বিশিষ্ট নমুনা পাওয়া যেতে পারে। আর উপযোগী আচরণ পদ্ধতিতে মানুষ ও অন্যান্য জীবিত পদার্থের আচরণ লক্ষ করে আমরা বুঝতে পারি যে, সমাজ ও সরকার কোন পরিবর্তনকে কীভাবে গ্রহণ করবে।

কার্যকারণবাদ ও সংহতি (Functionalism and integration) : কার্যকারণবাদের মূল নিহিত আছে অনেক পূর্ব থেকে ধীরে ধীরে কিন্তু চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ধিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের মধ্যে। এই সংগঠনগুলো বিভিন্ন রাষ্ট্রকে সাধারণ স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ করে তাদের সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পায়। সংহতির ব্যাপারেও এ-কথাটি সমভাবে প্রযোজ্য। এ-ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য সংহতি তত্ত্ব শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সিদ্ধান্ত প্রণয়ন (Decision-making) : রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সিস্টেমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের আচরণকে তাদের সিদ্ধান্ত-প্রণয়নের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। সংকটকালীন ও দৈনন্দিন সাধারণ ব্যাপারে যে-সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তা যে-চলকগুলো (variables) সিদ্ধান্ত প্রণেতাদের হিসাব-নিকাশকে প্রভাবিত করে, তার মাধ্যমে বোঝা যায়। এ-সম্পর্কে সিদ্ধান্ত-প্রণয়ন কাঠামো শীর্ষক অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

http://thejobstudy.com

দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ (Conflict analysis) : দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণের মূল বিষয়বস্তু হল কোন্ কোন্ বিশেষ রাষ্ট্রীয় আন্তঃক্রিয়া দ্বন্দ্বের রূপ পরিগ্রহ করে, সে-ব্যাপারে আলোকপাত করা। কীভাবে ও কেন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় তা জানতে পারলে ঐসব দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য কী করা দরকার, সে-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বৃদ্ধি পায়। এ-ব্যাপারে বিশেষ আকর্ষণীয় দিকটি হল এমন সব দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতি, যা আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ক্রীড়াতত্ত্বের (game theory) প্রয়োগকে ফলপ্রসু করে তোলে। ক্রীড়াতত্ত্ব শীর্ষক অধ্যায়ে এ-ধরনের কয়েকটি পরিস্থিতির উল্লেখ করা হয়েছে।

শান্তি গবেষণা (Peace research) : শান্তি গবেষণা কোন প্রতিষ্ঠান, পদ্ধতি অথবা তত্ত্বের সমষ্টি নয়। এটা আন্তঃবিষয়ক অধ্যয়নকারী (interdisciplinary) এমন লোকজনের সমবায়ে গড়ে ওঠে, যাদের সবার উদ্দেশ্য থাকে কীভাবে যুদ্ধকে এড়ানো ও শান্তির পথকে প্রশস্ত করা যায়। সাধারণভাবে শান্তি গবেষণা দ্বন্দ্ববিশ্লেষণসম্পর্কিত কতগুলো কলাকৌশল ও তত্ত্ব প্রয়োগ করে তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের পথনির্দেশ পেতে চায়। নিরস্ত্রীকরণের (disarmament) মাধ্যমে কীভাবে বিশ্বশান্তি আনা যায়, এ-ব্যাপারে গবেষণা চালিয়ে যাওয়া হল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সিস্টেমিক পদ্ধতি (Systemic approach)

আন্তর্জাতিক বিষয়ে ও কার্যে মোটামুটিভাবে সামঞ্জস্য ও নিয়মশৃঙ্খলা যে বিদ্যমান, তা অনস্বীকার্য। তবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কখন, কেন ও কোন্‌দিকে মোড় নেবে, এতদ্‌সম্পর্কিত সাধারণ শ্রেণিভুক্তিকরণ (generalizations) নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে বিতর্ক রয়েছে। যা হোক, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে কীভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করা যায় এবং তা কীভাবে কাজ করবে, সে-সম্পর্কে তিনটি ধারণা বা মডেল নিয়ে নিচে আলোচনা করা হল।

শক্তিসাম্য (Balance of power) : আধুনিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বিন্যাসকারী সিস্টেমগুলোর মধ্যে শক্তিসাম্যের ধারণাটি হল সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী। এ-পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র থেকে যেগুলোর প্রত্যেকটিই সামর্থ্য ও শক্তি অনুযায়ী রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে শক্তিসাম্য ব্যবস্থাই প্রধানত নিয়ন্ত্রণ করত। এই ব্যবস্থাটি তাদের জন্য যে-সুফল বয়ে আনে, সেগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্ব ও বৃহদাকারের যুদ্ধের অনুপস্থিতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ-সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য শক্তিসাম্য শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

দ্বি-মেরু শক্তি (Bipolarity) : যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে যে-আন্তর্জাতিক সিস্টেমের আবির্ভাব ঘটে, তাকে সাধারণভাবে দ্বি-মেরু শক্তি হিসেবে অভিহিত করা হয়। ঐ সময় ওয়াশিংটন ও মস্কো এ-দুটি বিশেষ স্থানে চূড়ান্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। ফলে ঐ দুটি শক্তিকেন্দ্রই আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রণ করা আরম্ভ করে। দ্বি-মেরু শক্তি ব্যবস্থাটি শক্তিসাম্য ব্যবস্থারই একটি বিশেষ সংস্করণ। এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

Go to Contents
http://thejobstudy.com

হল এখানে শক্তির সাম্য দুটি প্রবল পক্ষের কার্যাবলির উপর নির্ভর করে এবং অন্যান্য রাষ্ট্র যে-কোন একটির দিকে ঝুঁকে পড়ে। এরূপ অবস্থায় কোন তৃতীয় শক্তির পক্ষে সাম্যরক্ষাকারী (balancer) হিসেবে কাজ করার অবকাশ থাকে না।

বিশ্বজনীনতা (Universalism) : সিস্টেমিক পদ্ধতি অনুযায়ী যে-তৃতীয় ব্যবস্থাটির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বিন্যাস করা সম্ভব, তা হল বিশ্বজনীনতা অথবা আন্তর্জাতিক সমাজ। প্রাচীনকালে রোম যখন শক্তির উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিল, তখন তৎকালীন পরিচিত পৃথিবীকে তাদের নিজেদের আইন ও শৃঙ্খলার ব্যবস্থায় আনয়নের প্রয়াস চালিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও রাজনীতিক এই মত প্রকাশ করেছেন যে, বিশৃঙ্খল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা শুধু সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ চালিয়ে যেতে পারে না, ফলত তা মানুষের সার্বিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম নয়। তাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ম্যাডিসন (James Madison), মনরো (James Monroe) ও জেফারসন (Thomas Jefferson)-এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুক্তি দেখান যে, সমাজের রাজনৈতিক কার্যাবলিকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য যেমন জাতীয় সরকার থাকা দরকার, তেমন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এ-ধরনের সরকার পৃথিবীর জনগণের সার্বিক কল্যাণসাধনের জন্য অতীব প্রয়োজন। তবে তাঁরা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে পরিপূর্ণ আন্তর্জাতিক সরকার হিসেবে মেনে নিতে রাজি নন, কারণ এটা বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপর বাধ্যতামূলক আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে পারে না।

সিস্টেমিক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা (Limitations of the systemic approaches) : উল্লিখিত তিনটি সিস্টেম আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের জন্য উপকারী সুপারিশ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও এর কিছুটা সীমাবদ্ধতা আছে, কারণ সিস্টেমিক পদ্ধতি বিশ্বের বিভিন্ন কার্যকর শক্তিকে পুরোপুরি বিবেচনায় আনয়নের ব্যাপারে সক্ষম নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, এটা আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক ও সামাজিক শক্তির প্রভাব সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যাখ্যাদানে সমর্থ নয়। সুতরাং এই পদ্ধতি অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত প্রণয়নসহ প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে রাজনীতিকগণ কী নীতি গ্রহণ করবেন, সে-সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ সম্ভব নয়।

একটি সারগ্রাহী পদ্ধতি (An eclectic approach)

উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এটা সহজেই অনুমেয় যে, কোন একক পদ্ধতিই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের ব্যাপারে পরিপূর্ণ অবদান রাখতে পারে না। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা যে-পদ্ধতিগুলোর উল্লেখ করেছি, এদের প্রত্যেকটিই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠে কমবেশি সহায়তা করে থাকে। অধ্যাপক প্যাডেলফোর্ড, লিঙ্কন ও অলভি এ-ধরনের বিভিন্ন পদ্ধতি থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে এগুলোর সমবয়ে একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারের কথা ব্যক্ত করেছেন, যা সারগ্রাহী পদ্ধতি নামে পরিচিত।[১]

https://thejobstudy.com

এ-ব্যাপারে তাঁরা অধ্যাপক স্টানলি হফম্যানের (Stanley Hoffmann) লেখা 'International Relations, the Long Road to Theory' শীর্ষক আর্টিকেলের বক্তব্যের সাথে একমত। হফম্যান তাঁর আর্টিকেলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মৌলিক উপাদানগুলোর একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন, যা পরীক্ষা করে দেখতে তাঁরা আগ্রহী। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, এগুলোর ভিত্তিতেই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের উপযোগী একটি কাঠামো ও পরিপ্রেক্ষিত উন্নীত করা সম্ভব। তাঁদের মতে, সারগ্রাহী পদ্ধতি এ-কাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, কারণ এটি অভিজ্ঞতালব্ধ ও বিশ্লেষণমূলক। এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে আমরা বর্তমানের জটিল ও পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে আরও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারব।

বিভিন্ন পদ্ধতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষ বিশেষ দিক নিয়ে ব্যস্ত থাকে। যেমন, বাস্তববাদীদের মতে, জাতীয় উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শক্তি ও প্রভাবের উপর জোর দেয়া এবং পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়াই হল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কেন্দ্রীয় ধারণা। কিন্তু তবু আমাদের মনে রাখা দরকার যে, শক্তির অনুসন্ধানই আন্তর্জাতক সম্পর্কের সার্বিক দিককে পরিপূর্ণভাবে উন্মোচিত করে না। অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক নীতি অনুসারীদের সিদ্ধান্ত-প্রণয়নসম্পর্কিত কোন মডেলই নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে যথার্থভাবে বিবেচনা করতে সক্ষম নয়। মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গির থেকে দেখতে গেলে অর্থনৈতিক বিবেচনা যে তাৎপর্যপূর্ণ এ-ব্যাপারে সন্দেহ নেই, কিন্তু শুধু অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনাই এককভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করে না। অনুরূপভাবে আদর্শবাদী চিন্তা-ভাবনা যেমন স্বাধীনতা, শান্তি, সমৃদ্ধি, ন্যায়বিচার ইত্যাদি সমভাবে সব দেশের পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করে না।

তাই দেখা যাচ্ছে যে, কোন একক পদ্ধতিই আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে যথেষ্ট নয়। সুতরাং সারগ্রাহী পদ্ধতিটি অন্য সবগুলো পদ্ধতির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অংশটুকু গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বিশ্লেষণের ব্যাপারে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। একই সময় এটা স্বীকার করে নেয় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মূল্যবোধ ও উদ্দেশ্যাবলি ভিন্নতর, এমনকি পরস্পরবিরোধীও হতে পারে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে সনাতন ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারীদের মধ্যে বিতর্ক (Debate Between the Followers of the Traditional and Scientific Approaches to the Study of International Relations)

আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বোঝা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও তত্ত্ব উন্নয়ন করার প্রচেষ্টায় দুটি বিবদমান পদ্ধতি বিরাজমান—(১) সনাতন পদ্ধতি (classical or traditional approach) ও (২) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (scientific approach)। উভয় পদ্ধতিই নিজ নিজ ভিত্তি এবং প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারে এবং এ-হিসেবে উভয়েই একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

একটি আলাদা পাঠ্য বিষয় হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত সনাতন পদ্ধতিই একে ব্যাখ্যার একমাত্র পদ্ধতি ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে অনেক পণ্ডিত সনাতন পদ্ধতিকে চ্যালেঞ্জ করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ব্যাখ্যার কাজে নিয়োজিত হন। এবং সে-সময় থেকেই দুই পদ্ধতির অনুসারীদের মধ্যে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এখন বিতর্কের আগে সনাতন ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলতে কী বোঝায় এবং এ দুটোর মধ্যে তফাত কী তা আমাদের জানা দরকার।

সনাতন পদ্ধতি : সনাতন পদ্ধতির অন্যতম প্রবক্তা হেডলি বুল (Hedley Bull) এর একটা সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে, 'এ পদ্ধতি তত্ত্ব উন্নয়নের প্রচেষ্টায় দর্শন, ইতিহাস এবং আইন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে এবং এর বৈশিষ্ট্য হল বিচারবুদ্ধির উপর বিশদভাবে নির্ভরশীলতা। এখানে ধরে নেয়া হয় যে, যদি আমরা কড়াভাবে যথার্থতা প্রতিপাদনের প্রচেষ্টায় বা প্রমাণে নিয়োজিত হই, তাহলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তাৎপর্য অনেকটা কমে যাবে। এই বিষয়ের সাধারণ প্রতিজ্ঞাগুলোকে অবশ্যই বৈজ্ঞানিকভাবে অসম্পূর্ণ ধারণা বা স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান থেকে আহরণ করতে হবে এবং এই সাধারণ প্রতিজ্ঞাগুলোকে তাদের সন্দেহমূলক উৎপত্তির ব্যাপারে প্রযোজ্য পরীক্ষামূলক এবং অমীমাংসিত এটুকুর বেশি প্রতিষ্ঠা দেয়া যায় না' (The approach to theorizing that derives from philosophy, history and law, and that is characterized above all by explicit reliance upon the exercise of judgement and by the assumptions that if we confine ourselves to strict standards of verification and proof there is very little of significance that can be said about internationa relations, that general propositions about this subject must therefore derive from a scientifically imperfect process of perception or intuition and that these general propositions cannot be accorded anything more than the tentative and inconclusive status appropriate to their doubtful origin)[২]।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মানব আচরণের বিষয়ে সম্ভাবনাত্মক ব্যাখ্যার (probabilistic explanation) প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে রাষ্ট্রীয় আচরণের প্যাটার্ন এবং নির্দিষ্ট কোন আচরণ সঙ্ঘটিত হবার সম্ভাবনা খুঁজে বের করতে এ পদ্ধতিটি যে ব্যাপারে জোর দেয় তা হল এ অধ্যীতব্য বিষয়টির বুদ্ধিভিত্তিক জটিলতাকে বিন্যস্ত করার উপযোগী হাতিয়ার আবিষ্কার ও উন্নয়ন করা। এগুলো হল ধারণা (concept), কাঠামো (framework) ও তত্ত্ব উন্নয়ন। বিভিন্ন ধারণাকে একটি কাঠামোর মধ্যে সুবিন্যস্ত করে প্রকল্প (hypothesis) গঠন করা হয় যা পরিসংখ্যানগত পরীক্ষার মাধ্যমে সঠিক প্রমাণিত হলে তত্ত্ব হিসেবে স্বীকৃতি পায়। আসলে প্রকল্প হল সম্ভাব্য পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আহরিত তত্ত্বীয় বিবৃতি (theoretical statement)। এরূপ প্রকল্পসমূহ পরীক্ষা করে দেখা অর্থাৎ

https://thejobstudy.com

ধারণাসমূহের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে বলে বিবৃত করা হয়েছে, অন্য কথায় যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে সেগুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে (empirical world) দৃশ্যমান বস্তুর সাথে খাপ খায় কিনা তা পরীক্ষা করে চিহ্নিত করাই হল বিজ্ঞানের মূল কাজ (একাদশ অধ্যায়ে আচরণবাদী পদ্ধতি দ্রষ্টব্য)। এভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে কোন প্রকল্প বা প্রতিজ্ঞা (hypothesis or proposition) প্রমাণের পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে যৌক্তিক অথবা গাণিতিক প্রমাণ পদ্ধতির (logical or mathematical process of verification) উপর জোর দেয়া হয় এবং এর বৈশিষ্ট্য হল এটি সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে যথার্থতার সাথে ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম (capable of prediction with exactitude.) কার্ল ডয়েস (Karl W. Deutsch) বলেন যে, 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ব্যাখ্যায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হল বিশ্লেষণমূলক ও পরিমাণবাচক গবেষণার ধারণা, মডেল ও পদ্ধতি : পরিমাণবাচক উপাত্তের তুলনামূলক অধ্যয়নের দিকে অগ্রগতি এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে হিসাবনিকাশের সম্ভাবনার অধিকতর ব্যবহার' (Analytic and quantitative research concepts, models and methods : a movement towards the comparative study of quantitative data and the better use of the potentialities of electronic computation)।

এখন আমাদের এই দুই বিবদমান পদ্ধতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কোথায় তা দেখা দরকার। দেখা যায়, উভয় পদ্ধতিই আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে কোন-না-কোনভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে উভয়ের অবদান অনস্বীকার্য। অতএব লক্ষ্য উভয়ের এক হলেও বিশ্লেষণপ্রক্রিয়ায় এদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় এবং এখানেই ওদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত।

১৯৬৬ সালের এপ্রিল সংখ্যা *World Politics*-এ হেডলি বুল 'International Theory : The Case for a Classical Approach'[৩] শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি সনাতন পদ্ধতিকে সমর্থন করেন এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারীদের বিপক্ষে যুক্তি দেখান। এর পরই সনাতন ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারীদের মধ্যে বিতর্কের ঝড় তুঙ্গে ওঠে। এর পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে মরটন কাপলান (Morton Kaplan) এবং জে. ডেভিড সিঙ্গার (J. David Singer) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে সমর্থন করে প্রবন্ধ লিখে এর উত্তর দেন। নিম্নে এই দুটো পদ্ধতি অনুসারীদের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেখান হল।

সনাতনপন্থীদের মতামত : প্রথমেই সনাতনপন্থীদের দুটো মত তুলে ধরা যায় : (১) কূটনৈতিক চলককে পরিমাণাত্মক করা সম্ভব নয় (You cannot quantify diplomatic variables), ও (২) আন্তর্জাতিক রাজনীতি এত জটিল যে একে বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করা যায় না (International politics are too complicated to be treated scientifically.)।

সনাতনপন্থীদের মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ব্যাখ্যায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ভূমিকা যাই হোক না কেন এর উৎপত্তি কিন্তু সনাতন পদ্ধতি থেকে। প্রাথমিক অবস্থায়

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ব্যাখ্যায় শুধু সনাতন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে এর উপর ভিত্তি করেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গড়ে ওঠে। হেডলি বুলের মতে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এ-পর্যন্ত খুব কম অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্ব উন্নয়নে সনাতন পদ্ধতি যতটুকু অবদান রাখতে পারে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারে না।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্ব উন্নয়নে যত অধিক পরিমাণে প্রতিশ্রুতি দেয়, বাস্তব ক্ষেত্রে সেই পরিমাণ সাফল্য লাভ করতে পারে না। যেমন, কাপলানের ছটি আন্তর্জাতিক সিস্টেম (six international systems) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যত ভালো ব্যাখ্যাই হোক না কেন, বাস্তবে এটা চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। বুলের মতে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যে-'মডেল প্রতিষ্ঠা করা হয়' (Model building), সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এ-জন্য তিনি মনে করেন যে, বর্তমানে কাপলান ও অন্যরা যা করছেন তাকে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলা যৌক্তিকভাবে সঠিক নয়।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বাস্তবে যাঁরা ব্যবহার করেন বলে দাবি করেন, তাঁরা আসলে সনাতন পদ্ধতির মাধ্যমেই বিচার-বিবেচনার (judgement) উপর নির্ভর করেন, যা গাণিতিক বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাওয়া সম্ভব নয়; ফলে সনাতনপন্থীদের পথই তাঁদের আঁকড়ে ধরতে হয়।

অন্ধভক্তির ফলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে অনেক সময় বিকৃত ও দরিদ্র করা হয়েছে। যারা বৈজ্ঞানিক নির্ভুলতা এবং পরিমাণাত্মক প্রক্রিয়ায় উৎসর্গীকৃত হয়েছেন তাঁরা প্রায়শ আশানুরূপ ফল লাভের প্রচেষ্টায় মূল বিষয়বস্তুকে (substance) অবহেলা করেন। ফলে এ-ধরনের গবেষণার মাধ্যমে যা অর্জিত হয়, তা বাস্তবক্ষেত্রে কোন কাজে আসে না। কিন্তু সনাতন পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে গুণগত অনুসন্ধান (qualitative inquiry) অনেক সময় এমন অবদান রাখতে পারে, যা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক বেশি উপকারী।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বগুলোর দৃঢ়তা এবং যথার্থতা প্রতিপাদন প্রয়োজন, কিন্তু তা সনাতন পদ্ধতির মাধ্যমেও করা সম্ভব। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারীরা অনেক সময় কঠোরতাসহকারে যৌক্তিকভাবে সিদ্ধ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। একই সাথে তাঁরা ইতিহাস ও দর্শনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে 'আত্মসমালোচনা'র পথ রুদ্ধ করেছেন।

পরিশেষে হেডলি বুল উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৬৩ সালে American Political Science Association-এর পুরস্কার পেয়েছিলেন একজন সনাতনপন্থী ইনিস ক্লড (Inis L. Claude) তাঁর *Power and International Relations* নামক পুস্তকখানার জন্য। ব্রিটেনে প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে ব্যাখ্যার প্রক্রিয়া তখনও শুরু হয়নি। এ সকল যুক্তির মাধ্যমে সনাতনপন্থীদের অন্যতম প্রবক্তা হেডলি বুল আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে সনাতন পদ্ধতি অনুসরণের একান্তই পক্ষপাতী।

Go to Contents
http://thejobstudy.com
http://thejobstudy.com

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারীদের মত : আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে ব্যাখ্যার প্রক্রিয়ায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসারীরাও সনাতনপন্থীদের মত খণ্ডন করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পক্ষে বক্তব্য রাখেন।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অন্যতম প্রবক্তা মরটন কাপলান প্রথমেই সনাতনপন্থী হেডলি বুলের সমালোচনা করেন এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রকৃত সংজ্ঞা কী, তা না জানার জন্য তাঁকে দোষারোপ করেন। আসলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হল কঠোর, সুস্পষ্ট, পরিমাণগত, স্বতঃস্ফূর্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান।

কাপলান তাঁর *The New Great Debate : Traditionalism vs Science in International Relations*[৪] শীর্ষক প্রবন্ধে সনাতনপন্থীদের যুক্তি খণ্ডন করেন। তিনি বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে সনাতনপন্থীরা স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মধ্যকার সম্পর্ক উদ্ধার করতে পারেন নি। শারীরিক বিজ্ঞান এবং গণিতেও স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান থাকতে পারে। তাঁর মতে, যদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীদের বৈজ্ঞানিক বিচার বা সিদ্ধান্ত এবং স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান বলে শ্রেষ্ঠ কিছু থাকতে পারে, তাহলে সামাজিক বিজ্ঞানীদের সে-ধরনের বিচারক্ষমতা ও স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান বলে শ্রেষ্ঠ কিছু অবশ্যই আছে।

সনাতনপন্থীদের মতে, যাঁরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন তাঁরা যথার্থতা, কঠোরতা, পরিমাণাত্মককরণ ও সাধারণ তত্ত্বের উপর জোর দেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিলতার জন্য এই লক্ষ্যগুলো অর্জন করা যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান চালানো। কাপলান সনাতনপন্থীদের এই মত খণ্ডন করে তাঁর নিজের *Systems and Process in International Politics*[৫] পুস্তকের প্রসঙ্গে টেনে বলেন যে, যদি জাতিসমূহের সংখ্যা, প্রকার এবং আচরণ সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় এবং যদি সামরিক ক্ষমতা, অর্থনৈতিক সম্পদ এবং তাদের তথ্যের আদান-প্রদানেও সময়ের সাথে পরিবর্তন দেখা দেয়, তবে এই উপাদানগুলোর মধ্যকার সম্ভাব্য আন্তঃসংযোগের ভিত্তিতে ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ের জন্য কার্যকর বিভিন্ন কাঠামোগত ও আচরণগত সিস্টেম লক্ষ করা যেতে পারে। এখন অনুসন্ধান চালানোর জন্য সংশ্লিষ্ট চলকগুলো কী প্রকৃতিতে একে অপরের সাথে সংযুক্ত তার উপর প্রণালীবদ্ধ প্রকল্পের সাহায্য নিতে হবে। এ-ভিত্তিতেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসারী কাপলান দেখিয়েছেন যে, তাঁর নির্মিত শক্তিসাম্য সিস্টেমে (balance of power system) যে-নিয়মকানুনগুলো মেনে চলার কথা বলা হয়েছে, আধুনিক ইউরোপের শক্তিসাম্য সেই নিয়মগুলোর উপরই প্রতিষ্ঠিত। যদি সনাতনপন্থীরা সঠিক বলে প্রমাণিত হতে চান, তবে তাঁদের দেখাতে হবে যে, ইউরোপের শক্তিসাম্যের প্রথমদিকে আন্তর্জাতিক আইনের (international law) প্রাধান্য বেশি থাকবে, কিন্তু তা না হয়ে বাস্তবে দেখা যায় যে, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষ শক্তিসাম্যের নিয়মকানুনগুলো সম্পর্কে বেশি জানতে পারে এবং তদনুযায়ী তাঁরা তাঁদের সবার স্বার্থকে দেখে। সুতরাং সনাতনপন্থীদের যুক্তি সঠিক নয়।

সনাতনপন্থীরা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের নতুন পদ্ধতিকে দর্শনবিবর্জিত বলে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু দেখা যায় যে, systems approach অনেক ক্ষেত্রে দর্শনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই এ-ব্যাপারে সনাতনপন্থীদের মত ভ্রান্ত।

ব্রুস রাসেট (Bruce M. Russett) ও হারভে স্টার (Harvey Starr) তাঁদের *World Politics—The Menu for Choice* পুস্তকে উল্লেখ করেছেন যে, 'সনাতন পদ্ধতি যাই করুক না কেন, কিন্তু তুলনামূলকতা, সাধারণ শ্রেণিভুক্তিকরণ এবং ক্রমবর্ধিষ্ণুকরণ পদ্ধতি বর্জন করে' (Traditional techniques would all but preclude comparability, generalization and cumulativeness.)। অথচ এ-সব কৌশলের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চমৎকার বিশ্লেষণ দিচ্ছে। এই দুজন পণ্ডিত আরও বলেছেন যে, 'আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যয়নকে 'সার্বজনীন নিয়ম'সহ পদার্থবিদ্যার মতো দেখায় না, অথবা কখনও হয়তো দেখাবে না, এর অর্থ এই নয় যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিজ্ঞানসম্মত হতে পারবে না' (The study of international relations does not now or may never look like physics with its 'universal law'—it does not mean that international relations cannot be scienfific)।[৬]

সনাতনপন্থীরা যদিও বলেছেন যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এ-পর্যন্ত খুব কমই অবদান রাখতে পেরেছে এবং কম অবদান রাখতে পারে, কিন্তু আমরা বর্তমান অবস্থায় লক্ষ করি যে, গত চার দশকেরও অধিক সময় ধরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনেক দূর এগিয়ে গেছে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাখ্যায় অনেক মুল্যাবান অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছে। এ-সব যুক্তির ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারীরা সনাতনপন্থীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করেন।

উপসংহার : সনাতন ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবক্তাদের পরস্পরের উপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবি নিয়ে যত বিতর্কই হোক না কেন, কেউই এমনকি বিতর্ককারিগণও অস্বীকার করতে পারবেন না যে, উভয় পদ্ধতিই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতিতে অবদান রাখতে পারে, যেমনভাবে অতীতেও রেখেছে। র‍্যানসম (H. H. Ransom)-এর মতে, 'আচরণবাদীরা মনে করেন যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ তত্ত্ব বের করা সম্ভব। কিন্তু সনাতনপন্থীরা এ-ধরনের সার্বজনীন তত্ত্ব কল্পনা করা, গবেষণা করা অথবা অর্জন করা যায় কি না সে-ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেন' (The behavioural school sees a general theory of politics encompassing international relations at the end of the theory road. The traditional school doubts that a universal theory is conceivable, researchable or attainable.)। নর (Klaus Knorr) ও রোজনু (James N. Rosenau) এ-দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী চিন্তাধারার মধ্যে বিতর্ককে দেখেছেন 'বিশ্লেষণের রীতি' (mode of analysis)-র পার্থক্যের মাধ্যমে, এবং লিফার্ট (Arend Lijphart) তাঁদের মধ্যকার পার্থক্যকে দেখেছেন 'পদ্ধতিগত ও জ্ঞানগত মতের অমিল' (methodological and

http://thejobstudy.com

epistemological differences) হিসেবে। প্রকৃতপক্ষে সনাতনপন্থীরা যা চান, তা হল 'গতানুগতিক বিজ্ঞতা' (conventional wisdom), কিন্তু আচরণবাদীরা জোর দেন 'পদ্ধতিগত কঠোরতা' (methodological rigour)-র উপর। এতদ্‌সত্ত্বেও আমাদের অস্বীকার করার উপায় নেই যে, উভয় পদ্ধতিরই কিছু কিছু ভালো দিক আছে। এটা যথার্থই সত্যি যে, 'সনাতনপন্থীরা ও আচরণবাদীরা যদি একে অপরের দিকে হাত বাড়িয়ে এমনভাবে ধার করে, খাপ খাওয়ায় ও একীকরণ করে যে, নতুন পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা লাভ এবং সেই সাথে পুরাতনের মূল্যটুকু বজায় থাকে, তবে আমরা দৃঢ়ভাবে সংহতির দিকে এগিয়ে যাবার আশা করতে পারি' (We can be expected to move steadily in an integrative direction with the traditionalist and the behaviouralist both reaching out in the other's direction borrowing, adapting and recombining in such a way as to gain the great benefits of the newer aproach while retaining that is valuable in the older)।

পাদটীকা

১. Norman J. Padelford, George A. Lincoln and Lee D. Olvey, *The Dynamics of International Politics* (New York : Macmillan Publishing Co., Inc., third edition, 1976), pp. 48-50.
২. Hedley Bull, 'International Theory : the Case for a Classical Approach', in Klaus Knorr and James N. Rosenau (eds.), *Contending Approaches to International Politics* (Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 1969), P. 29.
৩. *Ibid.*, pp. 20-38.
৪. Morton A. Kaplan, 'The New Great Debate : Traditionalism vs. Science in International Relations,' in Knorr and Rosenau (eds.), *op.cit.*, pp. 39-61.
৫. Morton A. Kaplan, *Systems and Process in International Politics* (New York : Wiley, 1957).
৬. Bruce Russett and Havey Starr, *World Politics : The Menu for Choice* (New York : W. H. Freeman & Co., 3rd ed., 1989), p. 33.

Job Study
To make you prepared & confident
Go to Contents
http://thejobstudy.com

পঞ্চম অধ্যায়

জাতীয় শক্তি

NATIONAL POWER

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে শক্তি বলতে আমরা এমন এক ধরনের সামর্থ্য বুঝি, যার সাহায্যে কোন মানুষ অন্যের মন এবং কাজের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে (When we speak of power, we mean man's control over the minds and actions of other men)[১]। শক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সোয়ার্জেনবার্গার (Georg Schwarzenberger) তাঁর *Power Politics* নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, শক্তি হল একজনের ইচ্ছাকে অন্যের উপর জোর করে চাপিয়ে দেবার ক্ষমতা এবং যদি তারা সেটা না মানতে চায় তখন তাদের উপর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার সামর্থ্য (Power is the capacity to impose one's will on others by reliance on effective sanctions in case of non-compliance)[২]। কার্ল ডয়েসের (Karl Deutsch) মতে, "যুদ্ধে প্রভাববিস্তারে সক্ষম হওয়া ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ কাটিয়ে ওঠার সামর্থ্যই" ("the ability to prevail in conflict and overcome obstacles") হল শক্তি।

রবার্ট ডাহ্‌লের (Robert Dahl) সংজ্ঞানুযায়ী শক্তি হল "কোন কর্মকের অন্যকে দিয়ে এমন কাজ করিয়ে নেবার সামর্থ্য যা অন্যথায় দ্বিতীয় কর্মকটি করতে অনীহ থাকে" ("ability of one actor 'to get [another actor] to do something that [the latter] would not otherwise do.'")। শক্তির বহিঃপ্রকাশ প্রধানত সামরিক শক্তির মাধ্যমে ঘটে থাকলেও বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক ক্ষমতাও রাষ্ট্রের সার্বিক শক্তি বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সাহায্য করে। প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী অর্থনৈতিক বুনিয়াদ না থাকলে সামরিক শক্তি অর্জন করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়াও অন্য রাষ্ট্র কর্তৃক রাজনৈতিক সমর্থন দান এবং নিজস্ব প্রচারকার্যের (propaganda) সাফল্যের উপরও কোন রাষ্ট্রের শক্তি কিছুটা বৃদ্ধি পায়।

http://thejobstudy.com

অর্থনীতির আলোচনায় টাকাপয়সা (money) এবং পদার্থবিদ্যার আলোচনায় শক্তি (energy) যে-ভূমিকা পালন করে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি (power) অনুরূপ ভূমিকা পালন করে। এ-দিক থেকে বিচার করলে শক্তিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বলে মনে করা যেতে পারে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বর্তমানে যে-ক্ষমতার লড়াই চলছে, তার মূলে নিহিত আছে শক্তি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি জাতির অবস্থান কোথায় হবে এবং সে কী ভূমিকা পালন করবে, তা নির্ধারিত হয় ঐ জাতির শক্তির উপর। তাই অধ্যাপক পামার ও পারকিন্স (Norman D. Palmer and Howard C. Perkins) বলেন, 'রাষ্ট্রীয় জীবনের অত্যাবশ্যক ও অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য হল জাতীয় শক্তি' (National power is a vital and inseparable feature of the state system.)[৩]। শক্তি সম্পর্কে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন অধ্যাপক মুর্গেনথু (Hans J. Morgenthau)। তাঁর মতে, 'শক্তির লড়াই স্থানকালনির্বিশেষে সার্বজনীন এবং অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিষ্ঠিত অনস্বীকার্য বাস্তব ঘটনা' (The struggle for power is universal in time and space and is an undeniable fact of experience.)[৪]। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে শক্তি ছাড়া আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কথা চিন্তা করা যায় না।

এতক্ষণ শক্তি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা দেয়া হল। এখন দেখা যাক, জাতীয় শক্তি কী। অধ্যাপক লার্চ (Charles O. Lerche, Jr.)-এর মতে, 'জাতীয় শক্তি হল কোন রাষ্ট্রের ক্ষমতা, যার সাহায্যে সে অপর রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং নিজের উপর অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তারকে প্রতিহত করতে পারে' (National power is the capacity of a state to exert coercive influence upon other states and to resist such influence exerted by other states upon it.)[৫]। অধ্যাপক প্যাডেলফোর্ড ও লিঙ্কন (Norman J. Padelford and George A. Lincoln)-এর মতে, 'জাতীয় শক্তি হল জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষ সাধন ও তার উদ্দেশ্যাবলি বাস্তবায়নের জন্য একটি রাষ্ট্রের শক্তি ও সামর্থ্যের যোগফল' (National power may be defined as the sum total of the strength and capabilities of a state harnessed and applied to the advancement of its national interests and the attainment of its national objectives.)[৬]।

কোন দেশের জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য শক্তির প্রয়োজন। শক্তি ছাড়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্র তার অনুসৃত নীতিকে বাস্তবায়িত করতে পারে না। সুতরাং জাতীয় শক্তি বলতে আমরা বুঝি কোন জাতির সার্বিক বল, যা সে জাতি তার পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্যাবলিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে কাজে লাগাতে পারে (National power comprises the totality of a nation's might which that nation can utilize in its effort to realize the objectives of its foreign policy.)।

জাতীয় শক্তি অনেকগুলো উপাদানের সমষ্টি। এদের মধ্যে কতগুলো তুলনামূলকভাবে স্থায়ী আর বাকিগুলো প্রায়শ পরিবর্তনশীল। জাতীয় শক্তি গঠনে এর প্রত্যেকটিই কমবেশি গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে জাতীয় শক্তির উপাদানগুলোর উল্লেখ করা হল।

তুলনামূলকভাবে স্থায়ী উপাদান :

১. ভৌগোলিক অবস্থা (Geography)
২. প্রাকৃতিক সম্পদ (Natural resources)
   (ক) খাদ্য (Food)
   (খ) কাঁচামাল (Raw materials)
৩. শিল্পসামর্থ্য (Industrial capacity)
৪. সামরিক প্রস্তুতি (Military preparedness)
৫. জনসংখ্যা (Population)

অপেক্ষাকৃত অস্থায়ী উপাদান :

৬. জাতীয় চরিত্র ও মনোবল (National character and morale)
৭. সরকারের দক্ষতা (Quality of government)
৮. কূটনৈতিক নৈপুণ্য (Quality of diplomacy)

জনসংখ্যা, রাষ্ট্রের আয়তন ও মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product, সংক্ষেপে GNP)-এর মত আরোপিত গুণাবলি (attribute)-কে কোন রাষ্ট্রের শক্তির মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এগুলো সে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও প্রভাব সামর্থ্যের বাস্তব (tangible) অথবা পরিমাপযোগ্য উপাদান। আর বাদবাকি সকল উপাদান হল অননুভবনীয় (intangible), যদিও জাতীয় শক্তি গঠনে সেগুলোর গুরুত্বও অপরিসীম। এগুলোর মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি, ঐকমত্য, বুদ্ধি ও কূটনৈতিক দক্ষতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভৌগোলিক অবস্থা (Geography)

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে ভূগোলের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ কোন দেশের ভৌগোলিক দিকগুলো (geographical aspects) তার জাতীয় শক্তিকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অধ্যাপক মর্গেনথু যথার্থই বলেছেন যে, 'ভূগোল সবচেয়ে স্থায়ী উপাদান যার উপর কোন দেশের জাতীয় শক্তি নির্ভর করে' (The most stable factor upon which the power of a nation depends is obviously geography.)[৭]। বর্তমান পৃথিবীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফসল আধুনিক যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সমগ্র জাতিসমূহের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এক পারস্পরিক নির্ভরশীলতা (mutual interdependence)। এরূপ অবস্থায় তাদেরকে বিভিন্নভাবে একে অপরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসতে হয়। তাই নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হলে তাদের পারস্পরিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানবিক এমনকি

http://thejobstudy.com

প্রাকৃতিক ভূগোলের জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। এ-দিক থেকে বিচার করলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে আমরা 'গতিশীল ভূগোল' (geography in motion) বলতে পারি। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে ভূগোলের গুরুত্ব এত বেশি যে, নেপোলিয়ন (Napoleon Bonaparte) একবার বলেছিলেন, 'একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি ভূগোল দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে' (The foreign policy of a country is determined by its geography.)[৮]। এখন আমরা দেখব ভূগোল কীভাবে কোন দেশের জাতীয় শক্তিকে প্রভাবিত করে।

ভূগোল বিভিন্নভাবে কোন দেশের জাতীয় শক্তিকে বৃদ্ধি অথবা খর্ব করতে পারে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ভৌগোলিক অবস্থান (location)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থানকে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে, পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশ হতে চতুর্দিক থেকে কয়েক হাজার মাইল জলবেষ্টিত বলে তার শক্তি অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ অন্যান্য বৃহৎ শক্তি তাকে অতি সহজে আক্রমণ করতে পারে না। অনুরূপভাবে ইংলিশ প্রণালী (English Channel) দ্বারা মূল ইউরোপীয় ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্নতা ইংল্যান্ডের জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। ইতিহাসলব্ধ জ্ঞান থেকে আমরা জানতে পারি যে, জুলিয়াস সিজার, দ্বিতীয় ফিলিপ, নেপোলিয়ন অথবা হিটলার বারবার চেষ্টা করেও ইংলিশ প্রণালী অতিক্রম করে ইংল্যান্ডকে আক্রমণ করতে পারেন নি এবং তার কোনরূপ ক্ষতিসাধনে সক্ষম হন নি।

অন্যদিকে আল্পস পর্বত দ্বারা অবশিষ্ট ইউরোপ থেকে ইতালির বিচ্ছিন্নতা তার জাতীয় শক্তিকে বৃদ্ধি না করে বরং খর্ব করেছে। এর কারণ হল যে, আল্পস পর্বতের উপত্যকাসমূহ দক্ষিণ দিকে ঢালু থাকার ফলে মধ্য ইউরোপ থেকে ইতালিকে আক্রমণ করা যত সহজ, ইতালির পক্ষে ইউরোপের অন্যান্য দেশকে আক্রমণ করা তত কঠিন। তাই হানিবল (Hannibal)-এর সময় থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ইতালির এই স্থায়ী ভৌগোলিক দুর্বলতা তার রাজনৈতিক ও সামরিক পরিকল্পনাসমূহকে (political and military strategies) বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

কোন দেশের অবস্থান যদি এমন হয় যে, সমসাময়িক বৃহৎ শক্তিগুলোর স্বার্থ সেখানে জড়িত, তবে সে-অবস্থান তার পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষানীতিকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করবে। আফগানিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের ভৌগোলিক অবস্থানের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার হবে। গত দু শতাব্দীর অধিককাল যাবৎ আফগানিস্তান ব্রিটিশ সাম্রাজ্য (ভারত উপমহাদেশের অধিকাংশ যখন ব্রিটেনের উপনিবেশ ছিল) ও জারশাসিত রাশিয়ার মধ্যে অবস্থিত বলে তাকে এই দুটি পরস্পরবিরোধী সাম্রাজ্যের লোলুপদৃষ্টি থেকে মুক্ত থাকার জন্য সবসময়ই সতর্ক থাকতে হয়েছে, এমনকি অনেকগুলো অহেতুক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। কিন্তু নিউজিল্যান্ড এমন দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত যে, তাকে কখনও এরকম পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয় নি। আফগানিস্তানের অতি সাম্প্রতিক সমস্যাও অনেকটা তার গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য। কারণ সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি আফগানিস্তানকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ

Go to Contents
http://thejobstudy.com

করতে পারত, তবে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ায় তার প্রভাব অনেক বৃদ্ধি পেত। সাম্প্রতিক কালের ইন্দোচীনের বিভিন্ন যুদ্ধও তার ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্বের জন্যই সংঘটিত হয়েছিল।

দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যস্থানে অবস্থিত সংঘর্ষনিবারক রাষ্ট্রের (buffer state) অসুবিধার জন্য দায়ী প্রধানত তার ভৌগোলিক অবস্থান। এরূপ একটি রাষ্ট্র ইচ্ছা করলেও অনেক সময় যুদ্ধকে এড়িয়ে চলতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী সংঘর্ষনিবারক রাষ্ট্র বেলজিয়ামকে অনেক সময়ই এ-দুটি রাষ্ট্রের পারস্পরিক শত্রুতার জন্য মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে, কারণ তারা প্রায়শ বেলজিয়ামের উপর দিয়েই সৈন্য চালনা করেছে। একইভাবে পোল্যান্ডের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে আমরা দেখতে পাই যে, ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যই দেশটি বারবার তার চতুর্দিকের বৃহৎ শক্তিগুলোর লোভের শিকারে পরিণত হয়েছে।

ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যই স্থলবেষ্টিত দেশগুলো (land-locked states) অনেক অসুবিধা ভোগ করে। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তারা সস্তা ও সুবিধাজনক জলপথ ব্যবহার করতে পারে না। এ ছাড়া তাদের কোন রাষ্ট্রীয় সমুদ্র-এলাকা (territorial waters) না থাকায় তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়। এ-সব দেশকে প্রায় সবসময়ই অপর দেশের মুখাপেক্ষী হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ আফগানিস্তান, নেপাল, জাম্বিয়া, লেসোথো প্রভৃতি দেশের কথা উল্লেখ করা যায়। লেসেথোর ভৌগোলিক অবস্থান অধিক অসুবিধাজনক কারণ এটি স্থলবেষ্টিত একটিমাত্র দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত (enclave), যে-জন্য তাকে সর্বদাই শেষোক্ত দেশটির প্রাক্তন বর্ণবাদী (racist) সরকারের কর্তৃত্বকে স্বীকার করতে হত। কিন্তু অন্যদিকে উপকূলবর্তী দেশগুলো (littoral states) অনেক অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করে। ইসরাইলের ভৌগোলিক অবস্থানের কথা আলোচনা করলেই বিষয়টি ভালোভাবে বোঝা যাবে। ক্ষুদ্র দেশ ইসরাইল আরব বিশ্বে অনেক শত্রুদেশ দ্বারা বেষ্টিত। এই দেশগুলো সবাই একত্রে চতুর্দিক দিয়ে আক্রমণ করলে ইসরাইলের অস্তিত্ব অল্পক্ষণেই বিপন্ন হবার কথা। কিন্তু সমুদ্রে সহজ প্রবেশাধিকার আছে বলে ইসরাইল জলপথে দূরবর্তী বন্ধুদেশগুলোর (মুষ্টিমেয় কয়েকটি হলেও) সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তা না হলে ঘৃণ্য নীতি ও কার্যকলাপের জন্য এতদিনে আরব দেশগুলোর চাপের মুখে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবার কথা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ভৌগোলিক অবস্থান এমন যে, তাকে জারের আমল থেকেই দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করতে হয়েছে। দারদানেলস ও বসফরাস প্রণালী (The straits of Dardanelles and Bosphorus) পার হয়ে ভূমধ্যসাগর (The Mediterranean Sea) ও কৃষ্ণসাগরে (The Black Sea) আধিপত্য বিস্তারের তার এই প্রচেষ্টা warm-water outlet policy নামে পরিচিত। তার এরূপ নীতি গ্রহণের কারণ হল এই যে, তার উত্তর দিকের সমুদ্রের পানি বছরের অধিকাংশ

http://thejobstudy.com

সময়ই বরফাচ্ছন্ন থাকে, যার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও উন্নত ধরনের নৌবাহিনী গড়ে তোলা তার জন্য অসুবিধাজনক। সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে ভূগোলের গুরুত্ব সম্পর্কে একবার সে-দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভিসিনস্কি (Andre Vishinsky) বলেছিলেন, 'যদি কোন যুদ্ধজাহাজকে ভূমধ্যসাগর থেকে কৃষ্ণসাগরে যেতে হয় তবে তাকে অবশ্যই দার্দানেলস্ অতিক্রম করতে হবে, তা মস্কোর সরকার জার হোক বা কমিউনিস্ট হোক' (If a warship has to sail from the Mediterranean Sea to the Black Sea it must pass through the Dardanelles whether the government in Moscow in Czarist or Communist.)[৯]।

এ ছাড়াও ভৌগোলিক অবস্থানই নির্ধারণ করে যে, কোন দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সহায়ক প্রাকৃতিক সীমান্ত (natural frontier) আছে কি না। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিমা শক্তিবর্গের মধ্যে এরূপ প্রকৃতিপ্রদত্ত সীমান্ত ছিল না বলে তাদের মধ্যে বিরোধের একটা চিরস্থায়ী সম্ভাবনা বিরাজমান ছিল। ভারত ও পাকিস্তানের ব্যাপারেও এ-কথাটি সমভাবে প্রযোজ্য।

আরেকটি ভৌগোলিক দিক যার উপর জাতীয় শক্তি নির্ভর করে তা হল কোন দেশের আয়তন (size)। স্বভাবতই বৃহৎ আয়তনের দেশ অধিক শক্তির অধিকারী হয়ে থাকে। ঠাণ্ডা লড়াই চলাকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই বিশাল ভূভাগের মালিক। এটা তাদের জাতীয় শক্তির একটা চিরস্থায়ী সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হত, কারণ তাদের এই বৃহৎ ব্যাপ্তি বাইরে থেকে আক্রমণ করে এ-দুটি দেশকে অধিকার করার যে-কোন আকাঙ্ক্ষাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করতে সক্ষম বলে বিবেচিত হত। ইতিহাসের দিকে আরেকবার তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, নেপোলিয়ন ও হিটলার রাশিয়া দখল করতে গিয়ে সাফল্য লাভ করতে তো পারেনই নি বরং রাশিয়া অভিযান তাঁদের উভয়ের জন্যই পরাজয় ডেকে এনেছে। এর কারণস্বরূপ অধ্যাপক মর্গেনথু অতি চমৎকারভাবে বলেছেন যে, 'রাশিয়ার ভূমিকে জয় করা বিজেতার জন্য সম্পদ নয় বরং দায় হিসেবে ভূগোল বিবেচনা করতে বাধ্য করে। বিজেতা রাশিয়ার ভূমিকে গ্রাস করে এ থেকে শক্তি লাভ তো করেই না, বরং রাশিয়ার ভূমিই বিজেতাকে গ্রাস করে এবং তার শক্তিকে ধ্বংস করে' (Geography has made the conquest of Russian territory a liability for the conqueror rather than an asset. Instead of the conqueror's swallowing the territory and gaining strength from it, it is rather the territory that swallows the conqueror, sapping his strength.)[১০]। এটা সম্ভব হয় রাশিয়ার গভীরতার (depth) জন্য। গভীরতা বলতে বোঝায় যে, কোন দেশ বাইরের আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য তার ভূমি থেকে কতটুকু সহায়তা লাভ করে। যে-দেশের গভীরতা যত বেশি, অর্থাৎ যে-দেশ বহিঃশত্রুর আক্রমণের মোকাবিলায় অধিকক্ষণ টিকে থাকার ব্যাপারে তার বিস্তৃত ভূমি দ্বারা অধিক সহায়তা লাভ করে, সে-দেশ তত শক্তিশালী। আধুনিক পরিমাণবিক ও

মহাশূন্য যুগে এ-কথাটি আরও অধিক প্রযোজ্য। এটা সত্য যে, কোন পারমাণবিক ভীতি প্রদর্শনকে বিশ্বাসযোগ্য করতে হলে সে-দেশের থাকা উচিত সুবিশাল ভূমি, যার ফলে সে তার নিজ রাজধানী, জনবসতি কেন্দ্র ও শিল্প-কারখানাগুলো পৃথক পৃথক স্থানে ছড়িয়ে রাখতে পারে। ঠাণ্ডা লড়াই চলাকালীন বিশ্বের উভয় পরাশক্তি এ-দিক থেকে ভাগ্যবান ছিল বলেই তাদের জাতীয় শক্তিকে অনেকাংশে বৃদ্ধি করতে পেরেছিল।

কোন দেশের আয়তনের সাথে সাথে আমাদের চিন্তা করতে হয় তার আকৃতি (shape) সম্পর্কে। সাধারণত একই আয়তনবিশিষ্ট আঁটসাঁট আকৃতি (compact shape) ইতস্ততবিক্ষিপ্ত আকৃতির (scattered shape) চেয়ে অধিক সুবিধাজনক। কারণ প্রথম ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ক্ষেত্রের চেয়ে আন্তর্জাতিক সীমারেখা কম থাকায় জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়ে কম চিন্তাভাবনা করতে হয়। ফ্রান্সের মতো মাঝামাঝি আয়তনের দেশ যা অনেকটা গোলাকৃতিবিশিষ্ট এবং যার রাজধানী মাঝখানে অবস্থিত, তাই হল জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য আদর্শ রাষ্ট্রের উদাহরণ।

এ ছাড়াও অন্যান্য ভৌগোলিক দিক যেমন কোন দেশের জলবায়ু (climate), ভূ-প্রকৃতি (topography) ইত্যাদি তার জাতীয় শক্তিকে কিছুটা প্রভাবিত করে। কোন দেশের জলবায়ুর উপর সে-দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্য, শক্তি ও কর্মক্ষমতা নির্ভর করে। এ-জন্যই দেখা যায়, কোন কোন দেশের লোকজন অধিক কর্মক্ষম, আবার অনেক দেশের লোকজন অলস ও কর্মবিমুখ। সাধারণত নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুই জনগণের মধ্যে অধিক কর্মক্ষমতা জুগিয়ে তার জাতীয় উন্নতিতে সহায়তা করে থাকে। অপরদিকে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঘূর্ণিবাত্যা, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প ইত্যাদি অনেক দেশের জাতীয় উন্নতিকে ব্যাহত করে। ভূ-প্রকৃতির দিক থেকে দেখতে গেলে বলা যায়, বন্ধুর অর্থাৎ উঁচু-নিচু ভূ-প্রকৃতি কোন দেশের যাতায়াতব্যবস্থায় বিঘ্নের সৃষ্টি করে। কিন্তু যে-দেশ বিশাল বিস্তৃত সমভূমির অধিকারী, সে-দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ ও যাতায়াতব্যবস্থার সুবিধার জন্য অতি সহজেই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে ওঠে, যা জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রাকৃতিক সম্পদ (Natural resources)

ভৌগোলিক অবস্থানের ন্যায় প্রাকৃতিক সম্পদ হল আর একটি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী উপাদান, যা কোন দেশের জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাকৃতিক সম্পদের উপরই কোন দেশের অর্থনৈতিক তথা সার্বিক উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করে। এ-ব্যাপারে অধ্যাপক প্যাডেলফোর্ড ও লিঙ্কন যথার্থই বলেছেন যে, 'একটি দেশের অর্থনৈতিক জীবন প্রধানত তার প্রাকৃতিক সম্পদের উপর দখল অথবা অভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে' (The economic life of a state is primarily conditined by its possession or lack thereof, of natural resources.)[১১]। আলোচনার সুবিধার্থ প্রাকৃতিক সম্পদকে আমরা দু ভাগে ভাগ করব : খাদ্য ও কাঁচামাল।

http://thejobstudy.com

খাদ্য (Food) : খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা কোন দেশের জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য অতীব প্রয়োজন। সাধারণথ যে-দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, সে-দেশ খাদ্য-ঘাটতি দেশের তুলনায় অনেক সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান করে। ব্যাপারটি একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে।

কথিত আছে, একবার রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের এক বিশিষ্ট রত্ন কালিদাসকে বুদ্ধির দৌড়ে কিছুতেই পরাজিত করতে না পেরে অন্য একজন সভাসদ্ এক চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি কালিদাসের স্ত্রীকে অনুরোধ করেন যে, পরদিন রাসভায় যাবার সময় তিনি যেন কালিদাসকে বলেন যে, 'তণ্ডুল নাস্তি' অর্থাৎ ঘরে চাউল নেই। এ-চাতুরী ঐ সভাসদের অভীষ্টলাভে সহায়ক হয়, কারণ স্ত্রী ঐ কথা বলার পর সে-দিন রাজসভায় কালিদাস সর্বক্ষণ খাদ্যচিন্তায় বিভোর থাকার দরুন সেই সভাসদ্ তাঁকে বুদ্ধির মারপাঁচে অতিসহজেই পরাজিত করেন। এর মর্মার্থ হল এই যে, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হলে কোন কাজেই সাফল্য আসে না। ব্যক্তিজীবনের মতো রাষ্ট্রীয় জীবনেও এ-সত্যটি পুরোপুরি প্রযোজ্য।

তাই দেখা যায় যে, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তিকে অধিকতর বাড়াতে সমর্থ হয়েছে। গ্রেট ব্রিটেন ও জার্মানি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়ায় অনেক সময়ই তাদের দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। নেপোলিয়নের 'মহাদেশীয় নীতি' (continental system) অর্থনৈতিক অবরোধের মাধ্যমে ব্রিটেনকে অনেক দুর্বল করে দেয়। দুটি বিশ্বযুদ্ধেই খাদ্যাভাবের দরুন জার্মানি যুদ্ধের প্রাথমিক সাফল্যকে কাজে লাগাতে পারে নি, কারণ দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া তার জন্য কষ্টকর ছিল।

বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই খাদ্যে স্বনির্ভর না হওয়ার দরুন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের অনেক দুর্বলতা থেকে যায়। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশকে খাদ্যের জন্য বহির্বিশ্বের উপর নির্ভর করতে হয় বলে তাকে অনেক সময় বাধ্য হয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন নীতি গ্রহণ করতে হয়, যা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে সে কখনও গ্রহণ করত না। এভাবে অনেক খাদ্য-ঘাটতির দেশই নিজের ইচ্ছামতো বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়। খাদ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে ড. মিলার (Dr. Raymond Miller)-এর বক্তব্য এ-ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য : 'বর্তমান বিশ্বে ক্ষুধাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বিংশ শতাব্দীর যথার্থ চ্যালেঞ্জ হল মানুষ ও উপবাসের মধ্যকার প্রতিযোগিতা' (Hunger is the most important factor in the world today. The real challenge of the twentieth century is the race beween men and starvation.)[১২]।

কাঁচামাল (Raw materials) : কোন দেশের জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিতে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি প্রয়োজনীয় ঐ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামাল, যা শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনে, বিশেষত যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরিতে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। এ-ব্যাপারে অধ্যাপক মর্গেনথু বলেছেন যে, 'কোন দেশের জাতীয় শক্তি

Go to Contents
http://thejobstudy.com

বৃদ্ধিতে কাঁচামালরূপী প্রাকৃতিক সম্পদ কী ধরনের চূড়ান্ত ও আপেক্ষিক গুরুত্ব বহন করবে, তা অনিবার্যরূপে নির্ভর করে ইতিহাসের বিশেষ কোন সময়ের যুদ্ধের প্রযুক্তিবিদ্যা কতটুকু উন্নত তার উপর' (The absolute and relative importance natural resources in the form of raw materials have for the power of a nation depends necessarily upon the technology of the warfare practiced in a particular period of history.)[১৩]।

বর্তমান পৃথিবীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা এত বেশি উন্নতি লাভ করেছে যে, শান্তি ও যুদ্ধ উভয় সময়ের জন্যই শিল্পকারখানার উৎপাদনের উপর কোন দেশের শক্তি অনেকাংশে নির্ভর করে। বাস্তবিকপক্ষে শিল্পবিপ্লবের (Industrial Revolution) পর থেকেই বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের আপেক্ষিক ও চূড়ান্ত গুরুত্বের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কয়লা ও লৌহের ব্যবহারের উপরই কোন দেশের শান্তিকালীন সমৃদ্ধি ও যুদ্ধকালীন ক্ষমতা নির্ভর করত। এ-জন্য আমরা দেখতে পাই যে, এ-কালের সব বৃহৎ শক্তিগুলোই উক্ত দুটি সম্পদে ধনী ছিল। আবার যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে শক্তির উৎস হিসেবে খনিজ তেলের (oil) গুরুত্ব বেড়ে যায়, তখন আমরা দেখি যে, তেলসমৃদ্ধ দেশগুলো আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করতে আরম্ভ করে। এ-ব্যাপারে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ফরাসি প্রধানমন্ত্রী জর্জ ক্লেমেন্সু (Georges Clemenceau) চমৎকারভাবে বলেছিলেন যে, 'এক ফোঁটা তেলের মূল্য আমাদের সৈনিকদের এক ফোঁটা রক্তের সমান' (One drop of oil is worth one drop of blood of our soldiers.)[১৪]। বর্তমাব বিশ্বে আমরা দেখতে পাই যে, মাত্র দু দশকের মধ্যেই তেলসম্পদে সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলো আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে অনেকাংশে প্রভাবিত করছে।

আধুনিক পারমাণবিক ও মহাশূন্য যুগে (nuclear and space age) গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধাস্ত্র (strategic armaments) তৈরির কাজে ইউরেনিয়াম ব্যবহৃত হয় বলে ঐ ধাতুর অর্থনৈতিক ও সামরিক মূল্য বেড়ে গেছে এবং সেই সাথে শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে সেই দেশগুলোর, যেখানে ঐ ধাতুটি পাওয়া যায়। এ-জন্যই উক্ত ধাতুর অধিকারী দেশ রোডেশিয়ায় (বর্তমানে জিম্বাবো) দীর্ঘকাল ধরে শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘু সরকার ক্ষমতায় থাকার পরও কোন বৃহৎ শক্তিই তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয় নি। যদিও আন্তর্জাতিকভাবে এ বর্ণবাদী সরকার ধিক্কৃত হয়েছে। এর কারণ শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো তাদের যুদ্ধাস্ত্র তৈরির কাজে রোডেশিয়ার ইউরেনিয়ামের উপর অনেকটা নির্ভরশীল ছিল। একই কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকার নামিবিয়াকে দীর্ঘকাল যাবৎ জবরদখল করে রেখেছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রধানত বৃহৎ শক্তিগুলোর সমর্থনের উপরই দক্ষিণ আফ্রিকার এই দখলদারি টিকে ছিল।

উক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে, সমৃদ্ধ জীবনযাপনের জন্য যেমন খাদ্য ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের দরকার, তেমনি যুদ্ধের সময়ে শত্রুর বিরুদ্ধে সাফল্য লাভের জন্যও এগুলোর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

http://thejobstudy.com

শিল্পসামর্থ্য (Industrial Capacity)

যদি কোন দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে জাতীয় উন্নতির জন্য পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে না পারে, তবে সেই দেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট শক্তি হিসেবে পরিগণিত হবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আফ্রিকার জায়ার প্রজাতন্ত্র (পূর্বের কঙ্গো) ইউরেনিয়ামের মতো মূল্যবান খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এটা থেকে শক্তি উৎপাদনের কারিগরি জ্ঞানের অভাবে দেশটি অন্যান্য বৃহৎ শক্তি যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, গ্রেট ব্রিটেন, এমনকি কানাডা, চেকোশ্লোভাকিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি দেশ থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। অনুরূপভাবে, ভারতবর্ষ প্রচুর কয়লা, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাকে একটি বৃহৎ শক্তি হিসেবে গণ্য করা যায় না। এর কারণ হল এই যে, উক্ত দুটি দেশ শিল্পে অনগ্রসরতার কারণে তাদের কাঁচামালকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম নয়। কঙ্গো যেমন শিল্প কারখানার অভাবে তার নিজস্ব ইউরেনিয়ামকে শিল্পোৎপাদন ও সামরিক কাজে ব্যবহার করতে সমর্থ নয়, তেমনি ভারতবর্ষেও এখনও পর্যন্ত তার কাঁচামালের সমানুপাতিক শিল্প সংস্থাপন নেই, যার ফলে তার জাতীয় শক্তির সম্ভাবনা ও বাস্তবক্ষেত্রে প্রাপ্ত জাতীয় শক্তির মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়াও আধুনিক বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব যে, মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ আরব দেশগুলো মাথাপিছু জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে পৃথিবীতে প্রথম দিকের স্থানগুলো দখল করলেও শিল্পসামর্থ্যের অভাবে জাতীয় শক্তির দিক থেকে তাদের অবস্থান অনেক নিচে।

জাতীয় শক্তিতে অবদান রাখার ব্যাপারে শিল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে অধ্যাপক মর্গেনথু যথার্থই বলেছেন যে, 'আধুনিক যুদ্ধ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রযুক্তিবিদ্যা ভারি শিল্পের পরিপূর্ণ উন্নতিকে জাতীয় শক্তির একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে' (The technology of modern warfare and communications has made the over-all development of heavy inustries an indispensable element of national power.)[১৫]। এ-কথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমান বিশ্বে যুদ্ধের উপযোগী অধিকাংশ সরঞ্জামই কলকারখানায় উৎপন্ন হয়। সুতরাং কোন দেশ যদি শক্তির উচ্চ সিঁড়িতে আরোহণ করতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই শিল্প ও কারিগরি বিদ্যায় উন্নতি সাধন করতে হবে। ইতিহাসও এ-সাক্ষ্য দেয় যে, যতদিন পর্যন্ত গ্রেট ব্রিটেন একটি শিল্পোন্নত জাতি হিসেবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, ততদিন পর্যন্ত সে ছিল সমগ্র বিশ্বে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করলেও দেখা যায় যে, ১৮৭০ সালের পর জার্মানি যখন শিল্পক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি লাভ করতে থাকে তখন থেকেই সে ফ্রান্সের তুলনায় অধিক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সামরিক প্রস্তুতি (Military Preparedness)

একটি জাতির ভৌগোলিক অবস্থা, প্রাকৃতিক সম্পদ, শিল্পসামর্থ্য প্রভৃতি উপাদান বাস্তবক্ষেত্রে যার মাধ্যমে তার জাতীয় শক্তিকে বৃদ্ধি করতে পারে, তা হল তার উপযুক্ত

সামরিক প্রস্তুতি। বস্তুত জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিকল্পে সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীলতার ব্যাপারটি এত সুস্পষ্ট যে, এর বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। অধ্যাপক লার্চ তাই সত্যসত্যই বলেছেন যে, 'জাতীয় শক্তির অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও আশুলভ্য অভিব্যক্তিই হল সামরিক শক্তি' (The most obvious and immediately available manifestation of national power is military power.)[১৬] অধ্যাপক মর্গেনথুর মতে, 'সামরিক প্রস্তুতির জন্য দরকার এমন একটি সামরিক সংগঠন, যা পররাষ্ট্র নীতিকে সহায়তা করতে সক্ষম' (Military preparedness requires a military establishment capable of supporting the foreign policies pursued.)[১৭]। কোন দেশের সামরিক প্রস্তুতি যে-বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে, তা হল প্রযুক্তিবিদ্যা, নেতৃত্ব ও সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ও দক্ষতা। নিচে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

প্রযুক্তিবিদ্যা (Technology) : একটি জাতির ভাগ্য প্রযুক্তিবিদ্যার উপর অনেকটা নির্ভরশীল এবং এ-ক্ষেত্রে দুর্বলতা অন্য কিছু দ্বারা পূরণ করা সম্ভব নয়। আলেক্স হ্যালির বিখ্যাত উপন্যাস *রুটস্ (The Roots)*-এর চলচ্চিত্ররূপে আমরা দেখতে পাই যে, শারীরিকভাবে শক্তিশালী হলেও আফ্রিকার জনগণ কীভাবে ইউরোপীয়দের বারুদের (gun powder) ব্যবহারের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এটা সহজেই অনুমেয় যে, পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন ইউরোপীয় শক্তি পশ্চিম গোলার্ধ, আফ্রিকা, নিকট এবং দূরপ্রাচ্য জয় ও এ-সব জায়গায় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল শুধু তার উন্নততর প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যবহার করে। আমাদের উপমহাদেশীয় ইতিহাসেও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাব লক্ষণীয়। ১৫২৬ সালের পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর মাত্র ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে ইব্রাহিম লোদির প্রায় লাখ খানেক সৈন্যের বিরুদ্ধে যে-বিরাট সাফল্য লাভ করেন, এর পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল তাঁর 'কামান' (cannon) ব্যবহার। তিনি চীনদেশে কামান ব্যবহার শিখে সর্বপ্রথম এ-দেশে তা চালু করেন এবং এভাবে তিনি সুবিখ্যাত মুঘল রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। পরবর্তীকালে এই উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তার উন্নত সামরিক প্রযুক্তিবিদ্যা, বিশেষত দক্ষ ব্রিটিশ নৌশক্তি (sea power), বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কয়েক দশক পূর্বেও আমরা দেখেছি যে, আর্জেন্টিনার তুলনায় ব্রিটিশ নৌবাহিনী উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার অধিকারী হওয়ার ফলে তারা তাদের স্বদেশ থেকে নয় হাজার মাইল দূরে অবস্থিত ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ (Falkland islands) দীর্ঘ আড়াই মাস যুদ্ধের পরে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

বিংশ শতাব্দীতে যুদ্ধবিদ্যায় প্রযুক্তিবিদ্যার চারটি বড় রকরেম উদ্ভাবন আমরা লক্ষ করি, যা এদের ব্যবহারকারীদের সাফল্যলাভে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। প্রথমত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের জাহাজসমূহের বিরুদ্ধে জার্মানি সাবমেরিন ব্যবহার করে প্রাথমিকভাবে সাফল্য লাভ করে। দ্বিতীয়ত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে জার্মানির বিরুদ্ধে তুলনামূলকভাবে অধিক ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে যুক্তরাজ্য তাদের যুদ্ধজয়ের পথ সুগম করে। তৃতীয়ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে জার্মানি ও জাপান তাদের

http://thejobstudy.com

বিমানবাহিনী দ্বারা স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর মধ্যে কৌশলগত সমন্বয় সাধন করে বিরাট সাফল্য লাভ করে। চল্লিশের দশকের শুরুতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইংরেজ ও ওলন্দাজরা যে-শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়, তা তাদের প্রযুক্তিবিদ্যার পশ্চাৎপদতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। চতুর্থত, যে-দেশ পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী, তা তাদেরকে প্রতিপক্ষ দেশের তুলনায় এক বিরাট প্রযুক্তিগত সুবিধা এনে দেয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে আমরা প্রযুক্তিবিদ্যার চরম ব্যবহার দেখি আণবিক বোমার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে, যা জাপানের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজয়কে ত্বরান্বিত করে।

সামরিক প্রযুক্তিবিদ্যা উন্নয়নের জন্য বর্তমানে বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। এর মধ্যে যুদ্ধোত্তরকালের দুই পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এর কারণ হল তাদের সশস্ত্র বাহিনীকে সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত রাখা, যাতে তারা যে-কোন মুহূর্তে যুদ্ধ আরম্ভ হলে শত্রুর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় লাভ করতে পারে। এ ছাড়াও উন্নতমানের আধুনিক সমরাস্ত্র যুদ্ধ ব্যতিরেকেই শুধু ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম। তাই রাসেল ওয়ারেন হো (Russell Warren Howe) তাঁর *Weapons* নামক গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন যে, 'আমাদের যুগে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র পদ্ধতি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রাজনীতি, অর্থনীতি ও কূটনীতিতে অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে' (In our era, the major weapons systems have become a feature more of politics, economics and diplomacy than of the battlefield.)[১৮]।

নেতৃত্ব (Leadership) : সামরিক নেতৃত্বের মান যে-কোন জাতির শক্তি নির্ধারণে অন্যতম বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। সামরিক প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিগণ যুদ্ধ পরিকল্পনায় ও কলাকৌশলের ক্ষেত্রে নতুন নতুন ভাবধারা প্রয়োগ করে বিরোধীপক্ষকে বিপর্যস্ত করে দিতে পারে। এভাবে সামরিক নেতৃত্ব জাতীয় শক্তিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

ইসলামের স্বর্ণযুগে আমরা দেখি যে, কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিশেষত হযরত ওমর (রাঃ), খালিদ বিন ওয়ালিদ প্রমুখের উন্নত ও বিজ্ঞ নেতৃত্বের জোরে অতি অল্প সময়ের মধ্যে মুসলমানগণ প্রায় অর্ধ পৃথিবী জুড়ে তাঁদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। এর চরম বিকাশ দেখি আমরা মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের মাধ্যমে, যেখানে সেনাপতি মুসার বিজ্ঞ সামরিক নেতৃত্বের কথা কে না জানেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহান ফ্রেডারিক (Frederick the Great)-এর সামরিক নেতৃত্বে প্রুশিয়া বিশ্বের একটি অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়। নেপোলিয়ন তাঁর সুশৃঙ্খল নেতৃত্বের দ্বারা অনেকগুলো যুদ্ধ জয় করেন। আবার ১৮৭০ সালের ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ার যুদ্ধে (Franco-Prussian War, 1870) প্রুশিয়ার জয়ের পেছনে তাঁর সেনাপতিদ্বয় রুন (von Roon) ও মল্টকের (Moltke) সামরিক নেতৃত্ব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

এই উপমহাদেশেও আমরা বিভিন্ন যুদ্ধে জয়লাভের ব্যাপারে নেতৃত্বের প্রভাব লক্ষ করি। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর শুধু কামান ব্যবহার করে নয়, চতুর্দিক থেকে

Go to Contents
http://thejobstudy.com

আক্রমণ করায় পারদর্শী *তুলুঘমা* নামক এক ঝটিকা বাহিনী দ্বারা সুচতুর যুদ্ধকৌশল ব্যবহার করে জয় ছিনিয়ে আনেন। মহান সম্রাট আকবরও (Akbar the Great) তাঁর চাতুর্যপূর্ণ নেতৃত্বের দ্বারা আসমুদ্রহিমাচল বিশাল ভারত ভূখণ্ডে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে হিটলার তাঁর সুবিখ্যাত ঝটিকা অভিযান (Blitzkrieg) দ্বারা অনেকগুলো দেশকে নাস্তনাবুদ করতে সক্ষম হন। ১৯৬৭ সালের মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে আরব রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে ইসরাইলের অভূতপূর্ব বিজয়ের পেছনেও দেখতে পাই যে, জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য সুষ্ঠু সামরিক নেতৃত্বের বিশেষ প্রয়োজন।

সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ও দক্ষতা (Quantity and quality of armed forces) : প্রাচীনকালে একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল যাতে বলা হয়েছে যে "ঈশ্বর সর্ববৃহৎ সেনাবাহিনীর পক্ষে থাকেন" ("God is on the side of the biggest battation")। এটি যুদ্ধে বিজয়লাভের জন্য সৈন্যসংখ্যা তুলনামূলকভাবে অধিক থাকার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করে। বস্তুত, সামরিক দিক থেকে দেখতে গেলে একটি জাতির শক্তি অনেকখানি নির্ভর করে সৈন্য ও অস্ত্রের পরিমাণ এবং তাদের বিভিন্ন শাখায় সুষ্ঠু বণ্টনের উপর। কোন দেশের সামরিক শক্তির জন্য সশস্ত্র বাহিনীর মোট সংখ্যা ও তাদের দক্ষতা উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ। *নিউজউইক* সাময়িকীর *(The Newsweek)* এক হিসেবে দেখা যায় যে, সত্তরের দশকের শেষ দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যসংখ্যা ছিল ২.১ মিলিয়ন (অতিরিক্ত আটলক্ষ সত্তর হাজার সৈন্য), সোভিয়েত ইউনিয়নের ৪.৪ মিলিয়ন (অতিরিক্ত ৬.৮ মিলিয়ন এবং সাড়ে চার লক্ষ প্যারা মিলিটারি), চীনের ৪.৩ মিলিয়ন (সশস্ত্র মিলিশিয়া ৭ মিলিয়ন)[১৯]। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, দেশের ভৌগোলিক অবস্থা ও অন্যান্য সামরিক সুযোগসুবিধা বুঝে সামরিক বাহিনীকে বিভিন্ন শাখায় এমনভাবে সংগঠিত করা উচিত, যা জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক হয়।

সামরিক বাহিনীর দক্ষতা সাধারণত নির্ভর করে যুদ্ধসরঞ্জামের পর্যাপ্ত সরবরাহ, নেতৃত্বের দক্ষতা, সেনাবাহিনীর মনোবল ও নৈতিক চরিত্র, প্রশিক্ষণ, তাদের প্রতি দেশের বেসামরিক লোকজন এবং সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদির উপর। সামরিক বাহিনীর দক্ষতা অতি সহজেই সামরিক বাহিনীর পরিমাণকে গৌণ করে দিতে পারে। বিগত শতাব্দীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চরম বিস্তৃতির মূলে ছিল তার দক্ষ সামরিক বাহিনী। আশির দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সেনাবাহিনী এতই দক্ষ ছিল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করতেন যে, তারা চার থেকে আট দিনের মধ্যে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হতে পারার ক্ষমতা রাখে, পূর্বে যেখানে তিরিশ দিনের মতো সময় লাগত বলে ন্যাটো (NATO) মনে করত।[২০]

জনসংখ্যা (Population)

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, যে-দেশ জনবহুল সে-দেশই শক্তিশালী। এটা আংশিকভাবে সত্য হলেও আমরা ভুল করব তখনই, যখন আমরা ধরে নেব যে,

http://thejobstudy.com

জনসংখ্যার সাথে শক্তির সম্বন্ধ সবসময়ই স্থির। যে-কোন দেশের জন্য কাম্য জনসংখ্যাই (optimum population) শ্রেয়। কাম্য জনসংখ্যার অর্থ হল যতক্ষণ পর্যন্ত কোন দেশের জন্য জনসংখ্যা বোঝা না হয়ে দাঁড়ায়। যখন কোন দেশে কাম্য জনসংখ্যা থাকবে, তখন প্রতিটি সক্ষম ব্যক্তি দেশের শ্রমশক্তিতে রূপান্তরিত হবে এবং জাতীয় শক্তির বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে সহায়ক হবে। কোন দেশের জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যার অধিক হলে সে-দেশের শক্তি বৃদ্ধি না পেয়ে এটা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে। আধুনিক বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায় একমাত্র উন্নত দেশগুলোর জন্য বিপুল জনসংখ্যা শক্তির উৎস, কিন্তু অনুন্নত দেশগুলোর জন্য বিপুল জনসংখ্যা শক্তিবৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ। বৃহৎ জনসংখ্যা নিয়ে ভাঙনের পূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল বিশ্বের সর্ববৃহৎ শক্তি। কিন্তু এর চেয়েও অনেক বেশি জনসংখ্যা নিয়ে তথাকথিত উন্নয়নশীল দেশ ভারত হিমশিম খাচ্ছে। এ-কারণে প্রত্যেক দেশের জন্য নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণ জনসংখ্যা থাকাই শ্রেয়।

জনবহুলতাই যদি শক্তির নির্ধারক হত তবে প্রায় ৮০০ মিলিয়ন জনসংখ্যা নিয়ে চীনই হত বিশ্বের সবচেয়ে বড় শক্তি এবং তারপরেই হত ভারতের স্থান। প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান হত যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ। দেখা গেছে যে, অনেক কম জনসংখ্যা নিয়ে ইংল্যান্ড এক সময় পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তিতে পরিণত হয়। এবং বর্তমান বিশ্বে ইসরাইল অপেক্ষাকৃত কম জনসংখ্যা নিয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। তবে জনসংখ্যার বাহুল্য অথবা স্বল্পতার মাপকাঠিতে শক্তির উপাদান হিসেবে এর গুরুত্ব বিচার করলে চলবে না।

জাতীয় শক্তির ক্ষেত্রে জনসংখ্যাকে বিচার করতে হলে এর গুণগত মান (qualitative aspect) ও পরিমাণগত দিক (quantitative aspect) উভয়ই বিচার করতে হবে। পরিমাণগত দিক থেকে দেখা যায়, বিপুল জনসংখ্যা সামরিক সুবিধার জন্য বিশেষ প্রয়োজন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় জাপান দখলকারী আমেরিকান বাহিনীর প্রধান জেনারেল ম্যাকআর্থার (General Douglas McArthur) তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসন (Lyndon B. Johnson)-কে উপদেশ দেন যে, গণচীন (People's Republic of China)-এর বিপুল জনসংখ্যার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লড়াই করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তিনি কোরিয়ার যুদ্ধের সময়কার বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে এই উপদেশ দেন, যা পরবর্তীকালে সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছিল। কারণ গণচীনের লোকসংখ্যা এত বেশি ছিল যে, যুদ্ধে চীনের যত সৈন্য মরতে থাকে ততই আবার আসতে থাকে। ক্রমাগত মৃত্যুর পরও চীনের সৈন্যসংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যায় নি। সুতরাং বিপুল জনসংখ্যাই তাদের পক্ষে যুদ্ধ জয়ে সহায়ক হয়। প্রয়োজনীয় জনসংখ্যা ব্যতীত যুদ্ধাস্ত্র তৈরির প্রকল্পসমূহ স্থাপন ও পরিচালনা সম্ভব নয়। এ ছাড়া জলে, স্থলে ও আকাশপথে যুদ্ধ পরিচালনা, রসদ সরবরাহ ইত্যাদি কাজে বিপুল জনসংখ্যা অবশ্যই কাম্য। এই কারণেই সাম্রাজ্যবাদী নাৎসি জার্মানি ও স্বৈরাচারী ইতালি সরকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিয়েছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার জনসংখ্যার তুলনামূলক আলোচনা করলে শক্তির সাথে জনসংখ্যার সম্পর্ক স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। প্রায় তিন মিলিয়ন বর্গমাইল এলাকা নিয়ে গঠিত অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যা প্রায় ১২ মিলিয়ন এবং তিন মিলিয়নের কিছু বেশি এলাকা নিয়ে গঠিত কানাডার জনসংখ্যা ২১ মিলিয়নের মতো। এ-দুয়ের মাঝামাঝি এলাকা নিয়ে গঠিত যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা ২০৫ মিলিয়নের অধিক। তাই এটা নিশ্চিত যে, উক্ত দুটি দেশের মতো জনসংখ্যা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র কখনও বিশ্বের বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হতে পারত না। অন্যদিকে প্রয়োজনের তুলনায় কম জনসংখ্যা থাকার দরুন অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা অন্যান্য সম্পদে ধনী হওয়া সত্ত্বেও বৃহৎ শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশে সক্ষম হয় নি।

একটি দেশের মোট জনসংখ্যার পরিমাণ যেমন শক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি এর গুণগত মানও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। জাতীয় ঐক্য, জন্মহার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা, রীতিনীতি ও বিশ্বাস, নৈতিক উৎকর্ষ ও ধর্মীয় অনুশাসন, জীবন ধারণের মান, সাহস ইত্যাদিই গুণগত মান। এছাড়া জাতীয় ঐক্য, শ্রেণিগত বৈষম্য ইত্যাদির দিকেও লক্ষ রাখতে হবে। মোটকথা এটাই জানা প্রয়োজন যে, কী পরিমাণ লোক একটি দেশে বাস করছে এবং কী তাদের প্রকৃতি। একই নেতৃত্বে বিশ্বাসী জনগণ জাতীয় শক্তির জন্য বিশেষ সহায়ক। জাপানের জনসংখ্যা অনেক রাষ্ট্রের চেয়ে কম, কিন্তু সে-দেশের জনগণ অত্যন্ত দক্ষ বলে সে বিশেষ শক্তির অধিকারী। সামরিক প্রস্তুতি ও দক্ষতার জন্যই কম জনসংখ্যা নিয়ে জার্মানি বেশি জনসংখ্যার অধিকারী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অনেকবার যুদ্ধে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জাতীয় শক্তির অন্যান্য উপাদানের মতো জনসংখ্যাও শক্তির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

জাতীয় চরিত্র ও মনোবল (National Character and Morale)

কোন দেশের জনগণের চরিত্র ও মনোবলের উপরও সে-দেশের শক্তি অনেকটা নির্ভর করে। জাতীয় মনোবল সম্পর্কে আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানগণ অমুসলিমদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও শুধু ঈমানের জোর তাদের যে মনোবল এনে দেয়, তাই তাদের যুদ্ধজয়ে অনেক সহায়তা করে। সেই মনোবলের জোরেই একসময় অর্ধ পৃথিবীব্যাপী ইসলামের বিজয়নিশান উড্ডীন ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান বিমানবাহিনীর উপর্যুপরি আক্রমণ সত্ত্বেও ইংরেজদের জাতীয় মনোবলের দরুনই ইংল্যান্ড অনেকটা অবিচলিত থাকে। অন্যদিকে ফরাসিদের জাতীয় মনোবলের অভাবেই ম্যাজিনো লাইনের (Maginot Line) মতো প্রায় দুর্ভেদ্য ব্যূহ থাকা সত্ত্বেও তারা হিটলারের বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও বাঙালিদের দৃঢ় জাতীয় মনোবল অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত আমাদের মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় মনোবল জনগণের মধ্যে কর্মপ্রেরণা ও উৎসাহ জুড়িয়ে যে-কোন কাজে সাফল্য লাভের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

http://thejobstudy.com

কোন দেশের জনগণের জাতীয় মনোবলের সাথে সাথে থাকা দরকার জাতীয় চরিত্র। ইংরেজদের জাতীয় চরিত্রের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, তারা ব্যক্তিগত সুখসুবিধার দিকে বিশেষ নজর না দিয়ে সমগ্র জাতির কল্যাণ কামনা করে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল, সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে এক মোগল রাজকুমারীকে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে তোলার পর টমাস রো (Thomas Roe) পুরস্কারস্বরূপ নিজের ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য কোন কিছু না চেয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্য চেয়েছিলেন বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার, যা পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়। এটাই ইংরেজদের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পরও অতি অল্প সময়ের মধ্যে জার্মানি যে আবার শক্তিশালী জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশে সক্ষম হয়েছে, তার পেছনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে জার্মানদের জাতীয় চরিত্র। কোন দেশের জনগণ উন্নত জাতীয় চরিত্রের অধিকারী না হলে সে-দেশ কোন ক্ষেত্রেই উন্নতি লাভ করতে পারে না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, পূর্বের অনেক সমৃদ্ধ দেশই তার অধিবাসীদের চরিত্রের অধঃপতনের জন্য বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার মর্যাদা ও শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা পর্তুগালের কথা উল্লেখ করতে পারি।

জাতীয় চরিত্র ও জাতীয় মনোবলকে আপাতদৃষ্টিতে এক বলে মনে হলেও তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। জাতীয় চরিত্র হচ্ছে কোন দেশের জনগণের পরিপূর্ণ রূপ, এর মাধ্যমে সে-দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। কিন্তু জাতীয় মনোবলের প্রকাশ ঘটে সাধারণত যুদ্ধ বা অনুরূপ সংকটকালীন অবস্থায়। সমস্ত বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম করে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য দুঃখকষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করা এবং এর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য সবসময় চিন্তাভাবনা করা ও নিরলসভাবে কাজ করে যাবার মধ্য দিয়েই কোন দেশের জনগণের জাতীয় চরিত্র ও মনোবলের পূর্ণ পরিচয় মেলে।

সরকারের দক্ষতা (Quality of Government)

একটু আগেই বলা হয়েছে যে, জাতীয় মনোবল জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। কিন্তু কোন দেশের জনগণের জাতীয় মনোবল অনেকটা নির্ভর করে তার সরকারের কর্মকাণ্ডের উপর। যখন জনসাধারণ মনে করে যে, তাদের সরকার তাদেরকে বিভিন্ন অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখে এবং তারা জাতীয় জীবনে প্রয়োজনীয় কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ করতে পারে না, তখন স্বভাবতই তাদের জাতীয় মনোবল ভেঙে পড়বে। এরূপ অবস্থায় কোন বিপদকালীন পরিস্থিতিতে জনগণ তাদের সরকারকে সমর্থন দেবে না, যার ফলে সে-দেশের জাতীয় শক্তি অনেকটা কমে যাবে। সুতরাং দেখা যায় যে, কোন দেশের জাতীয় শক্তিতে তার সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

Go to Contents
http://thejobstudy.com

সাধারণত স্বৈরাচারী সরকার, যেমন রাশিয়ার জার, জনগণের সমর্থনের অভাবে রাষ্ট্রীয় জীবনে কোন কাজেই সাফল্য লাভ করতে পারে নি। অপরদিকে জনপ্রিয় সরকার অনেক সময় জনসমর্থণের জোরে এমন সব কাজে অংশ নিয়ে সফলতা অর্জন করতে পারে, যা অনেক সময় চিন্তাও করা যায় না। এর কারণ হল, সরকার যখন জনগণের আশাআকাঙ্ক্ষাকে উপযুক্তভাবে সম্মান প্রদর্শন করে, তখন জনগণের মধ্যেও উৎসাহউদ্দীপনা দেখা দেয় এবং সরকারের নীতিকে বাস্তবে পরিণত করার কাজে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে। অধ্যাপক মর্গেনথুর মতে, 'সরকারের দক্ষতা প্রত্যক্ষভাবে শক্তি অথবা দুর্বলতার উৎস অধিকাংশ উপাদানগুলো সম্বন্ধে যার উপর জাতীয় শক্তি নির্ভর করে, বিশেষত এ-কারণে যে, সরকার প্রাকৃতিক সম্পদ, শিল্পসামর্থ্য এবং সামরিক প্রস্তুতির উপর প্রভুত্ব করে থাকে' (The quality of government is patently a source of strength or weakness with respect to most of the factors upon which national power depends, especially in view of the influence the government exerts upon natural resources, industrial capacity and military preparedness.)[২১]। তাই আমরা বলতে পারি যে, কোন দেশের সরকার তার দক্ষতা দিয়ে জনগণকে এমনভাবে সুসংগঠিত করতে পারে যে, তার নীতিসমূহ বাস্তবায়ন সহজসাধ্য হয় এবং এভাবেই প্রকারান্তরে জাতীয় শক্তিকে বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয়।

কূটনৈকি নৈপুণ্য (Quality of Diplomacy)

অধ্যাপক মর্গেনথু তাঁর *Politics Among Nations* পুস্তকে বলেন যে, 'অস্থিতিশীল হলেও জাতীয় শক্তি গঠনে অন্যান্য উপাদানের মধ্যে কূটনীতিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান' (Of all the factors that make for the power of a nation, the most important, however unstable, is the quality of diplomacy.)[২২]। কূটনৈতিক মান একটি দেশের জাতীয় শক্তিতে নাটকীয় পরিবর্তন আনতে পারে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার মাধ্যমে দেশটিকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদায় আসীন করতে পারে। অতএব, কূটনৈতিক নৈপুণ্য একটি রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির আসরে উচ্চমর্যাদা ও উচ্চস্থান দান করে।

রাষ্ট্রনায়কগণ একটি জাতিকে বৃহৎ শক্তিতে পরিণত করবার জন্য ভৌগোলিক অবস্থা, প্রাকৃতিক সম্পদ, শিল্প উৎপাদন, জনসংখ্যা, জাতীয় চরিত্র ও মনোবল প্রভৃতি উপাদানকে কাজে লাগান। এ-সব উপাদান কাঁচামালের মতো এবং যে-দেশে এগুলো বিদ্যমান সে-দেশ এক সম্ভাবনাময় মহাশক্তি। একটি জাতির পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে সেই জাতির কূটনীতিকগণ বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তাদের কূটনৈতিক দক্ষতা জাতীয় শক্তির বিভিন্ন উপাদানকে সংহত করে এগুলোকে যথাযথভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে জাতির সুপ্ত সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলে এবং জাতীয় শক্তিকে এভাবে বাস্তবে রূপদান করে। যুদ্ধকালীন অবস্থায় সামরিক কলাকৌশলের মতোই শান্তিকালীন

http://thejobstudy.com

অবস্থায় কূটনৈতিক দক্ষতাসহকারে পরিচালিত পররাষ্ট্রনীতি জাতীয় শক্তিকে অপ্রতিহত রাখে (The conduct of a nation's foreign affairs by its diplomats is for national power in peace what military strategy and tactics by its military leaders are for national power in war.)[২৩]। এটা জাতীয় স্বার্থের (national interest) সাথে সরাসরি জড়িত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর সর্বাপেক্ষা কার্যকর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহকে সংহত করারই কলাকৌশল।

স্যার আর্নেস্ট সাতো (Sir Ernest Satow) বলেন যে, 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সরকারি সম্পর্ক নির্বাহ করার উদ্দেশ্যে বুদ্ধি ও দক্ষতার প্রয়োগই কূটনীতি' (Diplomacy is the application of intelligence and tact to the conduct of official relations between the governments of independent states.)[২৪]। সুতরাং কূটনীতি জাতীয় শক্তির অন্যান্য উপাদানকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে পররাষ্ট্রনীতিকে অধিকতর প্রভাব এবং মর্যাদাসহকারে পরিচালনার ক্ষেত্রে কার্যকারিতা দান করে। উচ্চমানের কূটনীতি পররাষ্ট্রনীতির সাধ ও সাধ্যকে জাতীয় শক্তির প্রয়োজনীয় সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে (Diplomacy of high quality will bring the ends and means of foreign policy into harmony with the available resources of national power.)[২৫]। এটা জাতীয় শক্তির লুক্কায়িত উৎসকে উন্মুক্ত করে এবং এদেরকে সম্পূর্ণভাবে ও নিশ্চিতরূপে রাজনৈতিক বাস্তবতায় পরিণত করে। এই অর্থে এটা জাতীয় শক্তির মস্তিষ্ক (Diplomacy, one might say, is the brain of national power, as national morale is its soul.)[২৬]। যদি কূটনৈতিক দৃষ্টি আচ্ছন্ন থাকে এবং এর বিচারক্ষমতা যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় ও সংকল্পের দৃঢ়তা যদি ক্ষীণ হয়, তাহলে ভৌগোলিক অবস্থা, খাদ্য ও কাঁচামাল, শিল্পে স্বনির্ভরশীলতা, সামরিক প্রস্তুতি, জনসংখ্যার পরিমাণগত ও গুণগত মান প্রভৃতি সবকিছুর সুবিধাই একটি জাতির জন্য খুব বেশি কাজে আসবে না।

যে-জাতি শক্তির জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপাদানে সমৃদ্ধ, কিন্তু সেই তুলনায় তার কূটনীতির মান তেমন উন্নত নয়, সে-জাতি হয়তো তার সম্পদের জোরে সাময়িক সাফল্য লাভ করতে পারে, কিন্তু তা তার জন্য কোন দীর্ঘস্থায়ী সুফল বয়ে আনবে না। এ-রকম একটি জাতিকে হয়তো পরিণামে কম সম্পদশালী একটি দেশের কাছে মাথা নত করতে হতে পারে। কেননা সম্পদ কম থাকলেও সে-দেশ সেটুকুকেই কূটনৈতিক নৈপুণ্যের মাধ্যমে সুচারুরূপে ব্যবহার করতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি যে, জাপান ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে ইন্দোনেশিয়া জাতীয় শক্তির বিভিন্ন উপাদানে অধিকতর সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও শুধু কূটনীতির শ্রেষ্ঠত্বের কারণে জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ইন্দোনেশিয়াসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশকে করতলগত করতে সমর্থ হয়। সেই একই কারণে জাপান বর্তমান বিশ্বে একটি অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছে। ইতিহাসেও দেখা যায় যে, মস্তিষ্কবিহীন এবং

অন্তঃসারশূন্য গোলিয়াথ (Goliath)-কে মস্তিষ্ক ও প্রাণশক্তিসম্পন্ন ডেভিড (David) হত্যা করে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, নিজস্ব শক্তির উপাদানসমূহকে যতদূর সম্ভব ভালোভাবে কাজে লাগিয়ে কোন দেশের দক্ষতাসম্পন্ন কূটনীতি তার জাতীয় শক্তিকে এমন পরিমাণে বৃদ্ধি করতে পারে, যা অন্যদের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

নিজের শক্তিতে যতখানি সম্ভব তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্ব রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে না পারলে একটি দেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার যথাযোগ্য স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না। আবার যদি কোন দেশ উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে নিজের শক্তিতে সম্ভব নয় এমন ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করে, তবে তার সেই বৈদেশিক নীতি সাধারণত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মুসোলিনীর নেতৃত্বে ইতালি এবং সুকর্নের নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়া সেই ধরনের বৈদেশিক নীতি অবলম্বন করে বিফল হয়। সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়াম (Kaiser Wilhelm II) এবং হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানিও অনুরূপ নীতি অবলম্বন করে ব্যর্থ হয়।

অতএব আমরা দেখি যে, কোন রাষ্ট্রই উন্নতমানের কূটনীতি ছাড়া বৈদেশিক সমর্থন লাভ করতে পারে না। দেশের স্থিতিশলিতার জন্য উন্নতমানের কূটনীতি অতীব প্রয়োজন। অপরপক্ষে কোন রাষ্ট্রই বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে নিঃসঙ্গ থাকতে পারে না। এ-সব ক্ষেত্রে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে তাকে সম্পর্ক রাখতেই হবে এবং এটা সাধারণত কূটনীতির মাধ্যমেই রক্ষা করা হয়। সুতরাং জাতীয় ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কূটনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

এখন আমরা কিছু বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে এর তাৎপর্য বিচার করব। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, কার্যকর পররাষ্ট্রনীতির অভাবে দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি সম্ভাবনাময় মহাশক্তি হয়েও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেই যুক্তরাষ্ট্র মহাশক্তি নীতি অনুসরণ করে এবং এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সামরিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক দায়িত্বভার গ্রহণ করে তার সে-সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপদান করে।

১৮৯০ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত ফ্রান্স যে এক মহাশক্তির মর্যাদায় পুনরাসীন হয়, তা তার উজ্জ্বল কূটনীতির জন্যই। জার্মানি একদা বিসমার্কের (Prince Otto von Bismarck) কূটনীতির মাধ্যমে ইউরোপের কয়েকটি বৃহৎ শক্তিকে পরাজিত করে নিজেকে এক মহাশক্তিকে পরিণত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু ১৮৯০ সালে রাজনৈতিক দৃশ্যপট হতে বিসমার্কের বিদায় জার্মান কূটনীতিতে গভীর ও স্থায়ী পতনের সূচনা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রায় সবগুলো পূর্ব ইউরোপীয় দেশে তার তাঁবেদার (satellite) সরকার কায়েম করতে সক্ষম হলেও যুগোশ্লাভিয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয় শুধু প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটোর (Marshal Tito) কূটনৈতিক উৎকর্ষের জন্য।

পাকিস্তানও স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে এই উপমহাদেশে কোন উল্লেখযোগ্য শক্তি হিসেবে বিবেচিত হত না। কিন্তু পরবর্তীকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর উন্নতমানের কূটনীতি তাকে উপমহাদেশে একটি শক্তি হিসেবে বিবেচিত হতে সাহায্য

http://thejobstudy.com

করে। মাও সে-তুং (Mao Zedong) এবং চৌ এন-লাইয়ের (Zhou Enlai) আমলে চীন তার ভাবমূর্তি গঠনের নীতি বুদ্ধিমত্তার সাতে পরিচালনা করে এবং তাঁদের কূটনৈতিক পারদর্শিতা চীনকে একটি বৃহৎ শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশের ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করে। অনুরূপভাবে ভারতীয় কূটনীতির শ্রেষ্ঠত্বও তাকে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। অতএব আমরা দেখতে পাই যে, কূটনীতির মানই জাতীয় শক্তির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

পাদটীকা

১. Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations : The Struggle for Power and Peace* (Calcatta : Scientific Book Agency, 1969), p. 26.
২. দেখুন, গৌরীপদ ভট্টাচার্য, *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক* (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৭৫), পৃ. ৬৯।
৩. Norman D. Palmer and Howard C. Perkins, *International Relations : The World Community in Transition* (Calcatta : Scientific Book Agency, 1970), p. 31.
৪. Morgenthau, *op. cit.*, pp. 30-31.
৫. Charles O. Lerche, Jr., *Principles of International Politics* (New York : Oxford Universit Press, 1956), p. 61.
৬. Norman J. Padelford and Geoge A. Lincoln, *International Politics* (New York : The Macmillan Co., 1954), p. 193.
৭. Morgrenthau, *op. cit.*, p. 106.
৮. See Palmer and Perkins, *op.cit.*, p. 35.
৯. See Morgenthau, *op. cit.*, p. 108.
১০. *Ibid.*
১১. Padelford and Lincoln, *op. cit.*, p. 29.
১২. Palmer and Perkins, *op. cit.*, p. 46.
১৩. Morgenthau, *op. cit.*, p. 110.
১৪. *Ibid*, p. 111.
১৫. *Ibid.*, p.113.
১৬. Lerche, Jr., *op. cit.*, p. 80.
১৭. Morgenthau, *op. cit.*, p. 114.
১৮. Russell Warren Howe, *Weapons : The International Game of Arms, Money and Diplomacy* (New York : Doubleday & Co. Inc., 1980), p. xxi.
১৯. *The Newsweek*, February 5, 1979.
২০. *The Newsweek*, June 12, 1978.
২১. Morgenthau, *op. cit.*, p. 135.
২২. *Ibid.*
২৩. ঐ।
২৪. Quoted in Palmer and Perkins, *op. cit.*, p. 84.
২৫. Morgenthau, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।
২৬. ঐ, পৃ. ১৩৫।

Job Study
To make you prepared & confident
Go to Contents
http://thejobstudy.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

শক্তিসাম্য

BALANCE OF POWER

১৬৪৮ সালে ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তি (Treaty of Westphalia, 1648) স্বাক্ষরের পর যখন আধুনিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তখন থেকেই শক্তিসাম্য নীতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি মূল বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্তী দু শতাব্দী যাবৎ এটা বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার ব্যাপারে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। কিন্তু গত শতাব্দীর শুরুর দিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর অনেকেই মনে করেন যে, এর মূলে নিহিত ছিল শক্তিসাম্য বজায় রাখার কৌশল হিসেবে ইউরোপের প্রধান শক্তিগুলোর মধ্যে গঠিত মৈত্রীজোট ও প্রতিমৈত্রীজোট (alliances and counter-alliances) এবং এভাবে এটা কুখ্যাতি অর্জন করে। তবে বর্তমানে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই আবার আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য এর প্রতি পুনরায় আস্থা স্থাপন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি যে, অধ্যাপক পামার ও পারকিন্স (Norman D. Palmer and Howard C. Perkins) মনে করেন যে, 'এটা এখনও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি মৌলিক নীতি এবং যতদিন পর্যন্ত জাতীয় রাষ্ট্র পদ্ধতি বিশ্বরাজনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করবে ততদিন পর্যন্ত সন্দেহাতীতভাবে এটা চলতে থাকবে' (It [balance of power] is still a basic principle in inernational relations, and doubtless will continue to be as long as the nation-state system is the controlling pattern of world politics.)[১]। অধ্যাপক মর্গেনথু (Hans J. Morgenthau) বলেন যে, 'শক্তিসাম্য এবং এটা রক্ষা করার জন্য গৃহীত নীতিসমূহ শুধু অনিবার্য নয়, এটা সার্বভৌম জাতি সমবায়ে গঠিত সমাজের স্থায়িত্ব আনয়নের জন্য একটি অত্যাবশ্যক উপাদান' (... the balance of power and policies aiming at its preservation are not only inevitable but

http://thejobstudy.com

are an essential stabilizing factor in a society of sovereign nations.)[২]। এখন দেখা যাক শক্তিসাম্য বলতে আমরা কী বুঝি।

শক্তিসাম্য কথাটিকে এত বেশি বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যে, এর সঠিক অর্থ খুঁজে বের করা কঠিন। ইনিস্ ক্লড (Inis L. Claude) বলেছেন যে, 'শক্তিসাম্য নিয়ে সমস্যা এই নয় যে, এর কোন অর্থ নেই, বরঞ্চ সমস্যা হল যে, এর অনেকগুলো অর্থ আছে' (The trouble with the balance of power is not that it has no meaning, but that it has too many meanings.)[৩]। অধ্যাপক পোলার্ড (A. F. Pollard) আমাদের দেখিয়েছেন যে, শক্তিসাম্য কথাটির ইংরেজি প্রতিশব্দের প্রতিটি আলাদা শব্দের বিশ্লেষণ করে পাশাপাশি সাজালে এর কয়েক হাজার অর্থ হতে পারে।[৪] যা হোক, এর মূলকথা খুব সোজা এবং তা হল 'সাম্যাবস্থা' (equilibrium), যা সাধারণত দাঁড়িপাল্লা দিয়ে বর্ণনা করা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে যখন একে প্রয়োগ করা হয় তখন শক্তিসাম্য ধারণাটি দ্বারা আমরা বুঝি স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এমন এক ধরনের সাম্যাবস্থা, যেখানে কোন একক শক্তি অথবা শক্তির সমবায়কে এমন ক্ষমতাসম্পন্ন হতে দেয়া যায় না যাতে অন্যদের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। অধ্যাপক সোয়ার্জেনবার্গার (Georg Schwarzenberger) এটাকে 'সাম্যাবস্থা' অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সম্পর্কে মোটামুটিভাবে 'স্থায়িত্ব' বোঝাতে ব্যবহার করেছেন।[৫]

শক্তিসাম্যের সবচেয়ে চমৎকার সংজ্ঞা দিয়েছেন অধ্যাপক ফে (Sidney B. Fay)। তিনি *Encyclopaedia of the Social Sciences*-এ এ-বিষয়ে একটি নিবন্ধে বলেছেন যে, 'এর (অর্থাৎ শক্তিসাম্যের) অর্থ হল রাষ্ট্রীয় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শক্তির এমন একটি সঠিক সাম্যাবস্থা, যা যে-কোন একটিকে বাধা দেবে এমন অধিক শক্তিশালী হতে যাতে সে অপরের উপর তার ইচ্ছাকে জোর করে চাপিয়ে দিতে না পারে' (It [balance of power] means such a 'just equilibrium' in power among the members of the family of nations as will prevent any one of them from becoming sufficiently strong to enforce its will upon the others.)[৬]। অধ্যাপক মর্গেনথু শক্তিসাম্যকে চারটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহারের পক্ষপাতী। এগুলো হল : ১. কোন বিশেষ অবস্থা অর্জনের জন্য গৃহীত নীতি, ২. কোন বাস্তব অবস্থা, ৩. মোটামুটিভাবে শক্তির সমবণ্টন এবং ৪. শক্তির যে-কোন ধরনের বণ্টন (1. as a policy aimed at a certain state of affairs, 2. as an actual stae of affairs, 3. as an approximately equal distribution of power, 4. as any distribution of power.)[৭]। তিনি একই সাথে আরও বলেন যে, যখন শব্দটি কোন প্রকার বিশেষণ ছাড়া ব্যবহৃত হবে, তখন এটা সেই বাস্তব অবস্থাকে বোঝাবে যেখানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শক্তি মোটামুটি সমভাবে বণ্টিত আছে (Whenever the term is used without qualification, it refers to an actual state of affairs in which power is distributed among several nations with approximate equality.)[৮]।

এভাবে দেখা যায় যে প্রতিযোগী রাষ্ট্রসমূহ, বিরোধী শক্তি ব্লক অথবা মৈত্রীজোটের মধ্যে সাম্যাবস্থা বজায় রাখার ব্যাপারে রাষ্ট্রসমূহ সচেতন প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে। শক্তির এমন ভারসাম্য কামনা করা হয় যা কোন একক রাষ্ট্র, ব্লক অথবা মৈত্রীজোট কর্তৃক আন্তর্জাতিক সিস্টেম অথবা সাবসিস্টেমে আধিপত্য বিস্তারকে নিবৃত্ত করতে যথেষ্ট বলে পরিগণিত হয়। এটাকেই বলা হয় শক্তিসাম্য।[৯]

শক্তিসাম্যের প্রকারভেদ (Forms of balance of power)

শক্তিসাম্য কখনও 'সরল' (simple) আবার কখনও 'জটিল' (complex) হতে পারে। শক্তিসাম্যকে সরল বলতে দুটি অথবা দু দল রাষ্ট্রের শক্তির ঘনীভূতকরণ বা দুটি বিপরীতমুখী শিবিরকে বোঝায়। যেমন, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিমা শক্তিবর্গের মধ্যকার সাম্য। শক্তিসাম্যের এরূপ অবস্থাকে সাধারণত দ্বি-মেরুকরণ (bipolarisation) বলে। যদি রাষ্ট্রসমূহের শক্তির বিশাল বিস্তৃতি হয় এবং তারা একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়, তাহলে একে জটিল শক্তিসাম্য বলা হয়। জটিল শক্তিসাম্যের সমতারক্ষক (balancer) নাও থাকতে পারে। শক্তির সমতারক্ষক প্রধানত সন্তোষজনকভাবে দূরে অবস্থান করে (a position of splendid isolation)। শক্তিসাম্যের স্বর্ণযুগে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে যুক্তরাজ্য (United Kingdom) ইউরোপীয় শক্তিসাম্য ব্যবস্থায় এরূপ ভূমিকা পালন করত। প্রয়োজনবোধে কোন সময় যে-কোন একদলের সাথে যুক্ত হওয়া এবং অন্য সময় বিপরীত দলের সাথে বন্ধুভাবাপন্ন হওয়াই এর বৈশিষ্ট্য। শক্তিসাম্যের এরূপ মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে যখন রাজা অষ্টম হেনরি (King Henry VIII) তাঁর এক হাতে এক জোড়া মাপকাঠির একটির মাধ্যমে ফ্রান্স এবং অন্যটির দ্বারা অস্ট্রিয়ার সাথে সদ্ভাব বজায় রাখাকে বোঝাতেন। কিন্তু অন্য হাতে তাঁর মূল শক্তি নিহিত ছিল, যা তিনি প্রয়োজন অনুসারে যে-কোন দিকে ব্যবহার করতে পারতেন। ব্রিটেনের একজন বিখ্যাত প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামারস্টোন (Lord Palmerston) সমতারক্ষকের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, 'সমতারক্ষকের কোন চিরস্থায়ী বন্ধু বা শত্রু নেই। সমতা রক্ষা করাই তার আসল উদ্দেশ্য' (The balancer has neither permanent friends nor permanent enemies, it has only the permanent interest of maintaining the balance.)[১০]।

১৯৩৬ সালে চার্চিলও (Sir Winston Churchill) এর পুনরুক্তি করেন। তিনি বলেন, 'আমাদের চিন্তার কোন কারণ নেই যদি এখন ফ্রান্সের পক্ষে আছি বলে আমাদেরকে অভিযুক্ত করা হয় এবং প্রথমে আমরা ফ্রান্সের বিপক্ষে ছিলাম। আমরা যা অনুসরণ করছি, তা (অর্থাৎ শক্তিসাম্য) হল গণনীতির একটি নিয়ম এবং এটা কেবল উদ্দেশ্য সাধনের উপায় নয়' (We should not worry if we are now accused of being pro-French and were first anti-French. It [balance of power] is a law of public policy we are following and not a mere

http://thejobstudy.com

expedient.)[১১]। গত শতাব্দীর শেষ দিকে ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানের পূর্ব পর্যন্ত গণচীন একটি তৃতীয় শক্তি (third force) এবং পশ্চিম জার্মানি ও জাপান অর্থনৈতিক পরাশক্তি (economic superpower) হিসেবে আত্মপ্রকাশের ফলে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীকে বিভক্তকারী দ্বি-মেরুকরণ অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল এবং শক্তিসাম্য এক জটিল আকার ধারণ করেছিল।

ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিচার করলে শক্তিসাম্য তিন প্রকারের, যথা : স্থানীয় (local), আঞ্চলিক (regional) ও বিশ্বব্যাপী (global)। স্থানীয় বলতে পাশাপাশি অবস্থিত দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের শক্তিসাম্যকে বোঝায়। যেমন, উপমহাদেশে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে শক্তিসাম্য। যদি কোন মহাদেশ যেমন এশিয়া, আফ্রিকা বা ইউরোপের শক্তিসমূহকে নিয়ে আলোচনা করা হয়, তবে তাকে আঞ্চলিক শক্তিসাম্য বলা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ আমরা পরস্পরবিরোধী উত্তর আটলান্টিক মৈত্রীজোট (NATO) ও ওয়ারশ চুক্তিজোট (Warsaw Pact)-ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যকার শক্তিসাম্যের উল্লেখ করতে পারি। আবার যদি পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র বিভিন্ন জোটভুক্ত হয়, তবে তা বিশ্বব্যাপী শক্তিসাম্যে রূপ নেয়। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে দুই পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে এরূপ বিশ্বব্যাপী শক্তিসাম্যের সৃষ্টি হয়।

সাধারণত রাষ্ট্রগুলো বিভিন্ন শিবির বা জোটে বিভক্ত হয়ে শক্তিসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। কোন কোন সময় এ-শক্তিসাম্যকে নমনীয় (flexible) এবং অনেক সময় অনমনীয় (rigid) বলা যেতে পারে। প্রয়োজন হলেই একটি রাষ্ট্র যখন সহজে তার নীতি এবং অন্য রাষ্ট্রের সাথে তার সম্পর্কের পরিবর্তন করতে পারে তখন তাকে নমনীয় শক্তিসাম্য বলে। আগেকার দিনে রাজা-বাদশাহদের আমলে রাজন্যগণ নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী যে-কোন জোটভুক্ত হতে এবং হঠাৎ জোট পরিবর্তন করতে পারতেন। কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রজোটের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠার পরও যখন প্রয়োজন অনুযায়ী তারা সহজে জোট ত্যাগ বা পরিবর্তন করতে পারে না, তখন সেই শক্তিসাম্যকে অনমনীয় বলা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরবিরোধী মতবাদের ভিত্তিতে বিভক্ত হওয়ায় এবং বিশেষ রাষ্ট্রের উপর আর্থিক নির্ভরশীলতার জন্য শক্তিসাম্য বর্তমানে অনেকটা অনমনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ-বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার জোটভুক্ত মিত্রগণ এবং তদ্রূপ প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার জোটভুক্ত মিত্রদেশসমূহের উল্লেখ করা যায়। তবে জোটনিরপেক্ষ (non-aligned) দেশসমূহের মধ্যে শক্তিসাম্যের ব্যাপারে কিছুটা নমনীয়তা পরিলক্ষিত হয়।

আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষায় শক্তিসাম্যের ভূমিকা (Role of balance of power in the maintenance of international peace)

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে শক্তিসাম্যের গুরুত্ব সম্পর্কে মর্গেনথু বলেন, "যদি কেউ শক্তিসাম্যে আস্থা স্থাপন করতে অনীহ হন তবে তিনি এ রকম একজন বৈজ্ঞানিক সদৃশ যিনি অভিকর্ষ বিধিতে বিশ্বাস করেন না।" ("...anyone who refused to believe in

Go to Contents
http://thejobstudy.com

balance of power, Mongenthau [maintained], resembled 'a scientist not believing in the law of gravity.'"।[১২]

জন হারজ (John Herz) ইতিহাসের অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন যে, 'যদিও 'শক্তিসাম্য ব্যবস্থা' কোন একক শক্তির প্রাধান্য বিস্তারকে রোধ করতে সমর্থ হয়েছে, তবু এটা যুদ্ধ নিবারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে' (Although the 'balance of power system' has managed to prevent one-power hegemony, it has failed to prevent war.)[১৩]। শক্তিসাম্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে মর্গেনথুর মতামত হল যে, ষোড়শ শতাব্দীর পর এটা বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় সমর্থ হয়েছে, কারণ তখন তারা হয় মৈত্রীজোট (alliance) নতুবা প্রতি-মৈত্রীজোট (counter-alliance)-এ একত্রে যোগদান করতে পারত। সুতরাং মর্গেনথু মনে করেন যে, এ-ব্যবস্থাটি ক্ষুদ্র শক্তিগুলোর স্বাধীনতা রক্ষায় সহায়ক। কিন্তু ইনিস ক্লড আমাদেরকে দেখিয়েছেন যে, 'যুদ্ধকে ঠেকিয়ে রাখা অথবা দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর স্বাধীনতাকে রক্ষা করার ব্যাপারে শক্তিসাম্য ব্যবস্থার রেকর্ড তেমন ভালো নয়' (The balance of power system has a poor record in terms of either the prevention of war or the safeguarding of the independence of weak states.)[১৪]। অতএব হারজ ও ক্লডের মতামতের উপর নির্ভর করে বলা যায় যে, শক্তিসাম্য ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা আনয়ন করে না এবং এটা যুদ্ধ অথবা আগ্রাসনকে রোধ করতেও সমর্থ নয়।

প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলান (Harold Macmillan) একবার যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন যে, ভিয়েনা চুক্তি (Treaty of Vienna, 1815) থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভকাল (১৯১৪) পর্যন্ত শতাব্দীতে বিশ্বশান্তি যে মোটামুটিভাবে অক্ষুন্ন ছিল, তার পেছনে শক্তিসাম্যের যথেষ্ট অবদান ছিল।[১৫] তবে প্রাক্তন মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিঞ্জার (Henry A. Kissinger)-এর মতে, ঐ শতাব্দীতে অবিচ্ছিন্নভাবে শান্তি বজায় ছিল না, বরং সেটা ছিল বাস্তবিকপক্ষে ক্ষুদ্র যুদ্ধের যুগ (era of small war rather than absolute peace.)।[১৬] এ-ব্যাপারে ই এইচ কার (E. H. Carr) সঠিক বক্তব্য রেখেছেন যে, ঐ শতাব্দীতে ইউরোপকে স্থিতিশীল রাখার জন্য সাম্যাবস্থা নয়, বরঞ্চ ব্রিটেনের আধিপত্যই বেশি কার্যকর ছিল।[১৭]

বাস্তব দিক থেকে বিচার করে স্পাইকম্যান (Nicholas J. Spykman) বলেন যে, রাষ্ট্রসমূহ সেই শক্তিসাম্যে আগ্রহী যা তাদের অনুকূলে থাকে। তাদের প্রধান লক্ষ্য সাম্যাবস্থা নয়, বরং সুবিধাজনক অবস্থায় থাকা (The truth of the matter is that states are interested only in a balance of power which is in their favour. Not an equilibrium, but a generous margin is their objective.)[১৮]। সুতরাং তারা শক্তিসাম্যের খেলায় সাম্য নয়, তাদের অনুকূল অসাম্যকেই পেতে চেষ্টা করে। অধ্যাপক কুইন্সি রাইটও (Quincy Wright) তাঁর *A Study of War* নামক পুস্তকে একই মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে, প্রত্যেক শক্তি, বিশেষভাবে বৃহৎ শক্তিগুলো যে শুধু নিজেদের শক্তি রক্ষা করতে আগ্রহী তাই

http://thejobstudy.com

নয়, তারা এটাকে বাড়াতেও চেষ্টা করে। এর ফলে তাদের মধ্যে কখনও শক্তিসাম্য নীতির ব্যাপারে আন্তরিক নিষ্ঠা দেখা যায় না। প্রত্যেক রাজনীতিকই শক্তিসাম্যকে অন্যের ব্যাপারে ভালো মনে করলেও নিজের জন্য ভালো মনে করে না। প্রত্যেকেই সাম্যকে নিজের হাতে ধরে রাখার জন্য এ-ব্যবস্থা থেকে দূরে সরে আসতে চায় (Each of the powers, especially the great powers, has been interested not only in preserving but also in augmenting its relative power; Consequently, there has never been wholehearted devotion to the balane of power principle among them. Each statesman considers the balance of power good for others but not for himself. Each tries to get out of the system in order to 'hold the balance'.)[১৯]।

শক্তিসাম্য রক্ষার ব্যাপারে যে-ব্যবস্থা নিতে হয়, তা স্বয়ংক্রিয় (automatic) নয়, বরং মানুষের প্রচেষ্টার মাধ্যমে সাধিত হয় (manually operated)। কাপলান (Morton A. Kaplan)-এর মতে, মানুষের প্রচেষ্টাও তার নিজ জাতীয় স্বার্থের উপর নির্ভর করে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, শক্তিসাম্যের খেলায় বৃহৎ শক্তিবর্গই আসল খেলোয়াড় এবং ক্ষুদ্র শক্তিগুলো তাদের স্বার্থের বেদিতে বলিতে পরিণত হয় অথবা বড় জোর দর্শকের ভূমিকা পালন করে। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এ-কথাটি অধিক প্রযোজ্য। কেননা সনাতন নকশায় কাজ করার উপযোগী এখানে কেউ সমতারক্ষকের (balancer) ভূমিকা পালন করতে পারে না। এমতাবস্থায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো যদি বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে সাফল্যজনকভাবে একত্র না হতে পারে, তবে তারা যে-সাম্যের জন্য চেষ্টা করবে, তার ধারক হবে অন্য কোন বৃহৎ শক্তি।

বর্তমান বিশ্বে শান্তি রক্ষার ব্যাপারে শক্তিসাম্যের কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তাই বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ক্রমে ক্রমে এমন অবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, যেখানে শক্তিসাম্য নীতিকে প্রয়োগ করা দিন দিন দুরূহ হয়ে উঠছে। এ ছাড়াও অনেক সময় দেখা যায় যে, শক্তিসাম্য ব্যবস্থার মূল বিষয়বস্তু সাম্য বজায় রাখতে গিয়ে শান্তি অর্থাৎ এর মূল উদ্দেশ্যকে জলাঞ্জলি দিতে হয়।

উপসংহারে বলা যায় যে, যদিও শক্তিসাম্য নীতিকে তত্ত্বগত দিক থেকে নিখুঁত মনে হয়, তথাপি বাস্তবক্ষেত্রে এর উপযোগিতা খুব বেশি নয়। এ-তত্ত্বের লক্ষ্য যদিও এমন একটি সঠিক সাম্যাবস্থা (just equilibrium) প্রতিষ্ঠা করা, যা শান্তির পথকে প্রশস্ত করবে, তবু বাস্তবক্ষেত্রে এটা অর্জন করা কদাচিৎ সম্ভব হয়।

শক্তিসাম্য বজায় রাখার কৌশলসমূহ (Devices for maintaining the balance of power)

শক্তিসাম্য ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয় (automatic) নয়, এটা রক্ষা করার জন্য মানুষকে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে বিভিন্ন কর্মপন্থা নিতে হয়। শক্তিসাম্যের ধারণা অনুযায়ী কোন রাষ্ট্রের ক্ষমতা যদি হঠাৎ করে এমনভাবে বেড়ে যায় যে, সে অপর রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তার প্রতি

হুমকি হয়ে দেখা দেয়, তবে সাম্যাবস্থা বজায় রাখার জন্য তাদের দরকার হয় নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করা অথবা ঐ রাষ্ট্রটির ক্ষমতা হ্রাস করার প্রচেষ্টা চালানো। এটাই শক্তিসাম্য বজায় রাখার উপযোগী বিভিন্ন কৌশলের জন্ম দেয়। এ-ব্যাপারে পণ্ডিত ও গবেষকগণ এ-পর্যন্ত প্রধানত ছটি পদ্ধতি উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছেন। এগুলো হচ্ছে—

১. মৈত্রীজোট, ২. অস্ত্রীকরণ ও নিরস্ত্রীকরণ, ৩. ক্ষতিপূরণ, ৪. সংঘর্ষ নিবারক রাষ্ট্র, ৫. হস্তক্ষেপ এবং ৬. বিভক্তিকরণ ও শাসন।

নিচে এ-কৌশলসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

১. মৈত্রীজোট (Alliances) : শক্তিসাম্য রক্ষার্থে অথবা ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে নিজ নিজ স্বার্থ বৃদ্ধির জন্য দুই বা ততোধিক দেশের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াকে মৈত্রীজোট বলা হয়। এটা শক্তিসাম্য রক্ষার একটি অন্যতম প্রধান কৌশল। অধ্যাপক মর্গেনথুর মতে, মৈত্রীজোট হচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিচালিত শক্তিসাম্যের একটি প্রয়োজনীয় ক্রিয়া' (Alliances are a necessary function of the balance of power operating within a multi-state system.)[২০]। তিনি আরও বলেন যে, 'ঐতিহাসিকভাবে শক্তিসাম্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিব্যক্তি দুটি বিচ্ছিন্ন জাতির সাম্যাবস্থার মধ্যে নয় বরং একটি জাতি অথবা মৈত্রীজোটের সাথে অন্য একটি মৈত্রীজোটের সম্পর্কের মধ্যেই দেখা যাবে' (The historically most important manifestation of the balance of power... is to be found not in the equilibrium of two isolated nations but in the relations between one nation or alliance of nations and another alliance.)[২১]। যখন বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মনের মিল না থাকা সত্ত্বেও অন্য একটি সাধারণ (common) শত্রুর বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার জন্য তারা বাধ্য হয়ে মৈত্রীজোটে আবদ্ধ হয়, তখন সে-মৈত্রীজোট ততদিন পর্যন্তই স্থায়ী হয় যতদিন ঐ সাধারণ শত্রুটি বিপদের কারণ হিসেবে বিরাজ করে। ঐ সাধারণ শত্রুটির বিনাশ ঘটলে তাদের মধ্যকার মৈত্রীজোটেরও পরিসমাপ্তি ঘটে। উদাহরণস্বরূপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার Grand Alliance-এর কথা উল্লেখ করা যায়, যা তাদের সাধারণ শত্রু হিটলারের জার্মানির বিরুদ্ধে মোকাবিলার জন্য গড়ে উঠেছিল। স্বাভাবিক কারণেই হিটলারের পতনের পর তাদের মধ্যে, বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে পশ্চিমা শক্তি দুটোর মনের মিল না থাকায় যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে এই Grand Alliance ভেঙ্গে যায়। একইভাবে বর্তমানকালে আরবজগতের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, আরব রাষ্ট্রগুলো যখনই তাদের সাধারণ শত্রু ইসরাইলের হামলা বা হুমকির সম্মুখীন হয়, তখনই তাদের মধ্যে মিত্রসুলভ মনোভাব গড়ে ওঠে, কিন্তু বিপদ সাময়িকভাবে কেটে গেলে আবার তারা নিজেদের মধ্যে বিবাদবিসংবাদে লিপ্ত হয়। দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মৈত্রীবন্ধনকে দৃঢ়তর করার ব্যাপারে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ ও মতবাদের ঐক্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। শুধু মহৎ মানবিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে যে-মৈত্রীজোট গঠিত হয়, বাস্তবে তা কার্যকর হয় না।

http://thejobstudy.com

উদাহরণস্বরূপ আমরা ১৮১৫ সালের রাশিয়ান সম্রাট জার আলেকজান্ডারের Holy Alliance-এর ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করতে পারি।

আদি ডকটর (Adi H. Doctor)-এর মতে, একটি জাতি সাম্যাবস্থা অথবা অন্য রাষ্ট্র অপেক্ষা অধিকতর শক্তি চাইতে পারে এবং তদনুযায়ী সে আত্মসম্প্রসারণ অথবা আত্মরক্ষার জন্য মৈত্রীবন্ধনে উৎসাহিত হবে (A nation may seek equilibrium or preponderant power and accordingly seek alliances for 'self-extension' or 'self-preservation.')[২২]। যখন কোন রাষ্ট্র সাম্যাবস্থা বজায় রাখার জন্য মৈত্রীজোটে আবদ্ধ হয়, তখন তা সাধারণত রক্ষণাত্মক প্রকৃতির (defensive nature) হয়ে থাকে। কিন্তু কোন রাষ্ট্র নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভের জন্য মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হলে তা সাধারণত আক্রমণাত্মক (offensive) রূপ পরিগ্রহ করে। উদাহরণস্বরূপ ১৮৮২ সালের ত্রিপক্ষীয় মৈত্রীজোট (Triple Alliance) ছিল আক্রমণাত্মক এবং পরবর্তীকালের ত্রিপক্ষীয় আঁতাত (Triple Entente) ছিল অনেকটা রক্ষণাত্মক। এভাবে একটি মৈত্রীজোট ও অপর একটি প্রতি-মৈত্রীজোট (counter-alliance) শক্তিসাম্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত হলেও বাস্তবে তা যুদ্ধের গতিকে ত্বরান্বিত করে। এভাবেই ত্রিপক্ষীয় মৈত্রীজোট ও ত্রিপক্ষীয় আঁতাত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করেছে।

২. অস্ত্রীকরণ ও নিরস্ত্রীকরণ (Armaments and disarmaments) : অস্ত্রীকরণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অধ্যাপক মর্গেনথু বলেছেন, 'যে-প্রধান উপায়গুলোর মাধ্যমে একটি জাতি তার নিজস্ব শক্তির দ্বারা শক্তিসাম্য রক্ষা অথবা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালায় তাই অস্ত্রীকরণ' (The principle [sic] means by which a nation endeavours with the power at its disposal to maintain or reestablish the balance of power are armaments.)[২৩]। অস্ত্রীকরণ শক্তিসাম্য বজায় রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলেও এটি অনেক সময় মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। তার কারণ এ-কৌশল অনুযায়ী শক্তির দিক দিয়ে কোন রাষ্ট্রের সমকক্ষ হওয়ার জন্য অন্যান্য রাষ্ট্র যখন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হতে থাকে, তখন তাদের মধ্যে শক্তিসাম্য বজায় থাকলেও এর ফলে যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা (arms race) শুরু হয়, তা পরিণামে তাদেরকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাই বিশ্বের শান্তিকামী জনগণ দাবি তুলছে যে, অস্ত্রীকরণ নয়, বরং নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমেই শক্তিসাম্য বজায় রাখতে হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গ অস্ত্রশস্ত্রের জোরে যে-শক্তিশালী অবস্থায় আছে, নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে তারা তাদের সেই সুবিধাজনক অবস্থাকে পরিত্যাগ করতে চায় না। এর ফলে শক্তিসাম্য ব্যাহত হচ্ছে। এ-ব্যাপারে অধ্যাপক পামার ও পারকিন্সের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁরা বলেন, 'বিভিন্ন ধরনের নিরস্ত্রীকরণের মানগত ও পরিমাণগত প্রস্তাব বিভিন্ন সময় দেয়া হয়েছে, কিন্তু এ-সকল সু-অভিপ্রায়পূর্ণ প্রচেষ্টার ফলাফল নৈরাশ্যজনকই হয়েছে' (Various kinds of disarmament have been proposed from time to time—quantitative and qualitative

Go to Contents
http://thejobstudy.com

disarmament,... but the results of all these well-intentioned efforts have been disappointing.)[২৪]।

৩. ক্ষতিপূরণ (Compensations) : আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ক্ষতিপূরণ বলতে এমন একটি ব্যবস্থা বোঝায়, যা দ্বারা কোন রাষ্ট্র রাজ্যজয়ের মাধ্যমে শক্তি বৃদ্ধি করলে অন্য রাষ্ট্রের সাথে উক্ত রাষ্ট্রের শক্তির যে-অসাম্য দেখা দেয়, তাকে সংশোধন করার জন্য অপর রাষ্ট্র কর্তৃক আরেকটি রাজ্য অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের দ্বারা দখলকৃত রাজ্যটির অংশবিশেষ জয়ের মাধ্যমে শক্তির সাম্য পুর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে শক্তিসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে এ-নীতিটি বহুল প্রচলিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, স্পেনীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধের (The War of Spanish Succession) পর ইউট্রেট সন্ধির (Treaty of Utrecht, 1713) মাধ্যমে যখন ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়, তখন শক্তিসাম্য বজায় রাখার জন্য স্পেনের ইউরোপীয় ভূমি ও বহির্বিশ্বের উপনিবেশগুলোকে বিবদমান হ্যাপসবার্গ (the Hapsburgs) ও বুর্বন (the Bourbons) রাজবংশের মধ্যে ক্ষতিপূরণস্বরূপ ভাগ করে দেয়া হয়। ইতিহাসে ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে শক্তিসাম্য বজায় রাখার আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৭৭২, ১৭৯৩ ও ১৭৯৫ সালে তিনবার পোল্যান্ডকে অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও প্রুশিয়া নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়, যার ফলে পোল্যান্ডের অস্তিত্বই শেষ পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে যায়। তাই শক্তিসাম্যের এই নীতিটিকে নৈতিকতার দিক থেকে সমর্থন করা যায় না, কারণ এর ফলে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে সাম্য বজায় থাকলেও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর বিলুপ্ত হয়ে যাবার ভয় থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন নতুন সাম্রাজ্যবাদের (new imperialism) সূচনা হয় তখন ইউরোপীয় বৃহৎ শক্তিগুলো তাদের শক্তিসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রায় সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ ও চীনকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়, যা ক্ষতিপূরণ নীতির সবচেয়ে কুখ্যাত উদাহরণ। ক্ষতিপূরণ নীতিকে বাস্তবে কার্যে পরিণত করতে হলে উভয় পক্ষকেই কিছু সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। অধ্যাপক মর্গেনথুর ভাষায়, 'কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনার দর কষাকষি, যা রাজনৈতিক আপোসরফায় সহায়ক হয়, ক্ষতিপূরণ নীতির সবচেয়ে সাধারণ অবয়ব ছাড়া আর কিছুই নয় এবং সেহেতু এটা শক্তিসাম্যের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত' (The bargaining of diplomatic negotiations, issuing in political compromise, is but the principle of compensaions in its most general form, and as such it is organically connected with the balance of power.)[২৫]।

৪. সংঘর্ষ নিবারক রাষ্ট্র (Buffer states) : দুটি বৃহৎ অথচ বিপরীতমনা রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত কোন ক্ষুদ্র রাষ্ট্র, যা উভয়ের মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষকে বাধাদান করে, তাকেই সংঘর্ষ নিবারক অথবা বাফার রাষ্ট্র বলে। উদাহরণস্বরূপ আমরা দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত বেলজিয়ামের কথা উল্লেখ করতে পারি। বিভিন্ন বৃহৎ শক্তির মধ্যবর্তী এই

http://thejobstudy.com

ধরনের ক্ষুদ্র রাষ্ট্র তাদের মধ্যে শক্তিসাম্য রক্ষায় বিরাট ভূমিকা পালন করে। তাই এই ধরনের রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ-সম্পর্কে অধ্যাপক পামার ও পারকিন্স বলেছেন, 'দ্বিমুখী শক্তিসম্পন্ন বিশ্বে, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলো একে অপরের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে আসে, সেখানে সংঘর্ষ নিবারক অঞ্চল ও নিরপেক্ষ এলাকা ব্যতীত শক্তিসাম্য বিশেষভাবে বিপজ্জনক' (The balance of power is especially precarious in a bipolar world without buffer zones and neutral areas, and with the rival powers in direct contact with each other.)[২৬]। সংঘর্ষ নিবারক রাষ্ট্র পাশাপাশি দুটি বৃহৎ শক্তির সাম্যকে বজায় রাখার ব্যাপারে সহায়ক হওয়া সত্ত্বেও তার নিজের অস্তিত্ব অনেক সময় বিপন্ন হতে পারে। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, ফ্রান্স ও জার্মানি পরস্পরকে আক্রমণ করতে গিয়ে অনেক সময়ই নিরপেক্ষ বেলজিয়ামের উপর দিয়ে সৈন্য চালনা করার ফলে সে মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

৫. হস্তক্ষেপ (Intervention) : শক্তিসাম্য বজায় রাখার আর একটি পদ্ধতি হল এক রাষ্ট্র কর্তৃক তার নিজস্ব শক্তিসাম্যের স্বার্থে অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা। এ-হস্তক্ষেপ সাধারণত অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তিশালী রাষ্ট্র কর্তৃক কম শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ঘটে থাকে। হস্তক্ষেপের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল স্পেনের গৃহযুদ্ধের (Spanish Civil War) সময় যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রকে সমর্থন করে, তখন সেখানে কম্যুনিস্টদের প্রাধান্য বিস্তারকে রোধ করার উদ্দেশ্যে নাৎসি জার্মানি ও ফ্যাসিস্ট ইতালি জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সমর্থন দান করে। বর্তমান কালের আন্তঃআমেরিকান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অনেক সময়ই পরিলক্ষিত হয়। আদি ডক্টরের মতে, 'হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি বন্ধুভাবাপন্ন সরকারকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা' (The purpose of intervention is to install a friendly government in power.)[২৭]। শক্তিসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ একটি কার্যকর কৌশল হওয়া সত্ত্বেও নৈতিক দিক থেকে একে সমর্থন করা যায় না, কারণ এটা রাষ্ট্রসমূহের আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী আন্তর্জাতিক ব্যবহারবিধির (international code of conduct) পরিপন্থী।

৬. বিভক্তিকরণ ও শাসন (Divide and Rule) : শক্তিসাম্য বজায় রাখার সর্বশেষ কৌশল হল বিভক্তিকরণ ও শাসন। এ-নীতির মাধ্যমে কোন রাষ্ট্র বা জোট অধিক শক্তিশালী হলে তার প্রতিপক্ষ বন্ধুরাষ্ট্র অথবা জোটভুক্ত রাষ্ট্রগুলোকে ঐ অধিক শক্তিশালী রাষ্ট্রটি থেকে দূরে সরিয়ে এনে অথবা বিচ্ছিন্ন করে সাম্যাবস্থা বজায় রাখার প্রচেষ্টা চালায়। উদাহরণস্বরূপ, চীনের মূল ভূখণ্ডে কম্যুনিস্টরা ক্ষমতা দখল করার ফলে বিশ্বব্যাপী শক্তিসাম্য (global balance of power) সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুকূলে চলে যায়। এ-অবস্থায় শক্তিসাম্য বজায় রাখার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রচেষ্টা চালায় যাতে সে গণচীনকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে এবং এ-দুটি কম্যুনিস্ট শক্তির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে শক্তিসাম্যকে নিজের পক্ষে আনয়নের ব্যাপারে তার এই প্রচেষ্টা সফলও হয়। একইভাবে ইউরোপে শক্তিসাম্য বজায় রাখার

ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সার্বক্ষণিক তৎপরতা ছিল পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোকে সোভিয়েত প্রভাববলয় (sphere of influence) থেকে মুক্ত করা। অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নও চাইত যাতে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে কোন অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত না হতে পারে এবং তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবমুক্ত হতে পারে।

পাদটীকা

১. Norman D. Palmer and Howard C. Perkins, *International Relations : The World Community in Transition* (Calcutta : Scientific Book Agency, 1970), p. 212.
২. Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations : The Struggle for Power and Peace* (Calcutta : Scientific Book Agency. 1969), p. 161.
৩. Quoted in Palmer and Perkins, *op. cit.*, p. 212.
৪. See *Ibid.*
৫. See *Ibid.*
৬. Quoted in *Ibid.*, p. 161.
৭. Morgenthau, *op. cit.*, p. 161.
৮. *Ibid.*
৯. Cantor, *op. cit.*, p. 85.
১০. See Adi H. Doctor, *International Relations : An Introductory Study* (New Delhi : Vikas Publications, 1969), p. 80.
১১. See *Ibid.*
১২. Walter LaFeber, *America, Russia, and the Cold War, 1945-1996* (New York : The McGraw Hill Co., Inc., eighth edition, 1997), p. 131.
১৩. দেখুন Michael P. Sullivan, *International Relations : Theories and Evidence* (New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1976.), pp. 189-90.
১৪. দেখুন, ঐ, পৃ. ১৯০।
১৫. দেখুন, ঐ।
১৬. দেখুন, ঐ।
১৭. দেখুন, ঐ।
১৮. দেখুন, Palmer and Perkins, *op. cit.*, p. 214.
১৯. দেখুন, ঐ।
২০. Morgenthau, *op.cit.*, p. 214.
২১. ঐ।
২২. Doctor, *op. cit.*, p. 80.
২৩. Morgenthau, *op. cit.*, p. 226.
২৪. Palmer and Perkins, *op. cit.*, p. 226.
২৫. Morgenthau, *op. cit.*, p. 174.
২৬. Palmer and Perkins, *op. cit.*, p. 226.
২৭. Doctor, *op. cit.*, p. 87.

http://thejobstudy.com

Job Study
To make you prepared & confident

সপ্তম অধ্যায়

সমষ্টিগত নিরাপত্তা

COLLECTIVE SECURITY

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি যে, যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন শক্তিসাম্য নীতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কে কুখ্যাতি অর্জন করে। কারণ অনেকে এটাকে ঐ যুদ্ধ আরম্ভ হবার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন (President Woodrow Wilson)। তিনি যুক্তি দেখান যে, ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে শক্তিসাম্য বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে সক্ষম হবে না—এ-জন্য দরকার হবে একটি নতুন ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা। তিনি নিজেই এটির উদ্ভাবন করেন যা 'সমষ্টিগত নিরাপত্তা' নামে পরিচিত। এখন সমষ্টিগত নিরাপত্তা বলতে আমরা কী বুঝি সে-সম্পর্কে আলোচনা করব।

সমষ্টিগত নিরাপত্তাকে যতটা সহজ ও পরিষ্কার অর্থবিশিষ্ট মনে হয়, বাস্তবে কিন্তু তা নয়, বরং এটা অতি জটিল এবং কঠিন। সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যদি কোন রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রজোট অন্য রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রসমূহের উপর আক্রমণ চালায়, তবে আক্রান্ত রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য অবশিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে যে-পদ্ধতির মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়, তাই সমষ্টিগত নিরাপত্তা। সমষ্টিগত নিরাপত্তার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অধ্যাপক সোয়ার্জেনবার্গার (Georg Schwarzenberger) বলেছেন যে, 'এর অর্থ হল প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নিয়মের বিরুদ্ধে কোন আক্রমণ হলে তাকে নিবারণ অথবা প্রতিহত করতে একত্রে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য উপায় অবলম্বন করা' (machinery for joint action in order to prevent or counter any attack against an estableished international order.)[১]। এভাবে সম্মিলিত ব্যবস্থা নেবার জন্য যা দরকার তা হল পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রের, বিশেষত বৃহৎ শক্তিবর্গের, আন্তরিক ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা।

Go to Contents
http://thejobstudy.com

এভাবেই সমষ্টিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় সমষ্টিগত নিরাপত্তার ভূমিকা (Role of collective security in the maintenance of international peace and security)

সমষ্টিগত নিরাপত্তা তত্ত্ব সম্পর্কে লিফার্ট (Arend Lijphart) বলেন যে, এখানে ধরে নেয়া হয় (assumption) যে, চূড়ান্ত শান্তি অর্জন করা বাস্তবিকই সম্ভবপর এবং এ-জন্য যা করণীয় তা হল এর খুঁটিনাটি বিষয়াদি সম্পন্ন করা, বিশেষ পদ্ধতি (methods) অথবা কলাকৌশল (technique) গঠন করা অথবা উপযুক্ত লোকের মধ্যে এর সঠিক ধারণা সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মানো। এই তত্ত্বের মধ্যে নিহিত আছে অনেকগুলো 'যদি এই হয়' ধরনের উক্তি ('if only' propostitions)। যেমন, যদি বৃহৎ শক্তিবর্গ শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে চেষ্টা করে... যদি ক্ষুদ্র শক্তিগুলোর কাছে অস্ত্র বিক্রি না করে ... ইত্যাদি।[২] যাঁরা মনে করেন যে, সমষ্টিগত নিরাপত্তা তত্ত্বের সাহায্যে শান্তি অর্জন করা সম্ভব, তারা এ-কথা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন যে, এই উক্তিগুলোর অন্তর্নিহিত ধারণা সঠিক নাও হতে পারে। মানুষ মনে মনে যা চায় তা বাস্তবক্ষেত্র প্রায়শ অর্জন করা সম্ভব হয় না। উদাহরণস্বরূপ, ভারতীয় ক্রিকেট দলের বিজয়ের জন্য সবাই আশা করত যে, গাভাসকার ও বিশ্বনাথ উভয়েই একই সাথে সেঞ্চুরি করবেন। কিন্তু এটা যেমন কদাচিৎ সম্ভবপর হয়, তেমনি সমষ্টিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা তত্ত্বগত দিক থেকে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে নিখুঁত মনে হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এর প্রয়োজনীয় শর্তগুলো পূরণ না হবার দরুন এটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সমষ্টিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সফলভাবে কার্যকর হবার জন্য যা দরকার তা হচ্ছে এই যে, এ-ব্যবস্থার মাধ্যমে শান্তিরক্ষাকারী রাষ্ট্রগুলোর সম্মিলিত শক্তি শান্তিবিঘ্নকারী রাষ্ট্রগুলোর সম্মিলিত শক্তি অপেক্ষা বেশি থাকতে হবে। সেই সাথে যখনই কোথাও কোন রাষ্ট্র আগ্রাসনে লিপ্ত হবে, তখন তার বিরুদ্ধে এ-ব্যবস্থার মাধ্যমে উপযুক্ত কর্মপন্থা নেয়ার জন্য শান্তিকামী রাষ্ট্রগুলোকে অবশ্যই তৈরি ও ইচ্ছুক থাকতে হবে। এ-ব্যাপারে ইনিস ক্লডের (Inis L. Claude) বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'সমষ্টিগত নিরাপত্তানীতি দাবি করে, রাষ্ট্রসমূহ তাদের জাতীয় স্বার্থকে সমগ্র বিশ্বের শৃঙ্খলা বজায় রাখার সাথে এমন গভীরভাবে যুক্ত করবে যে, কোন রাষ্ট্র কর্তৃক যে-কোন স্থানে যে-কোন রাষ্ট্রের উপর আগ্রাসনমূলক ভীতি প্রদর্শনকে অবনমিত রাখার জন্য তারা সম্মিলিত ব্যবস্থায় অংশগ্রহণে তৈরি থাকবে' (The principle of collective security requires that states identify their national interest so completely with the preservation of the total world order that they stand

http://thejobstudy.com

ready to join the collective action to put down any aggressive threat by any state, against any other state anywhere.)[৩]। এ-জন্য যা করা দরকার তা হল প্রয়োজনানুযায়ী আগ্রাসনকারী রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে কার্যকর অবরোধব্যবস্থা গড়ে তোলা, এমনকি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, সমষ্টিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সফল করতে হলে কতগুলো নৈর্ব্যক্তিক শর্ত (objective conditions) ও উদ্দেশ্যমূলক দাবি (subjective requirments) উভয়ই পূরণ করতে হয়। নৈর্ব্যক্তিক শর্তের সর্বপ্রধান ব্যাপারটি হল এই যে, সমষ্টিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থাটি কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী কি না। এবং উদ্দেশ্যমূলক দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, যে-রাষ্ট্রগুলো এ-ব্যবস্থাটির সাথে জড়িত তারা যথোপযুক্তভাবে কর্তব্যপালন করবে কি না এবং সমগ্র অথবা কমপক্ষে অধিকাংশ বৃহৎ শক্তি এ-ব্যবস্থাটির সাথে যুক্ত হবে কি না।

বর্তমান বিশ্বে সমষ্টিগত নিরাপত্তাব্যবস্থা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার ব্যাপারে কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম নয়। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, এ-ব্যবস্থাটি কার্যকর হবার জন্য যে-নৈর্ব্যক্তিক শর্ত ও উদ্দেশ্যমূলক দাবিগুলো পূরণ করা দরকার তা বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব নয়। এ-জন্য বৃহৎ শক্তিগুলো নিজেরাই প্রধানত দায়ী। অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, যে-কোন আগ্রাসনমূলক তৎপরতার পেছনে কোন-না-কোন বৃহৎ শক্তি হয় সরাসরি দায়ী অথবা অদৃশ্যস্থান থেকে কলকাঠি নাড়ে। এরূপ অবস্থায় ক্ষুদ্র শক্তিগুলো যারা সাধারণত এ-সব আগ্রাসনের লক্ষ্যবস্তু, তারা কোন কার্যকর ব্যবস্থাই নিতে পারে না। এ-দিক থেকে বিচার করে প্রখ্যাত মার্কিন কলামিস্ট ওয়াল্টার লিপম্যান (Walter Lippmann) সমষ্টিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থার বাঞ্ছণীয়তা এবং সেইসাথে সম্ভাব্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর মতে, 'অপর্যাপ্ত সমষ্টিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা আদৌ কোন ব্যবস্থার চেয়েও খারাপ' (An inadequate collective security system is worse than no 'system' at all.)[৪]। অধ্যাপক ক্লড একে সেকেলে (obsolete) হিসেবে চিহ্নিত করে মন্তব্য করেছেন যে, যদিও আগেকার যুগে এটা মোটামুটিভাবে শান্তিরক্ষার ব্যাপারে কিছুটা সহায়ক ছিল, কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে যে-পরিবর্তন এসেছে সেখানে এর সফল হবার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ আছে।

সমষ্টিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে সবচেয়ে প্রাঞ্জল বক্তব্য রেখেছেন অধ্যাপক মর্গেনথু (Hans J. Morgenthau)। তিনি এ-ব্যবস্থাকে শুধু অক্ষম নয়, অবিবেচনাপ্রসূত ও বিপজ্জনক নীতি (not only an unworkable but an unwise and dangerous principle) হিসেবেও বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, এর প্রধান কারণ হল এই যে, এর মাধ্যমে কোন যুদ্ধকেই সীমাবদ্ধ (limited) করে রাখা সম্ভব নয় এবং প্রত্যেক যুদ্ধেরই বিশ্বযুদ্ধে রূপ পরিগ্রহের ভয় থাকে।[৫]

সমষ্টিগত নিরাপত্তা ও শক্তিসাম্যের সম্পর্ক (The relation between collective security and balance of power)

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার ব্যাপারে শক্তিসাম্যের ব্যর্থতার দরুনই সমষ্টিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থার উদ্ভাবন করা হয়। এখন আমরা দেখব এ-দুটি ব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক কী অর্থাৎ তাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলো (similarities and dissimilarities) কী কী।

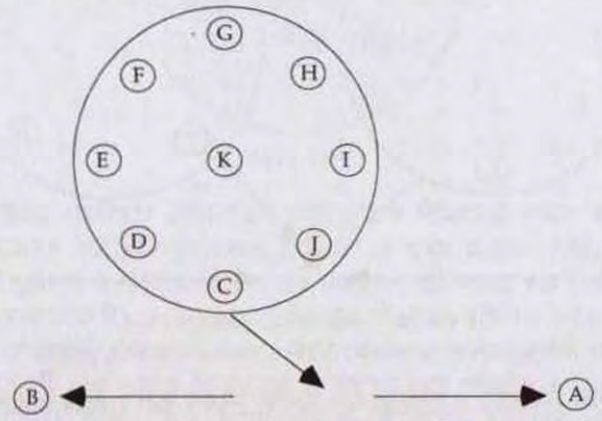

১ নম্বর চিত্র : সমষ্টিগত নিরাপত্তার আদর্শ রূপ
Source : Morgenthau, *Politics Among Nations*, p. 401.

এ-দুটি ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক কুইন্সি রাইট (Quincy Wright) যথার্থই বলেছেন যে, 'শক্তিসাম্যের সাথে সমষ্টিগত নিরাপত্তার সম্পর্ক একই সময় পরিপূরক ও পরিপন্থী' (The relations of the balance of power to collective security have been at the same time complementary and antagonistic.)[৬]। আপাতদৃষ্টিতে রাইটের এ-বক্তব্য স্ববিরোধী (contradictory) মনে হলেও আমরা পরীক্ষা করে দেখতে পাব যে, তত্ত্বগত দিক থেকে ভিন্ন হলেও সমষ্টিগত নিরাপত্তার নীতি শক্তিসাম্যের নীতির সাথে বৈষম্যমূলক নয় বরং সম্পূরক (The principles of collective security are 'not antithetic but supplementary' to those of the balance of power.)[৭]।

তত্ত্বগত দিক থেকে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় সমষ্টিগত নিরাপত্তা এবং শক্তিসাম্যের নীতি অসংগত। কারণ প্রথমটির লক্ষ্য হল আক্রমণকারী রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে যৌথ ব্যবস্থা নেয়া এবং দ্বিতীয়টি গভীরভাবে চিন্তা করে যে, কীভাবে শক্তির সাম্য বজায় রেখে কোন রাষ্ট্রকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া থেকে বিরত রাখা যায়। এ-দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে, শক্তিসাম্য চায় রাষ্ট্রগুলোকে যুদ্ধ নামক ব্যাধির আক্রমণ থেকে নিবৃত্ত করতে (prevention)। অন্যদিকে সমষ্টিগত নিরাপত্তা চায় যে, কোন

http://thejobstudy.com

রাষ্ট্র ঐ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হলে তাকে সারিয়ে তুলতে (cure)। কোন্ কৌশলটি জাতিসমূহের জন্য অধিকতর মঙ্গলজনক তা সঠিকভাবে বলা কঠিন কারণ এটা অনেকগুলো উপাদানের (factor) উপর নির্ভর করে।

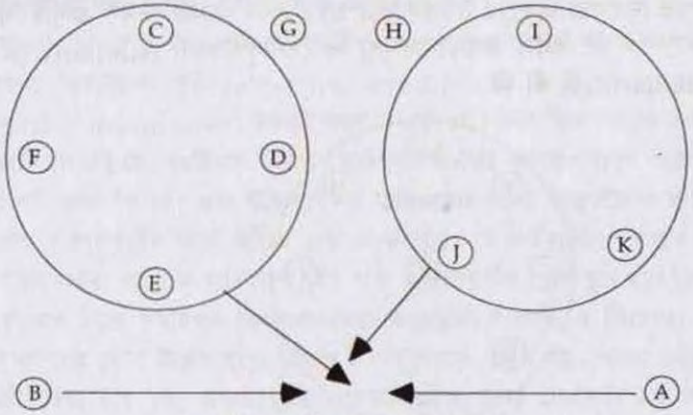

২ নম্বর চিত্র : সমষ্টিগত নিরাপত্তার বাস্তব রূপ
Source : Morgenthau, *Politics Among Nations*, p. 402.

সমষ্টিগত নিরাপত্তা ও শক্তিসাম্যের পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে অধ্যাপক পামার ও পারকিন্স (Norman D. Palmer and Howard C. Perkins) বলেছেন যে, 'প্রথমটির সারাংশ হল সম্ভাব্য আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে একটি বিশ্বফ্রন্ট গড়ে তোলা; দ্বিতীয়টির সারাংশ হল দুটি প্রায় সমান সমান এবং বিরুদ্ধ ফ্রন্ট দাঁড় করানো' (the substance of the first is a world front against a possible aggressor; the substance of the second is two approximately equal and opposing fronts.)[৮]।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একটি কার্যকর সমষ্টিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিসাম্য ব্যবস্থায় রূপ পরিগ্রহ করে। বিষয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে পরিষ্কারভাবে বোঝানো যেতে পারে। তত্ত্বগতভাবে যদি রাষ্ট্র A রাষ্ট্র B-কে আক্রমণ করে তবে C, D, E, F, G, H, I, J প্রভৃতি রাষ্ট্র A-র বিরুদ্ধে যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে B-র স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষায় সহায়তা করবে (১ নম্বর চিত্র দ্রষ্টব্য)। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এরূপ অবস্থায় C, D, E ও F রাষ্ট্রগুলো A-র বিরুদ্ধে B-র সহায়তায় এগিয়ে এলেও I, J ও K রাষ্ট্রগুলো A-র সাথে বন্ধুত্বের খাতিরে তার পক্ষে যোগ দেবে এবং G ও H দূরে সরে থাকবে (২ নম্বর চিত্র দ্রষ্টব্য)। এভাবে বাস্তব অবস্থায় A, I, J ও K এবং B, C, D, E ও F পরস্পরবিরোধী দুটি জোটে বিভক্ত হয়ে পড়ে, যা কার্যত শক্তিসাম্য ব্যবস্থাকেই ফিরিয়ে আনে। ১৯৫০ সালের কোরিয়ার যুদ্ধের সময় ঠিক এরূপ ব্যাপার ঘটেছিল।

Go to Contents
http://thejobstudy.com

১ নম্বর অবস্থা

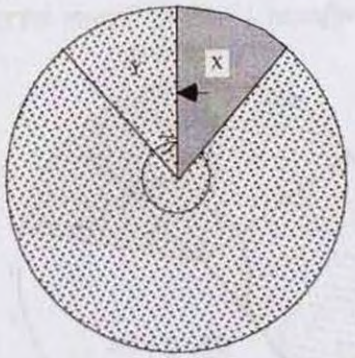

তত্ত্বগত আদর্শ

যখন উত্তর কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী আন্তর্জাতিক সীমারেখা লঙ্ঘন করে দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করে (আমরা এখনও জানি না কে প্রথম আক্রমণ চালিয়েছে, কিন্তু আলোচনার সুবিধার্থ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভাষ্য অনুযায়ী আমরা ধরে নেব যে, উত্তর কোরিয়াই আক্রমণকারী) তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আহবানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ দক্ষিণ কোরিয়ার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে এবং উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পৃথিবীর কয়েকটি দেশ তাদের সৈন্যসামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে এ-ব্যাপারে সাহায্য করে। কিন্তু প্রাথমিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুদ্ধের শেষপর্যায়ে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন তার স্বেচ্ছাসেবকদল প্রেরণ করে উত্তর কোরিয়াকে সাহায্য করে। এখানকার উদ্ভূত পরিস্থিতিকে নিম্নের চিত্র দ্বারা ব্যক্ত করা যায় (৩ নম্বর অবস্থা দ্রষ্টব্য)। এখানেও দুটি পরস্পরবিরোধী শক্তিজোটেরই সৃষ্টি হয়েছিল।

২ নম্বর অবস্থা

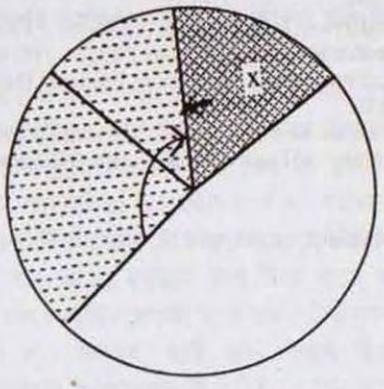

বাস্তব অবস্থা : গণচীনের অংশগ্রহণের পূর্বে কোরিয়ার যুদ্ধের অবস্থা

http://thejobstudy.com

সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, তত্ত্বগত দিক থেকে ভিন্নতর হলেও বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের দিক থেকে শক্তিসাম্য ও সমষ্টিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিশেষ কোন পার্থক্য

৩ নম্বর অবস্থা

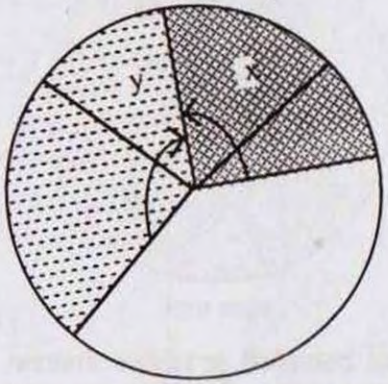

বাস্তব অবস্থা : গণচীনের অংশগ্রহণের পরে কোরিয়ার যুদ্ধের অবস্থা (=শক্তিসাম্য ব্যবস্থা)
৩ নম্বর চিত্র : সমষ্টিগত নিরাপত্তার তিনটি সম্ভাব্য অবস্থা
Source : Hartmann, The Relations of Nations, p. 394.

নেই। ঠাণ্ডা লড়াই চলাকালীন বিশ্বে সমষ্টিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত উত্তর আটলান্টিক জোট (North Atlantic Treaty Organization) এবং ওয়ারশ চুক্তি (Warsaw Treaty) সম্পর্কেও এ-কথাটি সমভাবে প্রযোজ্য। কেননা এই জোট দুটি সবসময়ই পরস্পরের মধ্যে শক্তিসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট ছিল।

পাদটীকা

১. Georg Schwarzenberger, *Power Politics* (New York : Frederick A. Praeger, 1951), p.494.
২. See Michael P. Sullivan, *International Relations : Theories and Evidence* (New Jersey : Prentice Hall Inc., 1976), p. 329.
৩. Inis L. Claude, Jr., *Power and International Relations* (New York : Random House, 1962), p. 146.
৪. See Norman D. Palmer and Howard C. Perkins, *International Relations : The World Community in Transition* (Calcutta : Scientific Book Agency, 1970), p. 252.
৫. দেখুন, ঐ, পৃ. ২৫২।
৬. দেখুন Palmer and Perkins, *op. cit., p. 227.*
৭. দেখুন, ঐ, পৃ. ২৪১।
৮. ঐ, পৃ. ২৪২।

Job Study
To make you prepared & confident

অষ্টম অধ্যায়

বিশ্ব পরিবেশগত বিচার্য বিষয়াবলি

GLOBAL ENVIRONMENTAL ISSUES

বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন পরিবর্তনের কথা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে। এ-পরিবর্তনসমূহ ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে কি না অথবা এগুলো কি অমঙ্গলের ইঙ্গিতবাহী, সে-বিতর্কটি আপাতত বাদ দিয়েও একটি কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, এগুলোর অধিকাংশই যেমন প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন, পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহে গণতন্ত্রের ঢেউ, পশ্চিম ইউরোপের একীভবন (integration) ও দুই জার্মানির একত্রীকরণ ইত্যাদি সংঘটিত হয়েছে মূলত উন্নত বিশ্বে। তাই এগুলো নিয়ে উন্নত বিশ্বে, বিশেষত পশ্চিমা দুনিয়ায়, অনেক ঢাকঢোল পেটানো হলেও এ-কথা অনস্বীকার্য যে, উন্নয়নশীল বিশ্বে তার কোন ইতিবাচক প্রভাব তো পড়েই নি, বরং এখানকার অধিকাংশ দেশই ক্রমবর্ধমান মারাত্মক সমস্যা দ্বারা আক্রান্ত। এগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল পরিবেশগত সমস্যা যা বিশ্বের সকল দেশকে গভীরভাবে চিন্তামগ্ন করে রেখেছে। এ থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় হিসেবে গত দু দশকের অধিককাল যাবৎ তারা যে বিভিন্ন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে নিয়োজিত, তার প্রমাণ মেলে ১৯৯২ সনের জুন মাসে ব্রাজিলের রাজধানী রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনের প্রতি তাদের সহযোগিতা ও সমর্থন প্রদর্শনে। বর্তমান অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হল ধরিত্রী সম্মেলনে এ-সমস্যাটি নিরসনকল্পে যে-ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে, তার উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা। যেহেতু বর্তমান বিশ্বে টিকে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো এমন একটি পরাশক্তি যার আন্তরিক প্রচেষ্টা ছাড়া সমস্যাটির সফল সমাধান বাস্তব দিক থেকে দেখতে গেলে প্রায় অসম্ভব, তাই একই সাথে রিও সম্মেলনে এবং এর পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ-ব্যাপারে কী ভূমিকা পালন করেছে তাও পরীক্ষা করে দেখা হবে।

http://thejobstudy.com

এ-অধ্যায়ের প্রথমেই পরিবেশগত সমস্যাটির স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। অতঃপর এর সমাধানের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা কেন অধিক গুরুত্বপূর্ণ সে-বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। এরপর রিও সম্মেলনের পটভূমি আলোচনা করতে গিয়ে সমস্যাটির মোকাবিলায় মানুষ কীভাবে আত্মনিয়োগ করল তা বর্ণনা করা হয়েছে। এখান থেকে অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়ে এসে রিও সম্মেলনের কার্য সম্পাদনের বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। পরিশেষে পরিবেশগত সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা মুল্যায়ন করে বর্তমান অধ্যায়ের উপসংহার টানা হয়েছে।

বিশ্ব পরিবেশগত সমস্যার স্বরূপ

এ-কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে বর্তমান বিশ্ব যে-সব সমস্যা দ্বারা আক্রান্ত তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হল পরিবেশ দূষণজনিত সমস্যা, যার জন্য মানুষের নিজ কার্যাবলিই মূলত দায়ী। অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে, অধিক হারে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ও অপচয় এবং এরোসল ও অন্যান্য স্প্রে উৎপাদন ও ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত দেশসমূহ ক্লোরোফ্লোরোকার্বন (Chloroflurocarbon, সংক্ষেপে CFC) গ্যাসসমূহ, বিশেষত কার্বনডাইঅক্সাইড (CO_2), বাতাসে ছড়িয়ে দেয় যা বিশ্বের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এ-গ্যাসসমূহ স্ট্রাটোস্ফিয়ারের ওজোন স্তরকে (ozone layer) হালকা করে তোলে, যার ফলে তাতে ফাটলও সৃষ্টি হতে পারে। প্রায় দু দশক পূর্বে একদল ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক অ্যান্টার্কটিকা ওজোনে সূক্ষ্ম ফাটল আবিষ্কার করেন।[১] এভাবে ওজোন স্তরের ক্রমাগত ক্ষতি সাধিত হলে তা সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির অত্যধিক প্রভাবকে বাধা দিতে পারে না, যার ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। এই প্রক্রিয়াটিকেই বিজ্ঞানিগণ 'গ্রিন হাউস প্রভাব' (green house effect) নামে অভিহিত করে থাকেন। বাতাসে কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবার কারণেই বিশ্বের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অনেক উন্নয়নশীল দেশ দারিদ্র্যের ফলে বাধ্য হয়ে নির্বিচারে বনভূমি ধ্বংস করে সবুজ গাছপালা কর্তৃক বাতাসের অতিরিক্ত কার্বনডাইঅক্সাইড শোষণ করার ক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে। তাই তারাও পরোক্ষভাবে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য আংশিকভাবে দায়ী।

বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে যে-সকল ভয়াবহ সমস্যা দেখা দিতে পারে বলে বিজ্ঞানিগণ একমত, তা হল, মানুষের চর্ম-ক্যান্সারসহ বিভিন্ন রোগ ও বিকলাঙ্গ শিশুর জন্মগ্রহণ ইত্যাদি বেড়ে যেতে পারে।[২] গ্রিন হাউস প্রভাব যদি অব্যাহত থাকে তবে ২০০০ সন নাগাদ বিশ্বের গাছপালা ও পশুপাখির প্রায় ২০ শতাংশ ধ্বংস হয়ে যাবার সম্ভাবনা।[৩] বর্তমানের উর্বরা কৃষিজমি মরুভূমিতে পরিণত হবার আশঙ্কা রয়ে গেছে, যার ফলে বিশ্বব্যাপী, বিশেষত অনুন্নত দেশে, মারাত্মক খাদ্যসমস্যা দেখা দিতে পারে। এর চেয়েও মারাত্মক ব্যাপার হল এই যে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা অনেকটা বেড়ে যাবে, যার ফলে সমুদ্র-উপকূলবর্তী নিম্ন এলাকাসমূহ, যেমন দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিকাংশ ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চল সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাবার ভয় আছে। এ ছাড়াও মেরু

অঞ্চলের বরফ গলা শুরু করলে প্রবল জলোচ্ছ্বাসসহ ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা বেড়ে যাবে।[৪]

বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পরিবেশগত সমস্যার প্রধান দিক হিসেবে বিবেচিত হলেও সমস্যাটির গুরুত্ব আরও কমপক্ষে দুটো কারণে সাম্প্রতিককালে প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথমত, পরিবেশগত সমস্যাটি ধরিত্রীর বুকে মানুষের বসবাসযোগ্যতাকে ক্রমশ সীমাবদ্ধ করে তোলার ভীতি প্রদর্শন করছে। দ্বিতীয়ত, সমস্যাটির ব্যাপকতা এত অধিক, যা ভৌগোলিক ও প্রজন্মগত সীমারেখা অতিক্রম করে।[৫] এ-দুটো বিষয় অনুধাবন করা যায় ক্লাব অব রোম (Club of Rome) কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণাকর্ম অধ্যয়নের মাধ্যমে।

গত শতাব্দীর ষাটের দশক নাগাদ বিশ্বের যে উন্নতি সাধিত হয়েছে, যা মানুষের জীবনযাত্রার মানকে অনেক উঁচুতে নিয়ে গেছে, সেই ধারাটি অব্যাহত রাখা যাবে কি না এবং এরূপ উন্নতির জন্য বিশ্বের সম্পদের নির্বিচারে ব্যবহারের ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ রেখে যাওয়া সম্ভব হবে কি না, সে-বিষয়ে সুষ্ঠু গবেষণাকর্ম চালিয়ে যাবার মহতী উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্বের কয়েকজন বিশিষ্ট সমাজসচেতন পণ্ডিত ব্যক্তি ১৯৬৮ সনে ক্লাব অব রোম নামক প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। ১৯৭২ সনে এটি 'ক্রমোন্নতির সীমারেখা' *(The Limits to Growth)*[৬] নামে যে-প্রথম রিপোর্টটি প্রকাশ করে, তাতে পরিবেশ, জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যকার সমস্যার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। এভাবে ক্লাব অব রোম পরিবেশগত সমস্যাটির দিকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস পেয়েছে। ১৯৭৪ সনের জুলাই মাসে 'সংকটমুহূর্তে মনুষ্যজাতি' *(Mankind at the Turning Point)*[৭] শীর্ষক এর দ্বিতীয় রিপোর্টটিতে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সমস্যার প্রকৃতি বোঝানোর জন্য যে-দুটো ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, তা হল : ১. যে-সকল প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য অপরিহার্য, তার সরবরাহ অসীম নয়, এবং ২. মানুষ যে-প্রাণীপ্রজাতিসমূহকে তার কাজে লাগে না বলে মনে করে, সেগুলোকে ধ্বংস করে প্রকৃতির জৈব বৈচিত্র্যকে কমিয়ে ফেলছে এবং এর ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে।[৮]

ক্লাব অব রোমের গবেষণার ফলাফলের আলোকে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সংক্রান্ত এক বিতর্কে সাইমন রোটেনবার্গ (Simon Rottenberg) যথার্থই বলেছেন যে, ষাট ও সত্তর দশকে যে-প্রজন্ম বসবাস করছে তারা পূর্বপুরুষদের চেয়ে বস্তুগত অর্থে অধিক সঙ্গতিসম্পন্ন জীবন উপভোগ করছে এবং অভিক্ষিপ্ত পদ্ধতির (extrapolation method) মাধ্যমে আহৃত তথ্য যা নির্দেশ করে, তাতে বোঝা যায় যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মও এরূপ সমৃদ্ধি উপভোগ করতে সক্ষম হবে না।[৯] এরূপ অবস্থায় তিনি যে-প্রশ্নটির উপর জোর দেন, তা হল, যেহেতু ভবিষ্যতে মাথাপিছু সম্পদের পরিমাণ কমে যাবে, তাই নির্দিষ্ট মজুদ সম্পদকে কী হারে ভোগ করলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বঞ্চিত হতে হবে না তা নির্ধারণ করা।[১০] এ-সম্পর্কে ক্লাব অব রোমের

Go to Contents
http://thejobstudy.com
http://thejobstudy.com

মডেলের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে সিজার (W. E. Schiesser) ঠিকই বলেছেন যে, এ-মডেলে ব্যবহৃত তথ্যের মাধ্যমে যে-ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, এ-দুটো দশকে মানুষ যে-ধরনের উন্নতমানের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, তা ২১০০ সনের চেয়ে বেশিদিন বজায় রাখার আশা নিতান্তই কম।[১১]

ক্লাব অব রোমের দ্বিতীয় রিপোর্টটি প্রকাশের অব্যবহিত পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম জ্বালানি সমস্যা দেখা দেয়, যা প্রকারান্তরে ক্রমোন্নতি সীমারেখা বিষয়ক গবেষণায় প্রাকৃতিক সম্পদের ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য অপ্রতুলতার যে-আভাস দেয়া হয়েছে, তাকে প্রমাণিত করে। তৎকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্টার প্রশাসন দুষ্প্রাপ্যতার এ-বিষয়বস্তুটি রাজনৈতিকভাবে গ্রহণ করে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের সমস্যাবলি সম্পর্কে গবেষণা চালানোর জন্য এক বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন যা, ১৯৮০ সনে '২০০০ সনে বিশ্বের অবস্থা' (Global 2000) শীর্ষক রিরোর্পটির জন্ম দেয়। ঐ রিপোর্টে ধরিত্রীর প্রাকৃতিক সম্পদের ভিত্তি যে ক্রমাগতভাবে নিচে নেমে যাচ্ছে এবং দরিদ্রতর হচ্ছে, সে-সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করা হয়।[১২]

'২০০০ সনে বিশ্বের অবস্থা' শীর্ষক রিপোর্টটি যাঁরা তৈরি করেন, তাঁরা মার্কিন প্রেসিডেন্টের নিকট এটি পেশ করার সময় বিশ্বের জনসংখ্যা ও সম্পদের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে তাঁদের মন্তব্য একটি চিঠিতে সংযোজিত করে দেন, যেখানে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয় যে,

> পরিবেশগত, সম্পদ ও জনসংখ্যার পীড়ন ক্রমান্বয়ে জোরদার হচ্ছে এবং তা বর্ধিতহারে আমাদের গ্রহে মানবজীবনের উৎকর্ষ নির্ধারণ করবে। এ-পীড়নসমূহ ইতোমধ্যেই এমন মারাত্মক আকার ধারণ করেছে যে, তা কোটি কোটি মানুষকে খাদ্য, আশ্রয়, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থানের মতো মৌলিক চাহিদা, অথবা উন্নতি সাধনের আশা থেকে বঞ্চিত করছে। একই সময়, ধরিত্রীর বহনসামর্থ্য অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজন মেটাতে জীববৈজ্ঞানিক সিস্টেমের যে-সম্পদরাজি সরবরাহ করা প্রয়োজন, সে-ক্ষমতা ক্ষয় পাচ্ছে। ২০০০ সনে বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কিত গবেষণায় যে ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে তা জোরালোভাবে ইঙ্গিত প্রদান করে যে, ধরিত্রীর প্রাকৃতিক সম্পদের ভিত্তি ক্রমাগতভাবে নিচে নেমে যাচ্ছে এবং দরিদ্রতর হচ্ছে।[১৩]

বর্তমান প্রজন্মই প্রথমবারের মতো মানবকুলের অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী এ-ধরনের দুর্দশার হেতু এবং এর আন্তর্জাতিক মাত্রাসমূহ সম্পর্কে নিজ বোধশক্তিকে বিকশিত করতে পেরেছে। এ-অবস্থা মোকাবিলার জন্য যে-দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়া প্রয়োজন, তার মূল বক্তব্য হওয়া উচিত আন্তর্জাতিক সিস্টেমের ঐক্য রক্ষা করা। অধ্যাপক পিরাজেস (Dennis Pirages) এ-ব্যাপারে যথার্থই বলেছেন যে, যে-সকল কাজ অপরের ক্ষতি সাধন করে নিজস্ব হীন স্বার্থ সিদ্ধ করে, তা ভুলে গিয়ে যে-প্রশ্নটির উপর সকল জাতিকে জোর দিতে হবে, তা হল কীভাবে আন্তর্জাতিক স্বার্থ বাড়ানো যায়। তিনি আরও বলেন যে, একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব সমস্যাসমূহ সমাধান করতে হলে অধিক বহুমুখী কার্যাবলি সম্পাদনের প্রয়োজন পড়বে, যেখানে জাতীয় ভিত্তিক চালচলন যত কম হয় ততই মঙ্গল।[১৪]

বর্তমান পরিবেশগত সমস্যা মূলত মানুষেরই সৃষ্ট। এ-সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ভ্যালেরি আবরামভ (Valery Abramov) চমৎকারভাবে বলেছেন যে, সমগ্র মানবজাতির যৌথ ব্যবহারের জন্য একটিমাত্র জীবমণ্ডল আছে, যা ভোগ করার জন্য কোন খরচ দিতে হয় না, কিন্তু মানুষ এটাকে এমন নির্বিচারভাবে অধিকমাত্রায় ব্যবহার করছে যে, বর্তমানে সমগ্র বাস্তুব্যবস্থা (Ecosystem) হুমকির সম্মুখীন।[১৫]

টিটেনবার্গ (T. H. Tietenberg) বলেছেন যে, যদি আমরা বহু পূর্বেই জানতে পারতাম, মানুষের কার্যাবলি এ-ধরিত্রীর পরিবেশকে এমন মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করবে যাতে এর পক্ষে জীবজগতের ভারবহন দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের, আমরা বর্তমানে যে-মানের জীবনযাপনে অভ্যস্ত, তা থেকে বঞ্চিত করার সম্ভাবনা দেখা দেবে, তবে আমরা হয়তো মানবকল্যাণের জন্য ভিন্ন পথ অবলম্বন করতাম।[১৬] এ-দিক থেকে চিন্তা করলে বলা চলে যে, বর্তমান প্রজন্ম অত্যন্ত কঠিন বাছাইয়ের সম্মুখীন, যেখানে বিকল্প অতিশয় কম। এভাবে তিনি পরিবেশগত সমস্যাটির প্রজন্মগত মাত্রার কথা উল্লেখ করেছেন। একই সাথে তিনি সমস্যাটির ভৌগোলিক মাত্রার প্রতিও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যখন তিনি মনে করেন যে, একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান না করে পরিবেশগত সমস্যার সমাধান অসম্ভব হয়ে পড়বে। তিনি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, বিশ্বের পরিবেশগত সমস্যা দারিদ্র্য সমস্যার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই তিনি শিল্পোন্নত দেশগুলোকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তারা যদি গরিব দেশগুলোর সহায়তায় এগিয়ে না আসে তবে শেষোক্ত দেশগুলো তাদের দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে এমন কৌশল অবলম্বন করতে বাধ্য হতে পারে, যা প্রকারান্তরে বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলবে।[১৭]

এভাবে দেখা যায় যে, বর্তমানে পরিবেশগত সমস্যা যে-মারাত্মক আকার ধারণ করেছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। স্পষ্টতই এর সমাধানের জন্য অতি জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে। এ-কথা অনুধাবন করতে হবে যে, এটা চার্চিলিয়-টাইপ পরিস্থিতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর, যেখানে বিলম্বের ফল অধিক ক্ষতিকর হতে পারে।[১৮]

মার্কিনি ভূমিকার গুরুত্ব

এ-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সমস্যাটির সমাধানের জন্য বিশ্বব্যাপী সকল জাতির একযোগে ব্যবস্থা গ্রহণে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। এতদ্‌সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই এ-ব্যাপারে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। এর কারণসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল :

প্রথমত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক সম্পদ ও সামরিক শক্তির জোরে নিজেকে বিশ্বের বুকে, বিশেষত মুক্ত বিশ্বে, নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। এরূপ নেতৃত্বের মাধ্যমে সে আরও অধিক সমৃদ্ধিশালী হতে পেরেছে। এ ছাড়াও বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাবান জাতি হিসেবে তাকেই যাবতীয় সমস্যা

http://thejobstudy.com

সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে। থুকিদিদিস (Thucydides)-এর মন্তব্য থেকে তাকে শিক্ষা নিতে হবে যে, সম্পদ ভোগ তার জন্য শুধু ঠুনকো গৌরবের ব্যাপার, কিন্তু এ-সুযোগকে যদি সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ সাধনে কাজে লাগানো যায়, তবেই সে যথার্থ মর্যাদার আসন দাবি করতে পারে।[১৯]

দ্বিতীয়ত, প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল যাবৎ বিশ্বের দুই পরাশক্তির মধ্যে চলতে থাকা ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান ও তার প্রতিদ্বন্দ্বী সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই এখন একচ্ছত্র পরাশক্তি হিসেবে বিরাজমান। এমতাবস্থায় বিশ্ব সম্পদরাজি ইনস্টিটিউটের (World Resources Institute) প্রেসিডেন্ট জেমস স্পেথ (James Gustave Speth) মনে করেন যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে একত্রে কাজ চালিয়ে যাবার জন্য নতুন দায়িত্ব স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য পূর্বের চেয়ে বর্তমানে অধিক জোরালো। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পরিসমাপ্তি এবং বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার হবার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত দারিদ্র্য এবং পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকলের সাথে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার নিয়ে এক নব যুগের সূচনাকল্পে নিজেকে উৎসর্গ করা।[২০]

তৃতীয়ত, ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তরকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেই যেখানে স্বেচ্ছায় একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা (A New World Order) গড়ে তোলার অঙ্গীকার ইতঃপূর্বেই ব্যক্ত করেছে, সেখানে বিশ্বের যাবতীয় সমস্যা সমাধানে তাকেই নৈতিক ও বুদ্ধিগত নেতৃত্ব (moral and intellectual leadership) প্রদান করতে হবে।

চতুর্থত, আগ্রাসী ইরাকের কবল থেকে কুয়েত মুক্ত করার অভিজ্ঞতা দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, যখনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে দৃঢ়তার সাথে অগ্রসর হয়েছে, তখন সে তার প্রবুদ্ধ (enlightened) নেতৃত্ব দ্বারা অন্যান্য দেশকে সমবেত করে তাদের সহযোগিতার মাধ্যমে উদ্দেশ্য অর্জনে সাফল্য লাভ করেছে। উদাহরণস্বরূপ ইইউ (European Union, সংক্ষেপে EU)-ভুক্ত দেশসমূহ ও জাপানের কথা উল্লেখ করা যায়। অনুরূপভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তরিকতার সাথে ব্যবস্থা গ্রহণে আগ্রহী হলেই পরিবেশগত সমস্যার সমাধান অধিক ফলপ্রসূ হতে পারে। এ-ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পূর্বেই একজন মার্কিন অধ্যাপক হালাল (William E. Halal) ও একজন সোভিয়েত বিশ্লেষক নিকিটিন (Alexander I. Nikitin) ঠাণ্ডা লড়াইয়ের বিভেদ ভুলে গিয়ে একটি অভিন্ন একক বিশ্ব (One World) গঠনের প্রবণতার প্রতি সকলেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে যথার্থই বলেছেন যে, যেখানে উন্নত দেশগুলোই হবে এ-গ্রহের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র, সেখানে বিশ্বের মূল সমস্যাসমূহ মোকাবিলার দায়িত্ব তাদেরই উপর বর্তায়।[২১]

পঞ্চমত, একথা অনস্বীকার্য যে, পরিবেশ সংরক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে জাতিসংঘকেই পূর্বের ন্যায় ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে হবে। যেহেতু বর্তমান অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৎপর হলেই জাতিসংঘের মাধ্যমে অনেক

Go to Contents
http://thejobstudy.com

মহৎ উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব, অনুরূপভাবে তার পূর্ণ সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঐ বিশ্ব প্রতিষ্ঠানটিকে সে পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারেও অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে আরও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে প্ররোচিত করতে পারে।

ষষ্ঠত, গত শতাব্দীর ঘটনাবলি প্রমাণ করে যে, মার্কিনিদের জন্য মনরো মতবাদ (Monroe Doctrine) আঁকড়ে ধরে অবশিষ্ট বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করা সম্ভব নয়। জাতিসমূহের মাঝে বিদ্যমান ক্রমবর্ধমান আন্তঃনির্ভরতার যুগে তাকে বিশ্বের সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত ও কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। বস্তুতপক্ষে সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকাল থেকে এ-ব্যাপারে নেতৃত্ব প্রদান করে সম্মুখপানে এগিয়ে আসার অভিলাষ ব্যক্ত করে আসছে। কিন্তু একটি কথা তাকে মনে রাখতে হবে যে, শুধু তার হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্য পদক্ষেপ নিলে তা পরিণামে তার বিপদ ডেকে আনতে পারে, কিন্তু বিশ্বের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য যা করা দরকার, সেরূপ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নীতি গ্রহণ করলে বাস্তবে তার জাতীয় স্বার্থকেই সম্মুখপানে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সংরক্ষণ অবশ্যই এরূপ একটি সামগ্রিক কল্যাণের বিষয়। এ-ব্যাপারে যথার্থ মার্কিন নীতি কী হওয়া উচিত তার আভাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাপক পিরাজেসের বক্তব্য থেকে পাওয়া যায়।[২২]

পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা : ধরিত্রী সম্মেলনের পটভূমি

এখন আমরা দেখব পরিবেশগত সমস্যাটি সম্পর্কে মানুষের চিন্তাভাবনা কখন ও কীভাবে শুরু হয় এবং এটি মোকাবিলা করার জন্য এখন পর্যন্ত কী কী প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। এ-আলোচনা থেকে রিও সম্মেলনের পটভূমি সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে।

আনুমানিক প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে আর্যগণ মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অত্যাবশ্যক পাঁচটি মৌলিক পদার্থ, যথা : মাটি, পানি, শক্তি, বাতাস ও আকাশ (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম) সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।[২৩] জাতিসংঘের উন্নয়ন প্রোগ্রামের (United Nations Development Programme, সংক্ষেপে UNDP) ১৯৯২ সনের মানব উন্নয়ন রিপোর্টেও *(Human Development Report)* এগুলোর ব্যাপারে অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে। তবে এ-রিপোর্টে যে-মূল সুরটি ব্যক্ত হয়েছে, তা হল এই যে, পানি দূষণ ও মাটির উৎকর্ষ হ্রাস (degradation) উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রধান উদ্বেগের বিষয় হলেও উন্নত দেশগুলো এখনও পর্যন্ত শুধু বায়ু দূষণ নিয়েই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।[২৪]

গ্রিন হাউস প্রভাবের বিষয়ে মানুষ প্রায় একশ বছর পূর্বেই ধারণা করতে পেরেছিল[২৫] যদিও তা কমানোর ব্যাপারে গত শতাব্দীর শেষ প্রান্তে না আসা পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নি।

পরিবেশ, জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যকার জটিল সমস্যা নিয়ে ক্লাব অব রোমের উদ্বেগ ও গবেষণার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। গত শতাব্দীতে মার্কিন

http://thejobstudy.com

যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ সংরক্ষণের ঐতিহাসিক পটভূমি খোঁজ করলে দেখা যায় যে, 'উনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার পশ্চিম দিক বিজয় শেষ হলে নতুন ভূমি পাওয়ার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়, আর এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন হয়ে পড়ে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের। ১৯০৮ সালে থিওডোর রুজভেল্ট প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের উপর যে-গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, তার মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণের বীজ লুক্কায়িত ছিল।'[২৬]

গত শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষ নাগাদ পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে পণ্ডিত ও গবেষকদের উদ্বেগ প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৯ সনে জাতিসংঘর প্রাক্তন মহাসচিব উথান্ট (U Thant) বলেছিলেন যে, জাতিসংঘের সকল সদস্যরাষ্ট্রের সামনে আর মাত্র এক দশক কাল অবশিষ্ট আছে, যে-সময়ের মধ্যে তাদেরকে সনাতন ঝগড়াবিবাদ ভুলে গিয়ে অস্ত্র প্রতিযোগিতা দমন করা, পরিবেশ উন্নত করা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ করা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে সম্মুখপানে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্বে আত্মনিয়োগ করতে হবে, নতুবা এ-সমস্যাসমূহ মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।[২৭]

১৯৭০ সনের এপ্রিল মাসে ওয়াশিংটন ডিসি-তে প্রসিদ্ধ ধরিত্রী দিবস র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়, যা বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক হয়। এ-সময় থেকেই আত্মপ্রকাশ করতে থাকে ধরিত্রীর বন্ধু (Friends of the Earth), সবুজ শান্তি (Green Peace) ইত্যাদি পরিবেশ সংরক্ষণে নিবেদিত ব্যক্তিবর্গের সমাবেশ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ। জাতিসংঘও এ-ব্যাপারে শুরু থেকেই প্রশংসনীয় ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসে।

সুইডেনের একটি প্রস্তাবের ভিত্তিতে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৬৮ সনে মানব পরিবেশ এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলো শনাক্ত করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও চুক্তির মাধ্যমে তার সমাধানের জন্য একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের আহবান জানায়। চার বছর পর ১৯৭২ সনের ৫-১৬ জুন স্টকহোমে ঐতিহাসিক মানব পরিবেশ সংক্রান্ত জাতিসংঘের সম্মেলনটি (UN Conference of Human Environment) অনুষ্ঠিত হয়। প্রারম্ভিকভাবে এ-সম্মেলনে পরিবেশগত বিষয়াবলির উপরই আলোকপাত করার ইচ্ছা থাকলেও উন্নয়নশীল দেশসমূহের সনির্বন্ধ অনুরোধে এর সাথে উন্নয়নের বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[২৮]

মোট ১১৪টি দেশ স্টকহোম সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। এই সম্মেলন মানব পরিবেশ সংক্রান্ত একটি ঘোষণাপত্র (Declaration on the Human Environment), মানব পরিবেশের জন্য একটি কর্ম পরিকল্পনা (Action Plan for the Human Environment) এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও অর্থসংক্রান্ত ব্যবস্থাবলির জন্য একটি সিদ্ধান্তের (Resolution on Institutional and Financial Arrangements) জন্ম দেয়। স্টকহোম সম্মেলনের গুরুত্ব নিয়ে তেমন ঐকান্তিক চিন্তাভাবনা করা না হলেও এখান থেকেই জন্মলাভ করে জাতিসংঘের পরিবেশগত

প্রোগ্রাম (United Nations Environmental Programme, সংক্ষেপে UNEP) নামক প্রতিষ্ঠানটি।

এরপর ১৯৮৩ সনে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ পরিবেশ ও উন্নয়নবিষয়ক বিশ্ব কমিশন (The World Commission on Environment and Development) গঠন করে। এই কমিশন বিভিন্ন দেশের সরকার ও জাতিসংঘের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলেও এদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকারী। এ-কমিশনটিকে যে তিনটি উদ্দেশ্য সম্পাদনের দায়িত্ব প্রদান করা হয় তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল, পরিবেশ ও উন্নয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পুনঃপরীক্ষা করে এগুলোর উন্নতি বিধানকল্পে যে-কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার, সে-সম্পর্কে বাস্তবসম্মত প্রস্তাবাবলি তৈরি করা।

পরিবেশ ও উন্নয়নসংক্রান্ত বিশ্ব কমিশন ১৯৮৭ সনে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের নিকট রিপোর্ট পেশ করে। নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী ব্রুনটল্যান্ড (Gro Harlem Brundtland)-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে তৈরি *আমাদের অভিন্ন ভবিষ্যৎ (Our Common Future)*[২৯] শীর্ষক এ-রিপোর্টটিতে (যা তাঁর নামানুযায়ী ব্রুনটল্যান্ড রিপোর্ট নামেও পরিচিত) যে-সকল সুপারিশ করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নকে টিকিয়ে রাখতে কী করা দরকার, সে-সম্পর্কে একটি সার্বজনীন ঘোষণাপত্র ও চুক্তি তৈরি করতে জাতিসংঘকে আহবান জানানো। ১৯৮৯ সনের ডিসেম্বর মাসে ব্রুনটল্যান্ড রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়নসংক্রান্ত একটি সম্মেলন (UN Conference of Environment and Development, সংক্ষেপে UNCED) অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সাধারণ পরিষদের যে-সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এ-সম্মেলনটি ডাকা হয়, তাতে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় যে, এটি 'সকল দেশের টেকসই এবং পরিবেশগত দিক থেকে নিরাপদ উন্নয়নকে সম্মুখপানে এগিয়ে নিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল প্রচেষ্টার কথা চিন্তা করে পরিবেশগত অবনতির প্রভাবকে সাময়িকভাবে নিবৃত্ত করতে এবং প্রত্যাবৃত্ত করতে কী কৌশল ও পদক্ষেপ নেয়া দরকার, সে-সম্পর্কে বিশদ বিবরণী তৈরি করবে।'[৩০] এতদুদ্দেশ্যে যে-প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয় তা অনেকগুলো বৈঠকের পর ১৯৯২ সনের এপ্রিল মাসে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বৈঠকে রিও ঘোষণাপত্রের (Rio Declaration) এবং আলোচনা সূচি-২১-এর (Agenda 21) প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছে। রিও সম্মেলনে স্বাক্ষরিত পরিবেশসংক্রান্ত চুক্তি দুটোর খসড়া তৈরির জন্য ১৯৯২ সনের বসন্তকালে পৃথক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

পরিবেশগত সমস্যার স্বরূপ নির্ধারণ, এই সমস্যাসমূহ মোকাবিলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা কেন অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত, সে-বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন এবং রিও সম্মেলনের পটভূমি বর্ণনার পর এখন আমরা ধরিত্রী সম্মেলনে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করার অবস্থায় পৌঁছেছি।

http://thejobstudy.com

ধরিত্রী সম্মেলনে সম্পাদিত কার্যাবলি

১৯৯২ সনের ৩-১৪ জুন ব্রাজিলের রাজধানী রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়নসংক্রান্ত সম্মেলনে, যা ধরিত্রী সম্মেলন (The Earth Conference) নামেই বহুল পরিচিত, ১৭৮টি দেশ অংশগ্রহণ করে। এ-সকল দেশের সরকারি প্রতিনিধিবর্গ ছাড়াও বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অসংখ্য বেসরকারি সংস্থা (Non-Governmental Organization, সংক্ষেপে NGO) ও সাংবাদিক এতে যোগদান করেন। বস্তুতপক্ষে এত অধিক সংখ্যক লোকের সমাগম এর পূর্বে আর কোন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দেখা যায় নি। 'মাতৃসমা ধরিত্রীর' (Mother Earth) প্রতি বিভিন্ন জাতির ক্রমবর্ধমান ব্যাকুলতাই এর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। ২০ বছর পূর্বে অনুষ্ঠিত স্টকহোম সম্মেলনের মূল সুর 'একটিমাত্র ধরিত্রী'কে (Only One Earth) এখানে আরও প্রসারিত করে তাকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদির সুপারিশ করা হয়।

ধরিত্রী সম্মেলনে দুটি প্রধান চুক্তি সম্পাদিত হয়। এগুলো হল 'আবহাওয়া পরিবর্তন সংক্রান্ত চুক্তি' (Convention on Climatic Change) এবং 'প্রাণিজগতের বৈচিত্র্য সংক্রান্ত চুক্তি' (Convention on Biological Diversity যা Biodiversity Treaty নামেও পরিচিত)। রিও সম্মেলনের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত ১৫৪টি দেশ প্রথমোক্ত এবং ১৫৬টি দেশ শেষোক্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। যে-সকল দেশ আবহাওয়া সংরক্ষণ চুক্তির স্বাক্ষর করে নি, তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কুয়েত, কাতার, তুরস্ক প্রভৃতি এবং প্রাণিজগতের বৈচিত্র্য সংরক্ষণ চুক্তিতে যারা স্বাক্ষর করে নি, তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ইরান, কিরিবাতি, মালয়েশিয়া, ওমান, পানামা, সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভিয়েতনাম ও বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

ধরিত্রী সম্মেলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হলে আমাদের উল্লেখ করা দরকার যে, এর কার্যাবলি শুধু এ-দুটো চুক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এগুলোর পাশাপাশি সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ১৭৮টি দেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত রিও ঘোষণাপত্র এবং পরিবেশের ক্ষতিসাধনকে নিম্ন পর্যায়ে রাখতে এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে টিকিয়ে রাখার সামর্থ্যকে নিশ্চিত করতে মানুষের কার্যাবলিকে কীভাবে পুনর্গঠিত করতে হবে, তার বিবরণসংবলিত এক বিস্তৃত কার্যক্রম আলোচনাসূচি ২১-এর ব্যাপারে সকল দেশের সম্মতি প্রদানও সমান গুরুত্বপূর্ণ। রিও সম্মেলনের কার্যাবলির মধ্যে আরও অন্তর্ভুক্ত ছিল সকল প্রকার বনভূমির ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নতিবিধানসংক্রান্ত মূলনীতির বিবৃতি। নিম্নে এগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হল।

প্রথমেই আবহাওয়া পরিবর্তনসংক্রান্ত চুক্তিটির কথায় আসা যাক। বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি যে-মারাত্মক ভীতির সৃষ্টি করছে, অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক সে-ব্যাপারে একমত। ইসিভুক্ত দেশসমূহ ও জাপান আবহাওয়াগত পরিবর্তনের বিপদ সঠিকভাবে উপলব্ধি করার ফলে তারা সকলে ভূমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে দায়ী কার্বন ডাইঅক্সাইডের নির্গমন ২০০০ সন নাগাদ ১৯৯০ সনের পর্যায়ে নিয়ে আসার

Go to Contents
http://thejobstudy.com

প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ-চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করার পূর্বে নিশ্চিত করে নিয়েছে যে, গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমন কমানোর কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছার ব্যাপারে তার বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

রিও সম্মেলনে স্বাক্ষরিত দ্বিতীয় অর্থাৎ প্রাণিজগতের বৈচিত্র্যসংক্রান্ত চুক্তিটি সম্পর্কে আলোচনার প্রথমেই বলা দরকার, প্রাণিজগতের বৈচিত্র্য বলতে কী বোঝায় এবং এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ। প্রাণিজগতের বৈচিত্র্য বলতে সাধারণত বোঝায় বিশ্বের সামগ্রিক প্রাণিকুলের স্বাভাবিক বংশবৃদ্ধির সুযোগদানের মাধ্যমে এ-প্রজাতিগুলোকে রক্ষা করার উপযুক্ত বাস্তু-পরিবেশ বজায় রাখা। মনুষ্যজাতিও বিশ্বের অন্যতম প্রাণিসম্পদ হিসেবে বিবেচিত এবং যেহেতু মানুষ তার বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে ধরিত্রীর প্রাণিকুলকে রক্ষা করা অথবা ধ্বংসসাধনে সমর্থ, তাই তার উপরই মূলত এ-ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণের দায়িত্ব বর্তায়। একইসাথে যেহেতু মানুষই বৈচিত্র্যময় ধরিত্রীর বিভিন্ন প্রাণীর মাধ্যমে তার প্রয়োজন মেটায়, তাই এগুলোকে সংরক্ষণ করা তার জন্য অত্যাবশ্যক। কোটি কোটি বছর যাবৎ ধরিত্রীর বুকে গাছপালা ও অন্যান্য জীবজন্তু বিবর্তনের মাধ্যমে যে-স্থায়িত্ব লাভ করেছে, তার ফলে এটা মনুষ্য বাসোপযোগী হয়েছে। প্রাণিকুলের বৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে এ-অবস্থাটিকে আরও সম্মুখপানে এগিয়ে নেয়া দরকার। তা না হলে ধরিত্রী মনুষ্য বসবাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে।[৩১]

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের অন্যতম অভিশাপ হল যে, এগুলোর মাধ্যমে পরিবেশ দূষিত হয়ে পড়েছে, যা প্রাণিকুলের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি হিসেবে কাজ করছে। নির্বিচার বৃক্ষনিধনের সাথে হারিয়ে যাচ্ছে প্রাণী ও উদ্ভিদ-দেহস্থ মূল্যবান জীবাণু-প্রাণরস (germ-plasm) যা নতুন হরমোন (hormone) তৈরির কাজে লাগে। এ-ধরনের হরমোন জৈব রাসায়নিক প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে মানুষের নিত্য ব্যবহার্য কিছুসংখ্যক দ্রব্যাদি তৈরির জন্য অত্যাবশ্যক।

তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণিপ্রজাতির মধ্যে যে জীবাণু-প্রাণরস পাওয়া যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন গবেষণাগারে তা ব্যবহার করে হরমোন তৈরি করা হয়। প্রাণিবৈচিত্র্য চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ-দেশগুলো থেকে ঐ জীবাণু-প্রাণরস আহরণে বাধাপ্রাপ্ত হবে এরূপ আশঙ্কার কথা চিন্তা করে প্রেসিডেন্ট বুশ এই চুক্তিটিতে স্বাক্ষরদানে অস্বীকৃতি জানান। কেননা তিনি মনে করেন যে, এর ফলে সে-দেশে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু একই সময় একজন মার্কিন জীববিজ্ঞানী এবং ওয়াশিংটন ডিসি-র আন্তর্জাতিক সংরক্ষণ (Conservation International) নামক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি রাসেল মিটারমাইয়ার (Russell Mittermeier) প্রশাসনের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন যে, জৈব বৈচিত্র্য চুক্তিটি সম্মেলনের অন্য প্রধান চুক্তি অর্থাৎ ভূমণ্ডল উষ্ণতা চুক্তির চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, জৈব বৈচিত্র্যের ক্ষতি একটি অপূরণীয় প্রক্রিয়া'। তিনি আরও বলেন যে, 'আমাদের নিকট যে-প্রযুক্তি আছে, তার দ্বারা পরিবেশের অন্যান্য ক্ষতি প্রতিরোধ করা যায়, কিন্তু যদি একবার আমরা কোন বৃক্ষ অথবা প্রাণিপ্রজাতি হারাই, তবে এটা চিরদিনের জন্য লুপ্ত হয়ে যাবে।'[৩২]

http://thejobstudy.com

আলোচনাসূচি-২১ প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠার এক বৃহদাকার দলিল, যা তৈরি করা হয়েছে পরিবেশের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন উন্নয়ন-অর্জন কীভাবে দীর্ঘস্থায়ী করে একবিংশ শতাব্দীতে এগিয়ে নেয়া সম্ভব এবং এ-জন্য যে-খরচ হবে তা কে বহন করবে তার বিশদ বিবরণসংবলিত এক নীলনকশা হিসেবে। এতে ধনী দেশগুলোর মাত্রাতিরিক্ত ভোগপ্রবণতা থেকে এ-সকল দেশ কর্তৃক তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ (toxic waste) ঢেলে ফেলার (dumping) মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত।

আলোচনাসূচি ২১-এর সকল বিষয়কে বাস্তবায়িত করতে যে-ধরনের অর্থনৈতিক সহায়তা দরকার, ধরিত্রী সম্মেলনে উন্নত দেশসমূহ তার প্রয়োজনীয় অঙ্গীকার প্রদান করে নি। এ-ব্যাপারে উত্তরের ধনী ও দক্ষিণের দরিদ্র দেশসমূহের মধ্যকার দীর্ঘদিন যাবৎ চলতে থাকা অচলাবস্থা দূর করার জন্য সম্মেলনে উপস্থিত রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ আলাপ-আলোচনার পর যে-সিদ্ধান্তে পৌঁছেন, তাতে 'জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত লক্ষ্যসীমা অনুযায়ী ধনী দেশসমূহ তাদের মোট উৎপাদনের শতকরা ০.৭ ভাগ সরকারি উন্নয়ন সাহায্য হিসেবে প্রদানের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে। একইসাথে তারা ঘোষণা করে যে, যেহেতু ঐ লক্ষ্যসীমায় এখনও পর্যন্ত পৌঁছা যায় নি, তাই তারা একমত যে, ঐ লক্ষ্যসীমায় পৌঁছতে তারা তাদের সাহায্য কার্যক্রমকে যত শীঘ্র সম্ভব বাড়াতে এবং আলোচনাসূচি ২১-এর দ্রুত ও কার্যকর বাস্তবায়নকে নিশ্চিত করতে তারা সম্মত।'[৩৩] এভাবে দেখা যায় যে, রিও সম্মেলনের সাফল্য নিয়ে এত ঢাকঢোল পেটানো হলেও আসলে উন্নত দেশসমূহ ইতঃপূর্বে দেয়া তাদের অঙ্গীকারের অতিরিক্ত কোন সহায়তা দানের কথা এখানে নতুনভাবে ঘোষণা করে নি।

ধরিত্রী সম্মেলনের সাফল্য ও ব্যর্থতা

ধরিত্রী সম্মেলনের সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় জাতিসংঘের মহাসচিবের মন্তব্য। সম্মেলনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার জন্য রিও ডি জেনিরোতে গিয়ে এএফপি-কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে, সম্মেলন গতিবেগ সঞ্চার করেছে।[৩৪] ধরিত্রী সম্মেলনের সমাপ্তিদিবসে প্রদত্ত সম্মেলনের মহাসচিব মরিস স্ট্রং (Maurice F Strong)-এর বক্তব্যও প্রণিধানযোগ্য। তিনি যথার্থই বলেছেন যে, রিও সম্মেলনে কয়েকটি চুক্তি সম্পাদিত হলেও যারা এগুলো কার্যকর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, সেই উন্নত দেশগুলোর নিকট থেকে খুব কম অঙ্গীকার পাওয়া গেছে। তিনি আরও বলেন যে, মানুষের ভবিষ্যৎ মঙ্গল নিশ্চিত করতে রিও সম্মেলনে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু স্পষ্টতই আরও অনেক কিছু করার ছিল।[৩৫] একই ধরনর মন্তব্য করেছে প্রকৃতির জন্য বিশ্ব তহবিল (World Wide Fund for Nature) : 'রিও'র বাস্তবতা (ধরিত্রী সম্মেলনের) প্রারম্ভিক প্রত্যাশার চেয়ে অনেক পিছিয়ে ছিল।'[৩৬]

ধরিত্রী সম্মেলনে উন্নত দেশসমূহ টেকসই উন্নয়নের (sustainable development) প্রতি গুরুত্ব আরোপ করলেও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার

(Food and Agricultural Organization, সংক্ষেপে FAO) মহাপরিচালক এডুওয়ার্ড সাওউমা (Edouard Saouma) যথার্থই বলেছেন যে, 'আসল শত্রু হল দারিদ্র্য ও সামাজিক অসমতা।'[৩৭] তিনি প্রশ্ন রাখেন যে, 'যখন ক্ষুধার্ত জনগণের বর্তমান অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন, তখন তাদের কাছ থেকে কীভাবে প্রত্যাশ্যা করা যায় যে, তারা প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করতে গিয়ে এ থেকে কিছুটা সংরক্ষণ করবে এবং ভবিষ্যৎ বংশদরদের মঙ্গলের জন্য উদ্বিগ্ন থাকবে?'[৩৮]

টেকসই উন্নয়নের সংজ্ঞা নিয়েও উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। উত্তরের ধনী দেশসমূহের একজন প্রতিনিধি হিসেবে পরবর্তীতে মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্ট আলবার্ট গোর টেকসই উন্নয়ন প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে বর্বরের ন্যায় পরিবেশের ধ্বংসসাধন কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর মতে, পরিবেশের ধ্বংসসাধন না করে অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনই হল টেকসই উন্নয়ন।[৩৯] কিন্তু দক্ষিণের দরিদ্র দেশসমূহ মনে করে যে, 'টেকসই উন্নয়নের জন্য যা দরকার তা হল সকলের মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং সকলে যাতে সমৃদ্ধ জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে, সে-জন্য তাদেরকে সব রকমের সুযোগসুবিধা প্রদান।' এতে সন্দেহের খুবই কম অবকাশ আছে যে, 'বিশ্বের যে-অংশ দারিদ্র্যকবলিত তা সর্বদাই বাস্তুসংস্থানগত ও অন্যান্য বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে বাধ্য।'[৪০]

এখানে একটি কথা বলা অত্যাবশ্যক। ইতোমধ্যে 'ধরিত্রীর বন্ধু', 'সবুজশান্তি' ইত্যাদি পরিবেশ সংরক্ষণে নিবেদিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ যুক্তি প্রদর্শন করেছে যে, বিশ্বের সামগ্রিক পরিবেশ রক্ষায় সকলের স্বার্থ জড়িত আছে। হিলারি ফ্রেঞ্চ (Hilary F. French) যুক্তি দেখিয়েছেন যে, উন্নত দেশগুলোর এমন কাজ করা উচিত নয় যাতে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়, কেননা এতে বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত সমস্যাবলি আরও খারাপ দিকে মোড় নেবে।[৪১] কিন্তু ধরিত্রী সম্মেলনে উন্নত দেশসমূহ টেকসই উন্নয়নের প্রতি জোর দিলেও যে-বিষয়টি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয় তা হল, অনুন্নত দেশগুলোর দারিদ্র্যের কারণে এর পূর্বশর্তগুলো পুরণের অসামর্থ্য। যেহেতু সামগ্রিক আন্তর্জার্তিক স্বার্থের জন্যই টেকসই উন্নয়নকৌশল অবলম্বন করা দরকার এবং এর সাথেই জড়িয়ে আছে তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্য, যা এ-ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে, তাই যাদের সঙ্গতি আছে সেই উন্নত দেশগুলোর উচিত অনুন্নত দেশসমূহকে আর্থিক সহায়তা দানের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সংরক্ষণে এগিয়ে আসা।

বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান—এই তিনটি দক্ষিণ এশীয় দেশ রিও সম্মেলনে স্বাক্ষরিত চুক্তি দুটোর ন্যায় দারিদ্র্যসংক্রান্ত একটি চুক্তি (Convention on Poverty) সম্পাদনের জন্য প্রবল প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে এ-রকম একটি চুক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কারও দ্বিমত থাকার কথা নয়। কিন্তু ধনী দেশসমূহ শুধু তাদের স্বল্পমেয়াদী অর্থনৈতিক সুযোগ সন্ধানে ব্যাপৃত থাকায় বিশ্বের দারিদ্র্য দূরীকরণের মতো আন্তর্জাতিক স্বার্থকে অস্বীকার করে স্পষ্টতই দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে। অধিকন্তু পরিবেশের প্রতি তাদের উদ্বেগকে সামনে রেখে ধনী

http://thejobstudy.com

দেশসমূহ রিও সম্মেলনে এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেগুলো মেনে চলা দরিদ্র দেশসমূহের জন্য যথার্থই কষ্টকর। বস্তুতপক্ষে ধরিত্রী সম্মেলনে উন্নত দেশসমূহ ও অনুন্নত দেশগুলোর মধ্যকার মতবিরোধ এমন স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, যে-কারণে ৭৭-জাতি গ্রুপের প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানের জামশেদ মার্কার ঘোষণা করতে বাধ্য হন যে, উন্নয়নশীল দেশসমূহ ধরিত্রী সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ মেনে চলবে না, যদি তা করতে গিয়ে তারা যে-অর্থনৈতিক অসুবিধার সম্মুখীন হবে, উন্নত দেশসমূহ তার ক্ষতিপূরণ না করে।[৪২]

দক্ষিণের দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যেই বিরাজ করছে ক্ষুধা, ব্যাধি ও দারিদ্র্যের মতো ভয়াবহ সমস্যাসমূহ এবং এর সাথে বর্তমানে যুক্ত হয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদ ও স্থানীয় পরিবেশ অবনতির মতো মারাত্মক হুমকি। এ-বিষয়গুলো চিন্তা করেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের *ওয়াশিংটন পোস্ট (The Washington Post)*-এর মতো একটি প্রভাবশালী দৈনিকে 'রিও থেকে খুঁড়িয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন' (Limping home from Rio) শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে সঠিকভাবে বলা হয় যে, যদি শিল্পোন্নত দেশসমূহ বিশ্বের অবশিষ্ট দেশগুলোর নিকট থেকে যথার্থ পরিবেশগত সহযোগিতা চায়, তবে তাদেরকে এমন একটি উত্তর-দক্ষিণ সমঝোতায় আসতে হবে, যাতে দরিদ্র দেশসমূহকে মান্ধাতার আমলের মতো এলোপাতাড়িভাবে কর্তন ও জ্বালানো পদ্ধতি অবলম্বন করে বাঁচতে না হয় এবং এটা প্রতিরোধ করার জন্য দরকার ধনী দেশগুলো কর্তৃক তাদেরকে সম্পদ সরবরাহ করা অর্থাৎ অর্থ ও প্রযুক্তি প্রদান করা।[৪৩]

ধরিত্রী সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরিবেশগত সমস্যার মতো একটি কঠিন সমস্যা নিরসন করতে সকল রাষ্ট্রের প্রচেষ্টা অত্যাবশ্যক হলেও উন্নত দেশসমূহের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এ-ব্যাপারে সাফল্য লাভ অকল্পনীয়। যেহেতু উন্নত দেশসমূহই পরিবেশ দূষণের জন্য প্রধানত দায়ী, তাই দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি তাদের নৈতিক দায়িত্বও বটে। কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, কোন ব্যক্তি অথবা দেশই কোন কার্য সম্পাদনের জন্য তার স্বার্থ সরাসরি জড়িত না থাকলে শুধু মানবতার আহবান দ্বারা কখনও পরিচালিত হয় নি। পরিবেশগত সমস্যাটি মোকাবিলার ক্ষেত্রেও এ-কথাটি সমভাবে প্রযোজ্য। উন্নত দেশগুলোর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই কেন এ-ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে তা পূর্বে বলা হয়েছে। এখন আমরা দেখব ধরিত্রী সম্মেলনে বিভিন্ন কার্য সম্পাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে-ভূমিকা পালন করেছে, তা কতটুকু ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক। একই সাথে পরীক্ষা করে দেখা হবে যে, ধরিত্রী সম্মেলনের পরবর্তী সময় নতুন মার্কিন প্রশাসনের কাছ থেকে যে অধিক ইতিবাচক নীতি গ্রহণের আশা করা হয়েছিল, প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের কার্যাবলিতে বাস্তবক্ষেত্রে তা কতটুক পূরণ হয়েছে।

Go to Contents
http://thejobstudy.com

ধরিত্রী সম্মেলনে যে-দুটো গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে, তার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবহাওয়া পরিবর্তনসংক্রান্ত চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করার পূর্বে নিশ্চিত করে নিয়েছে যে, গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমন কমানোর কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছার ব্যাপারে তার কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না। আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে দ্বিতীয় অর্থাৎ প্রাণিজগতের বৈচিত্র্য চুক্তিটিতে আদৌ স্বাক্ষর করে নি। এবং আলোচনা সূচি ২১-এর বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তাদানের ব্যাপারেও সে কোন নতুন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয় নি।

বুশ প্রশাসন রিও সম্মেলনে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তিতে গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গত হবার উপর সীমারেখা বেঁধে দেবার বিরুদ্ধে যে-জেদ প্রকাশ করতে থাকে, তা শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে। সে খোঁড়া যুক্তি প্রদর্শন করে যে, এ-ধরনের সীমারেখা আজকের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে কিছুটা হলেও ব্যাহত করবে, কিন্তু আগামী দশকের গবেষণায় বিজ্ঞানিগণ হয়তো দেখতে পাবেন যে, এ-গ্যাসসমূহ আবহাওয়াকে তেমনভাবে প্রভাবিত করে না।[৪৪] এখানে উল্লেখ্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরল পদার্থের গতিবিজ্ঞান বিষয়ক ভূপ্রকৃতিবিদ্যা গবেষণাগারে (Geophysical Fluid Dynamics Laboratory) বায়ুমণ্ডলে অধিকহারে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎক্ষেপণের ফলে যে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, তা ক্রমাগতভাবে প্রমাণিত হচ্ছে[৪৫] এবং ১৯৮৯ সন নাগাদ ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচারমাধ্যমগুলো ঘোষণা করতে থাকে, 'সকল বিজ্ঞানী' একমত যে, ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ব্যাপারটি বাস্তব সত্য এবং এটির মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে সম্ভাব্য সর্বনাশ।[৪৬] সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনে এ-ব্যাপারে কোন অনিশ্চয়তা (uncertainty) থাকা ঠিক নয়। এ-বিষয়ে তার নিজস্ব সম্পূর্ণ আপোসবিরোধী মনোভাব (individual intransigence) সম্মিলিত বিজ্ঞতাকে (collective wisdom) অস্বীকার করার নামান্তর। এভাবে সে 'দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ' উদ্দীপনার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করছে। ভবিষ্যৎ গবেষণা যদি বর্তমান ভীতিকেই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে, তখন তাকে আর ফেরানোর উপায় থাকবে না—ক্ষতি যা হবার তা হয়েই যাবে, যার পূরণ আর কোনভাবেই সম্ভব হবে না।

আসলে বুশ প্রশাসন আবহাওয়া সংরক্ষণসংক্রান্ত বলিষ্ঠ চুক্তিতে আবদ্ধ হতে ভীত এই কারণে যে, এর ফলে তার জাতীয় জ্বালানি নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে হবে এবং অনেক আমেরিকান চাকরি হারাবে। বুশ প্রশাসনের অনেকেই ভুল ধারণা পোষণ করেন যে, পরিবেশ সংরক্ষণ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের মধ্যে, প্রায় খাপ খাওয়ানো যায় না, এমন বিরোধ বিদ্যমান। আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাতিন আমেরিকায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জনের ফলে তার নিজের দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় স্বার্থ যে অধিক সিদ্ধ হবে তা বুশ প্রশাসন অনুধাবন করতে ব্যর্থ হবার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন আচরণ করে, যা অনবরত উত্তর-দক্ষিণ সংঘর্ষের সূত্রপাত করে।[৪৭]

http://thejobstudy.com

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে-যুক্তিতে প্রাণিবৈচিত্র্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করে নি তা হল : এ চুক্তিটির বিষয়বস্তু এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হতে পারে, যার ফলে গরিব দেশগুলোকে নিরক্ষীয় বনভূমি ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে এখানে যে-সকল সমৃদ্ধ উদ্ভিদ ও প্রাণিপ্রজাতি আছে সেগুলোকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে গেলে প্রথমত মার্কিনি গবেষণাগারসমূহে হরমোন তৈরির কাজে লাগে এমন জীবাণু-প্রাণরস আহরণ করা সম্ভব হবে না, যার ফলে সে-দেশে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাবে;[৪৮] এবং দ্বিতীয়ত, এগুলোকে যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গরিব দেশগুলোকে সহায়তা করতে গেলে তাকে প্রচুর আর্থিক সাহায্যের অঙ্গীকার করতে হতে পারে। এভাবে ধরিত্রী সম্মেলনে প্রদত্ত ৫ জুনের ভাষণে প্রেসিডেন্ট বুশ যখন ঘোষণা করেন যে, তিনি এমন কোন চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন না, যাতে উন্নয়নশীল দেশসমূহ কর্তৃক কিছু কিছু সম্পদ সংরক্ষণের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাবে, তখন উন্নয়নশীল দেশের প্রতিনিধিবর্গ ন্যায়সঙ্গতভাবে অভিযোগ তোলেন যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিশ্বের বায়ুমণ্ডল রক্ষার মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের চেয়ে তাঁর সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিচ্ছেন।

ধরিত্রী সম্মেলনে আন্তর্জাতিক পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে প্রণীত চুক্তি দুটির ব্যাপারে বুশ প্রশাসন অবশিষ্ট বিশ্বের সাথে সহযোগিতার মনোভাব প্রদর্শনে ব্যর্থতার পরিচয় দিলে তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহ ও জাপানসহ সকলেরই ক্রোধের উদ্রেক করে। এ ছাড়াও বুশ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্কে উত্তর-দক্ষিণ সমঝোতায় আসার মধ্যে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লাভ ছাড়া লোকসান নেই, এ-সত্যটি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হবার ফলে আলোচনাসূচি ২১-এর জন্যও প্রয়োজনীয় অর্থ জোগান দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এর ফলে সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার বন্ধু ও মিত্রসহ অবশিষ্ট দেশসমূহ থেকে ক্রমান্বয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ধরিত্রী সম্মেলনোত্তর পরিবর্তিত মার্কিনি নীতি

বুশ প্রশাসন ধরিত্রী সম্মেলনে হতাশাব্যঞ্জক ও অনেকটা নেতিবাচক ভূমিকা পালন করলেও তাঁর উত্তরসূরি প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন অচিরেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ বিশ্ব পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ এবং তাই তিনি উন্নয়নশীল দেশসমূহসহ অবশিষ্ট বিশ্বের সাথে পরিবেশ দূষণরোধে অধিক সহযোগিতামূলক মনোভাব প্রদর্শনের ইঙ্গিত দেন। গভর্নর ক্লিনটন সিনেটর আলবার্ট গোরের মতো একজন নিবেদিতপ্রাণ পরিবেশবিদকে[৪৯] নির্বাচন সহযোগী (running mate) হিসেবে বেছে নিয়ে প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনবৈতরণী পার হবার পর সকলেই আশা করেছিলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশসংক্রান্ত নীতিতে পরিবর্তন আসবে। এটা আনন্দের বিষয় যে ২১এপ্রিল, ১৯৯৩ তারিখে প্রদত্ত তাঁর বাণীতে এরূপ পরিবর্তনের আভাসও পাওয়া যায়। ধরিত্রী দিবস উপলক্ষে ওয়াশিংটন ডিসি-তে অবস্থিত জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান (National Botanical Garden) প্রদত্ত ঐ বাণীতে তিনি ঘোষণা করেন যে, অস্তিত্ব বিপন্ন এরূপ প্রজাতিকে রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণীত সংশ্লিষ্ট

চুক্তিটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাক্ষর করবে এবং বিশ্বের তাপমাত্রা বেড়ে যেতে পারে অথবা গ্রিন হাউস প্রভাবকে বাড়িয়ে তোলে, এরূপ গ্যাসের ব্যবহারকে ঐ-শতাব্দীর শেষ নাগাদ ১৯৯০ সনের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হবে।[৫০]

নতুন মার্কিন প্রশাসনের পরিবেশসংক্রান্ত নীতিতে এ-পরিবর্তনের কারণ দেখাতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ঘোষণা করেন যে, প্রকৃতির দান আমাদের অপচয়ের জন্য নয়। এটা ঈশ্বরের নিকট থেকে প্রাপ্ত উপহারস্বরূপ, যা ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য আমানত হিসেবে আমাদের নিকট গচ্ছিত। আমরা যদি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদরাজি রক্ষা করি, এগুলোকে বাড়িয়ে তুলি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট তা সুচারুরূপে হস্তান্তর করি, তবে তা হবে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মহান জনগণসুলভ সুযোগ্য কাজ। যদি আমরা এ-সুযোগ গ্রহণ করে যথার্থতার সাথে দায়িত্ব পালন করি, তবে তা যে শুধু ভবিষ্যৎকে সমৃদ্ধ করবে তাই নয়, এটা আমাদের নিজ জীবনকেও মহান করে তুলতে পারে। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন আরও বলেন যে, দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের বলা হয়েছে যে, আমাদেরকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ—এ দুটো বিষয়ের মধ্য থেকে একটিকে বেছে নিতে হবে। কিন্তু সুস্থ পরিবেশ ছাড়া সন্তোষজনক অর্থনীতি অচিন্তনীয়। এটা সত্যি যে, পরিবেশগত সমস্যা তেজী উন্নতি নয়, বরং হঠকারী উন্নতির ফল।

দ্বিতীয়ত, প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ঘোষণা করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজ দেশে এবং একই সাথে বহির্বিশ্বে পরিবেশ সংরক্ষণ করতে চায়। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন যে, বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি, মহামারী ও পরিবেশগত বিপদ একই সূত্রে গ্রথিত। এ-প্রসঙ্গটির আলোকে বর্তমান যুগের কেন্দ্রীয় চ্যালেঞ্জ হল অবশিষ্ট বিশ্বের সাথে সঙ্গতি রেখে মার্কিন জাতীয় স্বার্থ সম্মুখপানে এগিয়ে নেয়া। এ-ব্যাপারে তিনি সঠিক যুক্তি দেখান যে, যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এ-বিশ্বের সকল জাতির সাথে ভাগাভাগি করে বায়ুমণ্ডল, জীবজগৎ ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়, সে-জন্য তাদের ভাগ্যও সকলের সাথে গ্রথিত।

তৃতীয়ত, প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন বলেন যে, যদি আমরা এই মুহূর্তে কিছু না করি তবে আমরা এমন ভবিষ্যতের সম্মুখীন হব, যেখানে আমাদের গ্রহ ৯,০০০ মিলিয়ন অধিবাসীর বাসভূমিতে পরিণত হবে। এরূপ পরিস্থিতিতে ধরিত্রীর জীবজগতের বিভিন্ন প্রাণীর ভারবহন করা ও বাঁচিয়ে রাখার সামর্থ্য অনেকটা লোপ পাবে।[৫১] এভাবে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন সমগ্র বিশ্বের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্বের কথা নিজেই স্বীকার করেছেন।

পরিবেশসংক্রান্ত মার্কিন নীতির সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রিও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার প্রায় এক বছর পূর্বে ১৯৯১ সনের আগস্ট মাসে হোয়াইট হাউস কর্তৃক ইস্যুকৃত 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল' (National Security Strategy of the United States) শীর্ষক দলিলে বলা হয়েছে যে, মার্কিন

http://thejobstudy.com

যুক্তরাষ্ট্রের উচিত বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারকে এমনভাবে নিশ্চিত করতে ভূমিকা পালন করা, যাতে বর্তমান প্রজন্মের উন্নয়নকে সম্মুখানে এগিয়ে নিয়ে যাবার সাথে সাথে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যও সুযোগ সংরক্ষিত থাকে। এতে আরও বলা হয়েছে যে, সন্তোষজনক অর্থনীতি ও সুস্থ পরিবেশ একত্রে অবস্থান করতে পারে। ঐ দলিলে এমন সমাধান খুঁজে বের করার কথা বলা হয়েছে, যা বিশ্বের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর জন্য যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দরকার তা মেনে পরিবেশ সংরক্ষণকে সম্ভব করতে পারে। এখানে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য যে-বিষয়গুলো সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে স্টাটোস্ফিয়ারের ওজোন হ্রাস, আবহাওয়া পরিবর্তন, খাদ্য নিরাপত্তা, পানি সরবরাহ, বনভূমি ধ্বংসকরণ, জীববৈচিত্র্য ও বর্জ্য পদার্থের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ।[৫২] তবে দারিদ্র্যের কথা এখানে উল্লিখিত হয় নি।

এখন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের আশাব্যঞ্জক বক্তব্যকে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে- 'অনেকদিন যাবৎ আমাদের বলা হয়েছে যে, আমাদের পরিবেশ ও অর্থনীতি এ-দুটোর মধ্য থেকে একটিকে বেছে নিতে হবে—(কিন্তু) আমি মনে করি যে, সুস্থ পরিবেশ ছাড়া সন্তোষজনক অর্থনীতি সম্ভব নয়'—তাঁর এ-ঘোষণাটি পূর্বে প্রণীত জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল শীর্ষক দলিলে যে-কথা বলা হয়েছে, তার প্রতিধ্বনিমাত্র। এ ছাড়াও তাঁর প্রশাসনের নিকট থেকে যতটা প্রত্যাশা করা হয়েছিল তার অনেকটাই অপূর্ণ রয়ে গেছে। কারণ হিসেবে বলা যায়, প্রথমত, প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ব্যক্ত করেন যে, দুষ্প্রাপ্য ও অস্তিত্ব বিপন্ন এরূপ প্রাণিপ্রজাতিকে অন্তর্ভুক্ত করে, এমন চুক্তিতে স্বাক্ষর করার সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সংযুক্ত করে দেবে। যেহেতু এরূপ বিবৃতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীমহলের স্বার্থের সাথে যারা জড়িত, তাদের সাথে আলোচনা করে নির্ধারণ করা হবে, যাতে তাদের পেটেন্ট-বলে লব্ধ একচেটিয়া আধিপত্য বজায় থাকে,[৫৩] তাই এতে আন্তর্জাতিক স্বার্থ কতটুকু রক্ষিত হবে, সে-ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ আছে। দ্বিতীয়ত, প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন যখন ঘোষণা করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঐ-শতাব্দীর শেষ নাগাদ গ্রিন হাউস গ্যাসের ব্যবহার ১৯৯০ সনের পর্যায়ে নামিয়ে আনবে, তখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, আগামী শতাব্দীতে সে এ-ব্যাপারে সহযোগিতা করবে কি না, যেহেতু তিনি ২০০০ সনের পরও এই কমানোর প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখার কোন সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন নি। তৃতীয়ত এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে, বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সংরক্ষণকে নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা দানেরও তিনি অঙ্গীকার করেন নি।

উপসংহার

বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত সমস্যা মোকাবিলার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত রিও সম্মেলনে স্বাক্ষরিত চুক্তি দুটোকে গ্রিন পিস ইন্টারন্যাশনালের (Green Peace International) জেরেমি লিগেট (Jeremy Leggett) '১০,০০০ মিটার দৌড়ের প্রথম পদক্ষেপ'[৫৪] হিসেবে

অভিহিত করেছেন। 'আমাদের অভিন্ন ভবিষ্যৎ' শীর্ষক মুল্যবান দলিলের—যেখানে টেকসই উন্নয়ন ধারণাটি সর্বপ্রথম জনপ্রিয়তা লাভ করে—মূল প্রণেতা, নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী ব্রুনটল্যান্ড রিও ডি জেনিরোতে কয়েক ডজন রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী ও রাজার উপস্থিতিতে এক বক্তৃতায় বলেছেন, 'আমি পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক অঙ্গীকার না দেখতে পাওয়ায় হতাশ।'[৫৫] আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (International Monetary Fund, সংক্ষেপে IMF)-এর নির্বাহী পরিচালক মিশেল ক্যামডেসাস (Michel Camdessus) ধরিত্রী সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে বলেন যে, বিশ্বব্যাংকের হিসাবমতে তৃতীয় বিশ্বে টেকসই উন্নয়নকে নিশ্চিত করতে প্রতি বছর ৭৫ থেকে ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, পূর্বে উন্নয়নশীল দেশে আর্থিক সাহায্যের প্রেষণা ছিল কম্যুনিজমের ভীতি। এখন যেহেতু সেটা দূর হয়েছে, তাই নতুন কারণ খুঁজে বের করতে হবে। তিনি নিজেই এ-ধরনের দুটো প্রেষণার কথা উল্লেখ করেন : পরিবেশ সংরক্ষণ ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। তিনি একটি ইউরোপীয় প্রস্তাব সমর্থনের কথাও উল্লেখ করেন যেখানে জীবাশ্ম-জ্বালানি, বিশেষত তেল ব্যবহারের উপর বিশ্বব্যাপী অধিভার (surcharge) আরোপের কথা বলা হয়েছে।[৫৬]

এভাবে দেখা যায় যে, ধরিত্রী সম্মেলনের সাফল্য নিয়ে অনেক ঢাকঢোল পেটানো হলেও আসলে এ-ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন থেকে প্রত্যাশিত সুফল অর্জিত হয় নি। অবস্থানদৃষ্টে মনে হয় যে, সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিবর্গ বিশ্ব জনমতের সামনে মুখ রক্ষা করতে গিয়ে বাধ্য হয়ে জোড়াতালি দিয়ে দুটো চুক্তি ও অন্যান্য কিছু দলিল প্রণয়ন করেছেন, যেখানে স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব ছিল সুস্পষ্ট। এ-জন্য মূলত দায়ী ছিল পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতিবাচক ভূমিকা। ঐ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট বুশ জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রণীত চুক্তিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে-সব কোম্পানি উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের বিভিন্ন প্রজাতি ব্যবহার করে ঔষধপত্র ও অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত করে, তাদের পেটেন্ট-বলে লব্ধ একচেটিয়া অধিকার ও লাভ লঙ্ঘন করা হবে—এই অজুহাত দেখিয়ে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানান। প্রেসিডেন্ট বুশের এরূপ অবস্থান গ্রহণের ফলে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক স্বার্থের চেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থকে বড় করে দেখার জন্য ধরিত্রী সম্মেলনে সে-দেশটি অনেকটা আন্তর্জাতিক সমাজচ্যুত বলে পরিগণিত হয়। তার ইউরোপীয় মিত্রসহ অনুন্নত দেশসমূহ এই মর্মে সমালোচনামুখর হয়ে ওঠে যে, পরিবেশের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উন্নতি বিধানের প্রচেষ্টাকে ওয়াশিংটন বাধা দিচ্ছে।[৫৭] বস্তুতপক্ষে ধরিত্রী সম্মেলনে যে শুধু উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যেই বিরোধ ধরা পড়েছে তাই নয়, ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার মতানৈক্যও এখানে সকলের চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। এমনকি ইসি-র সভাপতি নিজেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, বিশেষ করে প্রাণিজগতের বৈচিত্র্য সম্পর্কিত চুক্তিটির ব্যাপারে, আপোসবিরোধী মনোভাবের সমালোচনা করেন।[৫৮] সকলের ধারণা যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি কিছুটা উদারতার পরিচয় দিতে পারত, তবে ধরিত্রী সম্মেলনে উত্তর ও দক্ষিণের দেশগুলোর মধ্যে আরও বেশি অর্থপূর্ণ সহযোগিতা অর্জন সম্ভব হত।

Go to Contents
http://thejobstudy.com

http://thejobstudy.com

এ-কথা সর্বজনবিদিত যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুখে যত বড় বড় বুলিই আওড়াক না কেন, সে তার নিজ স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছুই বোঝে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা (A New World Order) প্রতিষ্ঠার রূপরেখা পেশ করতে গিয়েও সমগ্র বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা যাতে যথার্থভাবে রক্ষিত হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় নৈর্ব্যক্তিক শর্তাবলি পূরণের চেয়ে মার্কিন স্বার্থের প্রতিই অধিক জোর দিয়েছেন।[৫৯] এর চেয়েও দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হল যে, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রায় অর্ধশতাব্দীকালব্যাপী বিশ্বের সবচেয়ে সৌভাগ্যশালী দেশ হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দরিদ্র জাতিসমূহের ভাগ্যোন্নয়নে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে নি।

যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬১ সনে প্রথম বৈদেশিক সাহায্য আইন (US Foreign Assistance Act of 1961) প্রণয়ন করে এবং ১৯৭৪ সনে একবার এটি সংশোধন করে, তবু সে আন্তর্জাতিক উন্নয়নে তেমন কোন অবদান রাখতে পারে নি, যে-জন্য আশির দশকের শেষদিকে এর পুনর্মূল্যায়ন ও সংস্কারের জন্য হ্যামিল্টন কমিটিকে[৬০] দায়িত্ব প্রদান করতে হয়। এখানে উল্লেখ্য, জাতিসংঘ শিশু তহবিলের ১৯৯০ সনের বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, 'আশির দশকব্যাপী অধিকাংশ লাতিন আমেরিকান দেশে গড় আয় শতকরা ১০ ভাগ কমে গেছে এবং সাব-সাহারান আফ্রিকায় তা কমে গেছে শতকরা ২০ ভাগেরও বেশি। অনেক শহর এলাকায় দ্রব্যাদির ভিত্তিতে নির্ণীত ন্যূনতম বেতন (real minimum wage) শতকরা ৫০ ভাগের মতো পড়ে গেছে।'[৬১] বিশ্বব্যাংকের এক হিসাবে বলা হয়েছে যে, বিশ্বের ৫.২ বিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে ৯৫০ মিলিয়ন 'তীব্রভাবে অপুষ্টিতে ভুগছে', যাদের সংখ্যা এক দশক পূর্বেকার সংখ্যার দ্বিগুণের বেশি।[৬২] এ-দিকটি বিবেচনা করেই ১৯৯২ সনের মানব উন্নয়ন রিপোর্ট-এ (Human Development Report) আশির দশককে 'হারিয়ে যাওয়া দশক' (Lost Decade) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ, এ-সময় থেকেই অনেক উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরিসমাপ্তি ঘটেছে।[৬৩]

উপরের আলোচনা থেকে যে-রূঢ় সত্যটি বেরিয়ে আসে তা হল, বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত দেশসমূহ দরিদ্র দেশের সমস্যাবলি যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমান বিশ্বের সমস্যাবলি, বিশেষত যেগুলো দ্বারা দরিদ্র দেশসমূহ অধিক আক্রান্ত, দূর করতে আন্তরিকভাবে প্রয়াসী হয়, তবে তাকে সে-ক্ষেত্রে সমগ্র পরিস্থিতি বাস্তব ভিত্তিতে পর্যালোচনা করে অগ্রসর হতে হবে। যেহেতু এটা মার্কিন পণ্ডিত ও গবেষকগণও স্বীকার করে নিয়েছেন যে, দারিদ্র্য দূরীকরণ ছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণের চিন্তাভাবনাও বাতুলতার নামান্তর, তাই তাকে নিজ ও আন্তর্জাতিক স্বার্থ রক্ষার খাতিরে উভয় ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত বিশ্বের বৈদেশিক সাহায্যের ব্যাপারে উদারতার অভাবে গত শতাব্দীর আশির দশক হারিয়ে গিয়ে ইতঃপূর্বেই বিশ্বের অনেকটা ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এর উপর যদি উন্নত বিশ্বের, বিশেষত মার্কিনিদের, অদূরদর্শিতার কারণে ও নিজস্ব হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়াসের ফলে পরিবেশ ধ্বংসের মতো মারাত্মক

সমস্যাকে রোধ না করা যায়, তবে তা হবে সমগ্র মানবজাতির জন্য অপরিসীম ও অপূরণীয় ক্ষতি। এই চরম ক্ষতির হাত থেকে কোন দেশই—তা সে যত শক্তিশালী ও সমৃদ্ধই হোক না কেন—পরিত্রাণ পাবে না। কারণ, প্রকৃতির রোষবহ্নি কোন বিশেষ জাতিকে দয়া দেখাবে না।[৬৪]

পাদটীকা

১. Denis Hayes, 'Earth Day 1990 : Threshold of the Green Decade,' in *World Policy Journal*, Spring 1990, p. 291.
২. *US Global Interests in the 1990s : A New Approach* (Final Report of the Seventy-Fifth American Assembly, November 17-20, 1988) (New York : Arden House, Harriman, n. d.), p. 11.
৩. ঐ পৃ. ১০। ইতোমধ্যেই এ ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক বলে প্রমাণিত হচ্ছে।
৪. এ সকল বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য দেখুন, Dennis Pirages, *Global Technopolitics : the International Politics of Technology and Resources* (Pacific Grove, California : Brooks/Cole Publishing Co., 1989), pp. 128-129.
৫. T. H. Tietenberg, 'The Poverty Connection to Environmental Policy,' in *Challenge*, Septemberr-October, 1990, p. 26.
৬. Donella Meadows et al., *The Limits to Growth* (New York : Universe Books, 1972).
৭. Mihajlo Mesarovic and Eduard Pestel, *Mankind at the Turning Point* (New York : E. P. Dutton & Co. Inc., 1974).
৮. ঐ, পৃ. ১২-১২।
৯. Simon Rottenberg, in *The Economic Growth Controversy*, edited by Andrew Weintraub, Eli Schwartz, and J. Richard Aronson (London : The Macmillan Press Ltd., 1977), pp. 189-90.
১০. ঐ, পৃ. ১৮৯।
১১. W. E. Schiesser, 'TheClub of Rome Model,' in *Ibid.*, p. 227.
১২. Pirages, *op. cit.*, p. 39.
১৩. *Ibid.*
১৪. *Ibid.*, p. 213.
১৫. দেখুন, *The Bangladesh Times*, August 26, 1991.
১৬. Tietenberg, *op. cit.*, p. 26.
১৭. *Ibid.*, p. 28.
১৮. প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল (Winston Churchill) মনে করতেন যে, কোন সমস্যা সমাধানে যত দেরি করা যায় ততই তা সহজসাধ্য হয়। কিন্তু পরিবেশগত সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে ঠিক এর উল্টোটাই অধিক প্রযোজ্য। দেখুন Mesarovic and Pestel, *op. cit.*, p.77.
১৯. থ্রিকিদিসের মন্তব্যটির জন্য দেখুন, *Development and the National Interest : US Economic Assistance into the 21st Century* (a report by the

http://thejobstudy.com

Administrator, Agency for International Development) (Washington, D. C.: Agency for International Development), (Feberuary 17, 1989), p. 119.

২০. James Gustave Speth, 'A Post-Rio Compact,' in *Foreign Policy*, 1992, pp. 145-151.

২১. William E. Halal and Alexander I. Nikitin, 'One World : The Coming Synthesis of a New Capitalism and a New Socialism,' in *The Futurist*, November-December, 1990, pp.8-14.

২২. দেখুন, পাদটীকা নম্বর ১৪।

২৩. Cf : Mahfuz Ullah, in *The Daily Star*, June 3, 1992.

২৪. দেখুন, *The Daily Star*, August 31, 1991.

২৫. Robert Costanza and Laura Cornwell, 'The 4P Approach to Dealing with Scientific Uncertainty,' in *Environment*, Vol. 34, No. 9 (November 1992), p. 16.

২৬. এ. এন. সামসুল হক ও মু. আমীরুজজামান খান (সম্পাদিত), 'মার্কিন সমাজ ও সংস্কৃতি : জাতীয় সেমিনারের কার্যবিবরণী' (বাংলাদেশ সোসাইটি ফর আমেরিকান স্টাডিজ, ১৯৯২), (প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচক হিসেবে মোঃ জাহিদুল হাসানের মন্তব্য), পৃ. ৮২।

২৭. Meadows et al., *The Limits to Growth* (New York : A Potomac Associates Books, Second Edition, 1974), p. 21.

২৮. Peter M. Haas, Marc A. Levy and Edward A. Parson, 'Appraising the Earth Summit', *Environment*, Vol. 34, No. 4 (October 1992), p. 9.

২৯. The World Commission on Environment and Development (Brundtland Commission), *Our Common Future* (Oxford and New York : Oxford University Press, 1987).

৩০. Haas, et al., *op. cit.*, p. 8.

৩১. এ-সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণের জন্য দেখুন, 'Bio-diversity and Forest,' by MNA Katebi, in *The Daily Star*, June 8, 1992.

৩২. *The Daily Star*, June 8, 1992.

৩৩. Haas, et al., *op. cit., p. 26.*

৩৪. *The Daily Star*, June 16, 1992.

৩৫. ঐ।

৩৬. ঐ।

৩৭. ঐ।

৩৮. ঐ।

৩৯. J. Michael Korff-Rodrigues, 'American Studies and Sustainable Development : Thoughts on Democracy and The Environment', (Read in the Conference of the Bangladesh Society for American Studies, Rajshahi, on June 20, 1993) (Mimeo).

৪০. Quoted by Fahmida Aktar, see *The Daily Star*, June 15, 1993.

৪১. দেখুন *The Bangladesh Observer*, October 31, 1992.

৪২. ধরিত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে বিবিসি রেডিও থেকে প্রচারিত সংবাদভাষ্য, ৩ জুন, ১৯৯২।

৪৩. Quoted by Speth, *op. cit.*, p. 146.

৪৪. *American Studies Newsleter*, No. 29 (January 1993), p. 56.

৪৫. Richard S. Lindzen, 'Global Warming : The Origin and Nature of the Alleged Scientific Consensus,' in *Regulation*, Spring, 1992, p. 91.

৪৬. ঐ পৃ. ৯২।

৪৭. Speth, op. cit., p. 147.

৪৮. He declared, 'I must, as President, and will, as a human being, keep in mind the needs of American families to have jobs,' see *The Daily Star*, June 8, 1992.

৪৯. তিনি ইতোমধ্যেই *Earth in the Balance : Ecology and the Human Spirit* নামক একটি পুস্তক প্রণয়ন করেছেন।

৫০. *The Daily Star*, June 15, 1993.

৫১. এতদ্‌সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, Michael Korff-Rodrigues, *op. cit.*

৫২. ঐ।

৫৩. *The Daily Star*, June 15, 1993.

৫৪. *The Daily Star*, June 15, 1992.

৫৫. ঐ।

৫৬. *The Daily Star*, June 9, 1992.

৫৭. *The Daily Star*, June 15, 1993.

৫৮. পূর্বে উল্লিখিত বিবিসি সংবাদভাষ্য।

৫৯. দেখুন, মোঃ আবদুল হালিম, 'প্রেসিডেন্ট বুশ ও একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা,' *রাজনীতি অর্থনীতি জার্নাল*, ২য় সংখ্যা, জুন ১৯৯২, পৃ. ৪২-৬৭।

৬০. *Report of the Task Force on Foreign Assistance to the Committee on Foreign Affairs, US House of Representatives* (popularly known as the *Hamilton Report* (Washington, D.C. : US Government Printing Office, February, 1989).

৬১. Robin Broad, John Cavanagh and Walden Bello, 'Development : The Market is not Enough,' in *Foreign Policy*, No. 81, Winter 1990-91, p. 145.

৬২. ঐ।

৬৩. *The Daily Star, August 31, 1991.*

৬৪. ধরিত্রী সম্মেলনোত্তর বিশ্বের পরিবেশগত বিচার্য বিষয়সমূহে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য দেখুন, মোঃ আবদুল হালিম, *ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস* (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৩), পৃঃ ১০৫-১১১।

http://thejobstudy.com

Job Study
To make you prepared & confident

নবম অধ্যায়

ভূ-রাজনীতি

GEOPOLITICS

ভূ-রাজনীতি সম্পর্কে চিন্তার সূত্রপাত অনেককাল আগে থেকে হলেও রাষ্ট্রীয় পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণ, রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শক্তির সম্পর্ক নিরূপণ এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভূ-রাজনীতির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং এই কারণে বিভিন্ন ভূ-রাজনৈতিক তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। ঐ সময় ভূ-রাজনৈতিক চিন্তাধারার উদ্ভব এবং বিকাশের কারণ কিছুটা শক্তিসাম্য তত্ত্বের প্রতিক্রিয়া হিসেবে, যা তখনকার ইউরোপে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ব্যাখ্যায় ও নিরূপণে প্রধান তত্ত্ব হিসেবে সুপরিচিত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে এবং এশীয় জনগণের, বিশেষত জাপানিদের, পুনর্জাগরণের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই ভূ-রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটে। শক্তিসাম্য তত্ত্ব অনুযায়ী, শান্তি স্থাপন হচ্ছে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত সম্পর্ক এবং এটা সম্ভব হতে পারে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শক্তির সাম্যাবস্থা বজায় রেখে। তখনকার ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ—ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, প্রুশিয়া এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সম্মিলিতভাবে আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনীর মতো ভূমিকা পালন করে, দ্বন্দ্ব নিরসন করে, যুদ্ধকে আঞ্চলিকতায় সীমিত রাখে এবং এককভাবে একটি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের মৈত্রীজোট দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার প্রতি হুমকি প্রতিরোধ করে। সাধারণভাবে বলতে গেলে শক্তিসাম্য তত্ত্ব রক্ষণাশীল (conservative); মূলত শান্তি এবং স্থিতাবস্থা (status quo) বজায় রাখাই ছিল এর প্রধান লক্ষ্য। অন্যদিকে ভূ-রাজনৈতিক তত্ত্ব হচ্ছে গতিশীল (dynamic)। জনগণের জীবনধারণ, সম্পদ আহরণ এবং শক্তি অর্জনের জন্য ভূমির নিশ্চয়তা এবং সে-জন্য সম্প্রসারণ হচ্ছে এর মূল বৈশিষ্ট্য। এ-জন্য ভূ-রাজনৈতিক তত্ত্বে অস্থিতিশীলতার সম্ভাবনা নিহিত থাকে। এতে জাতিকে একত্র সত্তা (collective being), এমনকি জৈবিক সত্তা

Go to Contents
http://thejobstudy.com

(biological entity) হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যাকে অবশ্যই ক্রমবৃদ্ধি ঘটাতে হবে, না হয় পতন হবে (expand or decline)। রাষ্ট্র কখনও এক অবস্থানে স্থির থাকতে পারবে না। ভূ-রাজনৈতিক তত্ত্ব অনুযায়ী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শক্তির সম্পর্কের পরিবর্তন, যে-পরিবর্তন শান্তিপূর্ণ নাও হতে পারে, শুধু স্বাভাবিকই নয়, আকাঙ্ক্ষিত। ভূ-রাজনৈতিক চিন্তা ইউরোপীয় সনাতনী চিন্তাধারায় মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা করে। ছোট আয়তন, কিন্তু বেশি জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশসমূহের কাছে ভূ-রাজনৈতিক তত্ত্বসমূহ খুবই আকর্ষণীয় হিসেবে পরিগণিত হয়। গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে জার্মান ও জাপানিদের মধ্যে ভূ-রাজনৈতিক তত্ত্বসমূহ গভীর প্রভাব বিস্তার করে। যুদ্ধপরবর্তী আন্তর্জাতিক সিস্টেমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় আচরণে ভূ-রাজনৈতিক তত্ত্বসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন অব্যাহত রাখে।

ভূ-রাজনীতি : সংজ্ঞা, উদ্ভব ও বিকাশ

'Geopolitics' শব্দটি জার্মান 'Geopolitik' শব্দটির ইংরেজি রূপ, যা এসেছে দুটো গ্রিক শব্দ থেকে—'Geo' যার অর্থ হচ্ছে ভূ (earth) এবং 'politikos' মানে 'রাষ্ট্রসম্পর্কিত' (pertaining to the state)। সুতরাং দেখা যায় যে, ভূ-রাজনীতি ভূগোল এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান এ-দুটো বিষয়কে সম্পর্কযুক্ত করে। সাধারণভাবে রাজনৈতিক ক্রিয়া (political action), রাজনৈতিক শক্তি (political power) এবং ভৌগোলিক বিন্যাসের (political setting) সম্পর্ক বিশ্লেষণ হচ্ছে ভূ-রাজনীতি। ভৌগোলিক বাস্তবতা এবং রাষ্ট্রের অবস্থা ও কার্যকলাপের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে এবং এই সম্পর্ক জাতীয় নীতি নির্ধারণে লাভজনকভাবে প্রয়োগ করা যায়, যা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রাষ্ট্রীয় সমস্যাবলি সমাধানের চেষ্টায় রাজনৈতিক ভূগোলের দৃষ্টিভঙ্গির সফল প্রয়োগকেই সচরাচর ভূ-রাজনীতি নামে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ ভূ-রাজনীতি হচ্ছে ভূগোল অধ্যয়নের সেই অংশ, যা পররাষ্ট্রনীতি এবং রাজনৈতিক প্রপঞ্চসমূহের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে।

ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতাকে একটি জাতি রাজনৈতিক সুবিধার্থ জাতীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যবহারের প্রয়াস পায়। এ-দিক থেকে ভূ-রাজনীতি হচ্ছে জ্ঞানের ক্ষেত্র এবং রাজনীতির সম্পর্কের সেই শাখা, যা একটি জাতির শক্তির সামর্থ্য নির্ধারণ করে থাকে এবং জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। ভূ-রাজনীতি তত্ত্ব অনুযায়ী এটি একটি ঐতিহাসিক সূত্র যে, জাতিকে অবশ্যই 'ভূমি দখল' করে সম্প্রসারণ করতে হবে, নচেৎ ধ্বংস অনিবার্য। জাতিসমূহের মধ্যে আপেক্ষিক শক্তির বিন্যাস নির্ধারিত হবে বিজিত ভূমির পরিপ্রেক্ষিতে পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে। ফ্রেডরিক রেজেল (Friedrich Ratzel) রাষ্ট্রকে একটি জৈবিক সত্তার (living organism) সাথে তুলনা করেছেন, যাকে অবশ্যই বৃদ্ধি পেতে হবে, না হয় তার ধ্বংস হবে।

http://thejobstudy.com

রাজনীতি এবং ভূগোলের মধ্যে যে-সম্পর্ক রয়েছে এ-ধারণা বেশ পুরনো এবং অনেক চিন্তাবিদের লেখায় তা ফুটে উঠেছে। হেরোডোটাস (Herodotus) নামক এক মহান গ্রিক ভূগোল ও ইতিহাসবিদ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে এক লেখায় পার্সিয়ার মহান সাইরাস (Cyrus the Great)-এর উদ্ধৃতি তুলে ধরে বলেছেন যে, তিনি সুখকর জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এলাকা বিজয়ের জন্য তার লোকদের নেতৃত্ব দিতে দ্বিধাবোধ করতেন, কারণ তাঁর ভয় ছিল সুখকর আবহাওয়া নরম প্রকৃতির লোকের জন্ম দিতে পারে। এ্যারিস্টোটল (Aristotle) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *পলিটিক্স (Politics)*-এ এথেনীয়দের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য আতিকার (Attica) জলবায়ুর জয়গান করেছেন। গ্রিক ভূগোলবিদ স্ট্রাবো (Strabo) প্রথম খৃষ্টাব্দে এক লেখায় লোকের দক্ষতা, প্রথা এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপের সাথে তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের উল্লেখ করেছেন। তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক সময়ের ফ্রান্সের রাজনৈতিক দার্শনিক মন্টেস্কু, (Montesquieu, 1639-1755) ভূগোল এবং আবহাওয়াকে রাজনৈতিক বিকাশের প্রধান নির্ধারক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে ভূ-রাজনীতি উনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রেডরিক লিস্ট (Friedrich List)-এর আগে খুব একটা প্রভাব ফেলে নি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাবেক অধ্যাপক লিস্ট রাজনৈতিক মতদ্বৈধ প্রকাশের জন্য কারাবাস ভোগ করার পর ১৮২৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে জার্মানি ত্যাগ করেন। আমেরিকার বিশাল ভূমি তাঁকে মোহিত করে। লিস্টের মতে, ১৮২৩ সালে ঘোষিত মনরো মতবাদ (Monroe Doctrine) আমেরিকানদের সম্প্রসারণের অসীম সুযোগের সচেতন এবং ব্যাপক চিন্তাসামর্থ্যের বহিঃপ্রকাশ। তুলনামূলক বিচারে লিস্ট দেখলেন, জার্মানি মাত্র কতগুলো স্বায়ত্তশাসিত ও আধা স্বায়ত্তশাসিক রাষ্ট্রের একটি সত্তা, যেখানে জনগণের সমস্যার কোন শেষ নেই। ১৮৪০ সালে লিস্ট তাঁর পুস্তক *The Natural System of Political Economy*-তে লিখলেন যে, যদি জার্মানিকে অর্থনৈতিকভাবে দাঁড়াতে হয়, তাহলে তাকে উত্তর গোলার্ধ ও বাল্টিক সাগর থেকে কৃষ্ণ সাগর ও আড্রিয়াটিক সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এভাবেই লিস্ট যে-ধারণার জন্ম দেন, তা পরবর্তীকালে *Lebensraum* বা 'Living Space' নামে পরিচিত লাভ করে। এই ধারণাই ভূ-রাজনীতি নামক একটি নতুন বিষয় অধ্যয়নের পথ প্রশস্ত করে।

প্রসঙ্গত এখানে ভূ-রাজনীতি (Geopolitics) এবং রাজনৈতিক ভূগোলের (Political Geography) মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন। সুইডিশ ভূগোলবিদ কিয়েলেন (Rudolf Kjellen) সর্বপ্রথম ভূ-রাজনীতি ও রাজনৈতিক ভূগোলের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করেন। এ-দুটির মধ্যে তফাত হচ্ছে মূলত তাদের আলোচনায় ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে জোর প্রদানের কারণে। রাজনৈতিক ভূগোলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ভৌগোলিক প্রপঞ্চগুলো, যাদেরকে সে রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। অর্থাৎ ভৌগোলিক প্রপঞ্চগুলো রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়। অন্যদিকে ভূ-রাজনীতির আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে রাজনৈতিক প্রপঞ্চসমূহ এবং ভূ-রাজনীতি ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলোরই ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে।

রাজনৈতিক ভূগোল সীমান্ত এবং অন্যান্য বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থার বিবরণ দেয়। অন্যদিকে ভূ-রাজনীতি জাতির ভূ-প্রয়োজনীয়তা এবং তা কী উপায়ে মেটানো যায় এতদসম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করে। ভূ-রাজনীতি রাষ্ট্রের গঠন এবং সরকারের নীতিসংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করে থাকে। রাষ্ট্রের সম্পদরাজি এবং শক্তি কীভাবে একটি রাষ্ট্রকে পৃথিবীতে পরাক্রমশালী অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, সে-ব্যাপারে ভূ-রাজনীতি বিশ্লেষণ প্রদান করে। ভূ-রাজনীতি রাষ্ট্রের বাস্তব নীতিসংক্রান্ত বিষয়াদি এবং ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ে পর্যালোচনা করে থাকে। সুতরাং দেখা যায়, রাজনৈতিক ভূগোল বর্ণনামূলক (descriptive), আর ভূ-রাজনীতি ফলিত (applied) ও উপদেশমূলক (prescriptive)।

ভূ-রাজনৈতিক চিন্তা এবং তত্ত্বের বিবর্তন

গত কয়েক শতাব্দী পূর্ব থেকে ইতিহাসবিদগণ ভূগোল এবং সামাজিক-রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে-সম্পর্ক রয়েছে, সে-সম্বন্ধে আলোকপাত করে যাচ্ছেন। জার্মান পণ্ডিত ইমানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant. 1724-1804)-কে তাঁর রাজনীতি ও ভূগোলের মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে চিন্তা ও লেখার অবদানের জন্য আধুনিক ও রাজনৈতিক ভূগোলের জনক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। কার্ল রিটার (Karl Ritter, 1779-1859) প্রথম বলেন যে, পৃথিবীর কিছু অংশ ভৌগোলিক অথবা অন্য কারণে বিশেষ ঐতিহাসিক ভূমিকার জন্য দায়ী। তিনি হচ্ছেন প্রাকৃতিক একক তত্ত্বের প্রবক্তা। মানুষ, রাষ্ট্র এবং পরিবেশের মধ্যে যে একটি ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক রয়েছে, তা তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন।

কয়েকজন ভূ-রাজনীতিক এবং তাঁদের তত্ত্বসমূহ

ফ্রেডরিক রেজেল (Friedrich Ratzel, 1844-1909)

জার্মানির মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের অধ্যাপক রেজেল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শক্তিধর জাতির উত্থানের পেছনে ভৌগোলিক বিধিসমূহ ব্যাখ্যার প্রয়াস পান। তাঁর বিধি এবং তত্ত্বসমূহ রাজনৈতিক ভূগোলকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায়, যেখান থেকে ভূ-রাজনীতি বাস্তবায়িত হতে পারে। রেজেল তাঁর লেখার দার্শনিক ভিত্তি সংগ্রহ করেন অন্য একজন বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক হেগেল (Karl Hegel) থেকে, যিনি এই ধারণা পোষণ করেন যে, রাষ্ট্র হচ্ছে একটি একক জৈবিক সত্তা (individual organism) এবং মানবগোষ্ঠী নিজেদেরকে একমাত্র তার সাথে একত্র করে পরিপূর্ণতা পেতে পারে। রাষ্ট্র কখনও মানবসম্প্রদায়ের মতো নৈতিক বিধিমালা মেনে চলে না, তা সে নিজ নাগরিক হোক বা বিদেশীর ক্ষেত্রেই হোক। রেজেল ব্রিটিশ প্রকৃতিবিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন (Charles Darwin)-এর বিবর্তনবাদী তত্ত্ব দ্বারাও প্রভাবিত হন। ১৮৫৯ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *The Origin of Species*-এ ডারউইন এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন যে, জীবনের উচ্চতর রূপ বিবর্তিত হয়েছে নিম্নতর রূপ থেকে এবং পরিবেশের

http://thejobstudy.com

পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর সামর্থ্যই প্রজাতির টিকে থাকা নিশ্চিত করতে পারে। ডারউইনের মতে, যদিও বিচ্ছিন্নতা (isolation) নতুন প্রজাতির উত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তথাপি দীর্ঘজীবি প্রজাতির উত্থানে এবং ব্যাপক এলাকায় বিস্তৃতির সামর্থ্যের বিচারে বৃহত্তর এলাকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

এভাবে হেগেল ও ডারউইনের মতবাদকে সমন্বিত করে রাষ্ট্র যখন একটি জৈবিক সত্তা হিসেবে চিহ্নিত হল, তখন বিবর্তনবাদী প্রক্রিয়ার নীতিমালাসমূহ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হল এবং রাষ্ট্রকেও জীববিজ্ঞানের অন্যান্য জৈবিক সত্তার, তার পরিবেশের সঙ্গে যে-সম্পর্ক, সেইরূপ সম্পর্কিত অবস্থায় দাঁড় করানো হল। রাজনৈতিক ভূগোলবিদরা যখন রাষ্ট্র একটি জৈবিকসত্তা—এ-ধারণা গ্রহণ করেন, তখন থেকেই জাতীয় জীবনে ভূমি একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বিবেচিত হতে লাগল এবং জনসংখ্যার চাপ ও অন্যান্য সমস্যার সমাধান ও শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের জন্য বিজয়ের মাধ্যমে ভূমির বিস্তার প্রাকৃতিক আইনের স্বাভাবিক প্রকাশ হিসেবে পরিগণিত হল। রেজেল স্বভাবতই এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, যদি একটি রাষ্ট্রকে টিকে থাকতে এবং বিকাশ লাভ করতে হয়, তাহলে তার জীবনধারণের ভূমি (*Lebensraum* or living space) দরকার।

১৮৬৯ সালে রেজেল *The Laws of the Territorial Growth of States* নামে একটি লেখা প্রকাশ করেন। এই লেখায় তিনি জাতিসমূহের বিকাশের বিশ্লেষণ দেন এবং তার জন্য একগুচ্ছ বিধি প্রণয়ন করেন। তাঁর মতে, এইসব বিধি মেনে চলা রাষ্ট্রের বৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক।

জীবসত্তার ক্রমবৃদ্ধির সাথে যেমন তার পারিপার্শ্বিক ভৌতিক পরিবেশ সম্পর্কযুক্ত, একইভাবে রেজেলের মতে, রাষ্ট্রের কাঠামো ও রাষ্ট্রের ক্রমবৃদ্ধির সাথেও ভৌগোলিক বিন্যাস সম্পর্কযুক্ত। তাঁর মতে, রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দ্বন্দ্বের (struggle for existence) আর্ট হচ্ছে ভূমি দখলের জন্য প্রতিযোগিতা (struggle for space) এবং একটি রাষ্ট্রের ক্রমবৃদ্ধি তখনই বন্ধ হবে, যখন তা প্রাকৃতিক সীমায় (natural limit) পৌঁছবে। বাস্তবিকপক্ষে, তাঁর মতে, এই ক্ষুদ্র গ্রহে মাত্র একটি বড় রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি রয়েছে। (There is, on this small planet, sufficient space for only one great state.)[১]

রুডলফ কিয়েলেন (Rudolf Kjellen, 1864-1922)

সুইডিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জার্মান বংশোদ্ভূত রুডলফ কিয়েলেন রেজেলের পরবর্তী প্রখ্যাত ভূ-রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি আধুনিক ভূ-রাজনীতির জনক হিসেবে খ্যাত। কিয়েলেন তাঁর ভূ-রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গিতে একজন জার্মানপন্থী এবং রেজেলের রাষ্ট্রসম্পর্কিত জৈবিক মতবাদের অনুগত ভক্ত। বিশেষত জার্মানদের জীবনধারণের ভূমি তত্ত্বের উপর তিনি সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। রাষ্ট্র একটি জৈবিক সত্তা—কিয়েলেন এই ধারণার সংশোধিত রূপ প্রতিষ্ঠা ও বিশ্লেষণ

Go to Contents
http://thejobstudy.com

করেন। তিনি রেজেলের ধারণাকে এক কদম এগিয়ে নিয়ে বলেন যে, রাষ্ট্র শুধু একটি জৈবিক সত্তা নয়, বরং এটি একটি সচেতন সত্তাও, যার নৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্য রয়েছে। তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতিধারাও জৈবিক তত্ত্বের আলোকে পর্যালোচনার পক্ষপাতী ছিলেন।

রেজেলের সাথে তিনি একমত পোষণ করেন যে, রাষ্ট্রের বিকাশের মূল লক্ষ্য হচ্ছে শক্তি অর্জন। এ-জন্য তিনি তাঁর ভূ-রাজনীতি বিশ্লেষণে রাষ্ট্রের শক্তি অর্জনের উপর সমধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি রেজেলের 'ক্রমবৃদ্ধির বিধিসমূহ' (Laws of Growth) থেকে অনেকটা ধার করে তাঁর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং নতুন ক্ষেত্রের নাম প্রদান করেন Geopolitik। তিনি এ-ধারণা পোষণ করেন যে, শক্তির অন্বেষায় রাষ্ট্রের শুধু ভূমি বিস্তারের সহজ জৈবিক নীতিমালা অবলম্বন করলে চলবে না, এর পরিবর্তে লক্ষ্য অর্জনের জন্য আধুনিক সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য কৌশল অবলম্বন করতে হবে। তিনি পৃথিবীতে কিছু শক্তিধর রাষ্ট্রের উদ্ভবের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, যার মধ্যে জার্মানি হবে ইউরোপ, আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র। তাঁর পুস্তক *The Great Powers* জার্মান ভূ-রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়কদের কাছে স্বীকৃতি বাইবেল হিসেবে পরিগণিত হয়।

আলফ্রেড টি. মাহান (Alfred T. Mahan, 1840-1914)

আমেরিকার নৌ-ইতিহাসবিদ, রণকৌশলবিশারদ ও সাংবাদিক রিয়ার এডমিরাল আলফ্রেড টি. মাহান সমুদ্রশক্তিসম্পর্কিত ভূ-রাজনীতির প্রবক্তা, যিনি ইতিহাসে সমুদ্র শক্তির ভূমিকা বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন। ১৮৯০ সালে প্রকাশিত তাঁর *The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783* শীর্ষক পুস্তক ভূ-রাজনীতির এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে সমুদ্রশক্তি ও তার প্রভাবসংক্রান্ত বিষয়াদির উপর আলোকপাত করে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

অন্যান্য ভূ-রাজনীতিবিদ, যাঁরা একটি জাতির শক্তি বৃদ্ধির জন্য ভূমির উপর জোর প্রদান করেন তাঁদের মতো মাহানও বিশ্বাস করেন যে, একটি জাতি এক জায়গায় স্থির থেকে টিকতে পারে না—তাকে হয় বিকাশ লাভ করতে হবে, না হয় ধ্বংস হয়ে যেতে হবে। কিন্তু তিনি ভূমিমুখীন সহযোগী ভূ-রাজনীতিবিদদের মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করে মনে করেন যে, সমুদ্র হচ্ছে শক্তির গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী একটি জাতির পরাক্রমশালী হওয়ার অন্যতম উপাদান। মাহান তাঁর তত্ত্বে এই মতবাদ তুলে ধরেন যে, সমুদ্রের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা বিশ্বশক্তিরূপে পরিগণিত হওয়ার পূর্বশর্ত। তাঁর মতে, যে-জাতি সমুদ্রের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে, সে-জাতি পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করবে। মাহানের লেখার মূল বিষয় হচ্ছে জাতির ভাগ্যের নিয়ন্তা হচ্ছে সমুদ্রশক্তি। আধুনিক রণকৌশলবিদ্যায় মাহানের তিন ধরনের অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য : প্রথমত, সমুদ্রশক্তির এমন এক দর্শনের তিনি উদ্ভব ঘটান, যা নৌবাহিনী-সংক্রান্ত পরিধির বাইরে স্বীকৃতি এবং গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং

http://thejobstudy.com

পৃথিবীব্যাপী রাষ্ট্রসমূহের দরবারে সমাদৃত হয়; দ্বিতীয়ত, নৌকৌশলবিদ্যাসংক্রান্ত এক নতুন তত্ত্ব তিনি প্রবর্তন করেন; এবং তৃতীয়ত, নৌকৌশলবিদ্যার তিনি এক পর্যালোচক ছিলেন। নৌকর্তৃত্ব লাভ তথা ক্ষমতার শীর্ষারোহণ মাহানের মতে ছয়টি উপাদানের উপর নির্ভরশীল : ভৌগোলিক অবস্থান (geographical position), ভৌতিক গঠন (physical conformation), ভৌগোলিক এলাকার বিস্তৃতি (extent of territory), জনসংখ্যা (population), জাতীয় চরিত্র (national character), এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ (governmental institutions)।

মাহানের তত্ত্ব বাস্তবক্ষেত্রে সাফল্যজনকভাবে প্রয়োগের মুখ্য উদাহরণ হচ্ছে গ্রেট ব্রিটেন, যে-জাতি বাণিজ্য এবং সমুদ্রের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে চরম উন্নতি লাভ করে একদা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর মতে, ব্রিটেনের ভৌগোলিক অবস্থান শক্তির শিখরে আরোহণের জন্য চরম আশীর্বাদ, যা ইউরোপীয় মহাদেশের অন্যান্য রাষ্ট্র ভোগ করতে পারে নি। জাতীয় শক্তির জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ভৌগোলিক উপাদান একটি দেশের কত বর্গমাইল ভূমি রয়েছে তা নয়, বরং সমুদ্রসীমার বিস্তৃতি এবং পোতাশ্রয়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মাহানের মতে, ব্রিটেনের দ্বীপগত বিচ্ছিন্ন বৈশিষ্ট্য তার নৌশক্তি অর্জনের পেছনে সাহায্য করেছে। ভৌগোলিকভাবে এ-শক্তিশালী অবস্থান তার নৌকর্তৃত্ব বজায় রাখতে যথেষ্ট অবদান রাখে, যার সুফল সে নেপোলিয়নিক যুদ্ধের সময় ভোগ করে।

একটি জাতির ভৌগোলিক বিস্তৃতির ব্যাপারে মাহান বলেন, এটি জনসংখ্যা এবং জনগণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সম্পর্কের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের উদ্ধৃতি দিয়ে মাহান মত প্রকাশ করেন যে, 'যদি দক্ষিণের যুদ্ধলিপ্সার মতো বহুসংখ্যক জনগণ এবং তার সমুদ্রশক্তির অন্যান্য সম্পদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি নৌবাহিনী থাকত, তাহলে ব্যাপক বিস্তৃত সমুদ্রসীমা এবং তার অসংখ্য প্রবেশপথ তার সামর্থ্য বাড়িয়ে তুলতে পারত' (Had the South had a people as numerous as it was warlike, and a navy commensurate to its other resources as a sea power, the great extent of its sea-coast and its numerous inlets would have been elements of greater strenght.)[২]।

এখানে মাহান যা বোঝাতে চেয়েছেন, পরবর্তীকালে তা আরও পরিষ্কার করে তিনি বলেন যে, একটি জাতির জনসংখ্যার পরিমাণ সমুদ্রশক্তি হিসেবে বিকাশের জন্য অবশ্যম্ভাবী উপাদান নয়। বরং জনগণের পেশা এর থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মাহান উল্লেখ করেন যে, অন্ততপক্ষে ১৮০০ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের জনসংখ্যা ইংল্যান্ডের থেকে অনেক বেশি ছিল, তথাপি ইংল্যান্ড ফ্রান্সের তুলনায় শক্তিধর নৌশক্তি। এ-জন্য তার জনসংখ্যার মোটা অংশকে সমুদ্রসম্পর্কিত পেশায় নিয়োজিত থাকতে হবে।

পরিশেষে মাহান সমুদ্রশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য জাতীয় চরিত্র, প্রবণতা এবং সরকারি নীতিসমূহের প্রভাব ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, বাণিজ্যের প্রবণতা সমুদ্রশক্তি অর্জনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শান্তিপূর্ণ সময়ে ব্যাপক বাণিজ্য করতে হবে।

ইতিহাস প্রায়শই এই সত্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। স্পেন এবং পর্তুগালের দীর্ঘ সমুদ্রসীমা, ভালো বন্দর এবং সমুদ্রগামী জনগণ ছিল। কিন্তু তাদের জনগণ এবং সরকার শুধু অন্য ভূমির খনিজ সম্পদ আহরণের ব্যাপারে উৎসাহী ছিল। এ-কারণে তাদের কেউই মহান নৌশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় নি। অন্যদিকে ব্রিটিশ এবং ডাচগণ শ্রমের মাধ্যমে সমুদ্রকে ব্যবহার করে শক্তি আহরণ করেছে।

মাহানের মতে, সমুদ্রশক্তি হিসেবে বিকাশের পূর্বশর্ত হিসেবে তাঁর প্রণীত ছয়টি নীতিমালা পরিবর্তনাতীত। এগুলো 'অপরিবর্তনযোগ্য বা অপরিবর্তনীয় বস্তু, সবসময়ই কার্য এবং কারণে, যুগের পর যুগ একই রকম থাকবে। তারা যেন প্রাকৃতিক নিয়মে আবদ্ধ, যেগুলোর স্থায়িত্ব সম্পর্কে আমরা আজকাল অধিক শুনি' (to the unchangeable, or unchanging, order of things, remaining the same, in cause and effect, from age to age. They belong, as it were, to the Order of Nature, of whose stability so much is heard in our day.)[৩]।

মাহান যদিও তাঁর তত্ত্বে সকল জাতির জন্য প্রযোজ্য নৌশক্তিসম্পর্কিত সাধারণ আলোচনা করেন, তথাপি বারবার তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ টানেন। নৌবাণিজ্য এবং অন্যান্য সুবিধার জন্য তিনি শক্তিশালী নৌবাহিনী এবং বহিঃনৌসামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার উপদেশ দেন। তিনি ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক ভূমি অধিকারের বিরাট সুবিধা এবং নৌসামরিক ঘাঁটি স্থাপনের কথা বারবার উল্লেখ করেন। মাহান ব্রিটেনের সাথে সহযোগিতামূলকভাবে তার নৌশক্তিসংক্রান্ত নীতিমালাসমূহ গ্রহণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে উপদেশ দেন। তিনি বিশ্বাস করেন না যে, ব্রিটেন স্থায়ীভাবে সবচেয়ে নৌশক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে টিকে তাকতে পারবে। এ-ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের স্থান দখল করবে। তিনি বিশ্বাস করেন না যে, কোন ইউরোপীয় শক্তি ব্রিটিশ-আমেরিকান নৌশক্তিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে।

মাহানের রচনাসমূহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি প্রণয়নে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। যখন মাহানের লেখাগুলো প্রকাশিত হয়, তখন আমেরিকা শিল্পায়িত হয়েছে, তার বাণিজ্য দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে এবং বিদেশে তাদের বিনিয়োগ ও স্বার্থ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই এ-সব স্বার্থ সংরক্ষণে আমেরিকার শক্তিশালী নৌবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল।

হালফোর্ড জে. ম্যাকাইন্ডার (Sir Halford J. Mackinder, 1861-1947)

হৃদভূমি তত্ত্বের প্রবক্তা ব্রিটেনের প্রখ্যাত পণ্ডিত হালফোর্ড ডে. ম্যাকাইন্ডার জীববিদ্যা, ইতিহাস, আইন এবং ভূগোলে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্সের পরিচালক ছিলেন। ১৯০৪ সালে লণ্ডনের রয়েল জিওগ্রাফিক সোসাইটিতে তিনি 'The Geographical Pivot of History' শিরোনামে তাঁর বিখ্যাত ভাষণদান করেন। তাঁর মতে, ইউরোপীয় ইতিহাস হচ্ছে প্রধানত সম্পূর্ণ স্থলবেষ্টিত ইউরোপীয় ভূখণ্ডের অভ্যন্তরভাগসম্পর্কিত এবং তা হচ্ছে 'কেন্দ্রীয় এলাকা'

http://thejobstudy.com

(pivot area) বা হৃদভূমি (Heartland)। হৃদভূমির জনগণের সাথে রয়েছে সমুদ্রসীমা বা চন্দ্রবলয়ের এলাকার জনগণের দ্বন্দ্ব। এখানে তিনি দুটো বিধির কথা বিশেষভাবে তুলে ধরেন : পৃথিবীকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করা এবং পৃথিবীকে কতগুলো প্রাকৃতিক অঞ্চলের সমষ্টিরূপে বিবেচনা করা। তাঁর বিশ্লেষণে ম্যাকাইণ্ডার 'বৃহত্তর ভৌগোলিক এবং বৃহত্তর ঐতিহাসিক সাধারণ শ্রেণিভুক্তিকরণের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ' (correlation between the larger geographical and the larger historical generalizations) তুলে ধরেন।

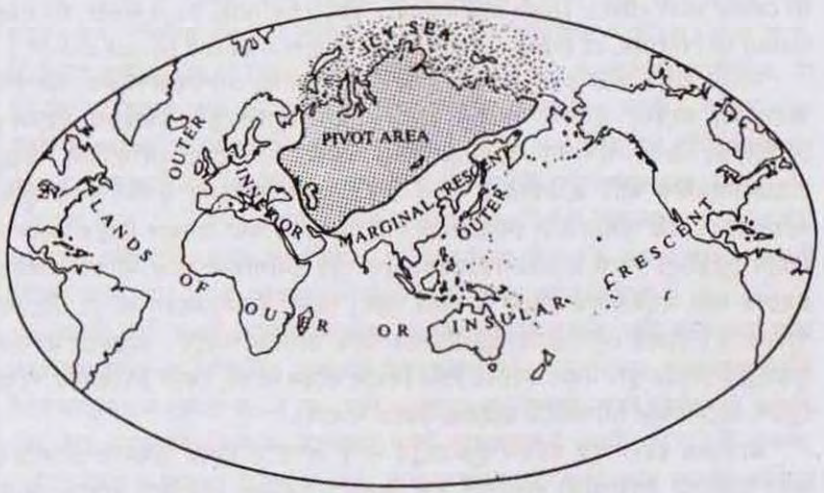

চিত্র : ভূ-রাজনীতিবিদদের দৃষ্টিতে পৃথিবীর মানচিত্র

উৎস : Thomas A. Fitzgerald, Jr., *American Foreign Policy* (New York : Benziger, Inc., 1972). p. 29

ম্যাকাইন্ডার দাবি করেন যে, কতগুলো ভৌগোলিক উপাদান ইতিহাসের অধিকাংশ ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং বিশ্বভূগোলকে তিনি অভিনব মানচিত্র অবয়বে তুলে ধরেন। তাঁর দৃষ্টিতে কেন্দ্রীয় এলাকাটি দুটো চন্দ্রবলয়ন্তর দ্বারা বেষ্টিত। কেন্দ্রীয় এলাকা সম্পূর্ণরূপে মহাদেশীয়। পূর্ব ইউরোপের বিরাট বিস্তৃত এলাকা ও মধ্য এশিয়ার পর্বত বলয়ের উত্তর পার্শ্বে সমগ্র এশিয়া জুড়ে এই কেন্দ্রীয় এলাকা। এই ঐতিহাসিক কেন্দ্রীয় ভূমিকে তিনি হৃদভূমি (Heartland) নামে অভিহিত করেন। একে পরিবেষ্টন করে রয়েছে ইউরোপ, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং চীনের

Go to Contents
http://thejobstudy.com

অধিকাংশ। অভ্যন্তরীণ বা প্রান্তিক চন্দ্রবলয় (Inner/Marginal Crescent)-এই কেন্দ্রীয় এলাকাকে ঘিরে রয়েছে এবং ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার বাকি অংশ জুড়ে এটা গঠিত। প্রান্তিক চন্দ্রবলয় এলাকা প্রকৃতিতে মহাদেশীয় ও মহাসাগরীয় উভয়ই। পৃথিবীর বাকি অংশ বহিঃ বা পৃথক চন্দ্রবলয় (Outer/Insular Crescent) এলাকার ভাগে পড়ে, যা প্রকৃতিতে সম্পূর্ণরূপে মহাসাগরীয়। আমেরিকা মহাদেশদ্বয় এবং অস্ট্রেলিয়া এর অন্তর্ভুক্ত।

ভৌগোলিক অবস্থান, আয়তন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের কারণে হৃদভূমি হচ্ছে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক দুর্গ। নৌশক্তির পক্ষে বিশ্বসমুদ্র থেকে হৃদভূমে আঘাত হানা অসম্ভব বললেই চলে। ম্যাকাইন্ডার মনে করেন যে, একটি জাতি যদি হৃদভূমির উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তাহলে নৌশক্তি দ্বারা তাকে কখনও পরাজিত করা যাবে না। সে-জাতি মহাদেশের মাঝখানে নিরাপদ, নৌবাহিনী সেখানে পৌঁছতে পারবে না; যদি নৌসামর্থ্য খুবই শক্তিশালী হয়, তাহলে সে-জাতি চন্দ্রবলয় এলাকাবেষ্টিত সমুদ্রসীমা এলাকাগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ম্যাকাইন্ডারের সাধারণ পর্যবেক্ষণ তাঁর সময়কার রাজনীতির জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য ছিল।

এভাবে ম্যাকাইন্ডার তাঁর হৃদভূমি তত্ত্বকে নিম্নবিধ বাণীর মাধ্যমে প্রকাশ করেন—

যে পূর্ব ইউরোপ শাসন করে, সে হৃদভূমি নিয়ন্ত্রণ করে,
যে হৃদভূমি শাসন করে, সে বিশ্বদ্বীপ নিয়ন্ত্রণ করে,
যে বিশ্বদ্বীপ শাসন করে, সে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে।
(Who rules East Europe, commands the Heartland;
Who rules the Heartland commands the World Island;
Who rules the World Island commands the World.)

ম্যাকাইন্ডার পূর্ব ইউরোপকে হৃদভূমির প্রবেশদ্বার হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জার্মানি-রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রীর সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। কারণ এর ফলে তারা হৃদভূমি নিয়ন্ত্রণ করবে। তাঁর এই সতর্কবাণী তিন বছরের মধ্যে ব্রিটেনের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। জার্মানির ক্রমবর্ধমান শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য ব্রিটেন ১৯০৭ সালে রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন জার্মানির সঙ্গে শান্তি আলোচনা চলছিল তখন মিত্রশক্তির নেতাদের সুবিধার্থ ম্যাকাইন্ডার তাঁর তত্ত্ব পুনরায় ব্যাখ্যা করেন। ১৯১৯ সালে প্রকাশিত তাঁর পুস্তক *Democratic Ideals and Reality*-তে তিনি লিখলেন, 'ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকার যৌথ মহাদেশ শুধু তত্ত্বগতভাবে নয়, কার্যকরভাবে একটি দ্বীপ। এখন এবং ভবিষ্যতে যাতে আমরা ভুলে না যাই, সেই কারণে এটার নামকরণ করি বিশ্বদ্বীপ' (The joint continent of Europe, Asia and Africa is now effectively, and not merely theoretically, an island. Now and again, lest we forget let us call it the World Island.)।[৪]

http://thejobstudy.com

সম্ভবত ম্যাকাইন্ডারের উপদেশে মনোযোগ দিয়ে মিত্রশক্তি ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে জার্মানি যাতে হৃদভূমির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে না পারে, সে-ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এভাবে জীবনের প্রথম দিকে ম্যাকাইন্ডার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্বস্ত ও একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন; পরবর্তীকালে তিনি রূপান্তরিত হন এ্যাংলো-স্যাকসন (যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র) প্রভুত্বের অকৃত্রিম সমর্থকে, আর জীবনের শেষ প্রান্তে শ্বেত মানবের আধিপত্য সংরক্ষকের পন্থা উদ্ভাবকের ভূমিকায়।

কার্ল হাউজহফার (Karl Haushofer, 1869-1846)

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পুত্র কার্ল হাউজহফার বেভারিয়ার মিউনিখে ১৮৬৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। অত্যাবশ্যক সামরিক অনুশীলনের পর বেভারিয়া আর্মিতে তিনি একজন অফিসার হিসেবে যোগদান করে কর্নেল পদমর্যাদায় উন্নীত হন। ১৯১২ সালে তিনি সামরিকপেশা ত্যাগ করে মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং ভূগোল, ভূতত্ত্ববিদ্যা এবং ইতিহাসে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে হাউজহফার আবার সামরিক বাহিনীতে যোগ দেন এবং একজন জেনারেল ও বিভাগীয় অধিনায়ক হিসেবে চার বছর অতিবাহিত করেন। ১৯১৮ সালে জার্মানি যখন প্রায় পরাজয়ের সম্মুখীন, হাউজহফার বুঝতে পারলেন যে, এ-যুদ্ধ হচ্ছে *Lebensraum*-এর দ্বন্দ্ব। তিনি অনুভব করলেন যে, শীঘ্রই তাঁর দেশের জনগণ এই সত্যটি উপলব্ধি করবে। তাঁর দেশের জনগণের মধ্যে এই সত্য প্রচারের জন্য তিনি লেখনীর মাধ্যমে প্রচেষ্টা শুরু করেন।

যুদ্ধের পর মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন অধ্যাপক হিসেবে হাউজহফার বিভিন্ন ভাষণ এবং সেমিনারে তাঁর এই দৃঢ় বিশ্বাসের কথা তুলে ধরেন যে, জার্মানি যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে জাতীয় নেতাদের বিশ্বরাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার অভাবে। যখন তিনি তাঁর ভূ-রাজনৈতিক ধারণাগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান শুরু করেন, বিশেষত *Lebensraum* এবং অত্যাবশ্যক হৃদভূমি নিয়ন্ত্রণসম্পর্কিত, তখন তিনি জার্মান যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেন, যারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের জন্য খুব বিরূপ হয়েছিল এবং ভার্সাই চুক্তির (Treaty of Versailles, 1919) প্রতিশোধ নেয়ার আশা করছিল। হাউজহফার তাঁর ভূ-রাজনৈতিক ধারণাগুলোর আরও ব্যাপক প্রচারের জন্য ১৯২৪ সালে *Zietschrift fur Geopolitik* নামক একটি ম্যাগাজিন বের করেন এবং মিউনিখে *Institute of Geopolitics* প্রতিষ্ঠা করেন।

হাউজহফারের ভূ-রাজনৈতিক ধারণাগুলো মূলত ধার করা। এ-কথা তিনি স্বীকার করেছেন যে, তিনি রেজেল, ডারউইন, ম্যাকাইন্ডার, মাহান এবং অন্যান্যের কাছ থেকে অনেক সাহায্য নিয়েছেন। তাঁর *Geopolitik* ম্যাকাইন্ডারের হৃদভূমি তত্ত্ব এবং রেজেল ও কিয়েলেনের ভূ ও রাষ্ট্রের জৈবিক সত্তার ধারণা দিয়ে শুরু হয়েছে। হাউজহফারের মূল

অবদান হল জার্মান পণ্ডিতদের ভূ-রাজনীতির প্রতি ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ এবং জার্মান জনগণ ও নেতৃবৃন্দকে জাতীয় উন্নতি ও মাহাত্ম্যের জন্য 'ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত পর্যবেক্ষণের' (geopolitical method of observation) গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে সক্ষম হওয়া।

হাউজহফার তাঁর সহযোগীদের নিয়ে যে ভূ-রাজনীতির অবতারণা করেন, তাকে প্রধান পাঁচটি ধারণায় প্রকাশ করা যায়—

১. সামরিক শক্তি অর্জনের জন্য একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া দরকার।
২. জার্মানি একটি গতিশীল রাষ্ট্র, যে পৃথিবীর পুনঃউদ্দীপ্তকরণের কাজে নিয়োজিত। জার্মানরা একটি প্রভুত্বশালী (master) জাতি, যারা পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে শান্তি এবং উচ্চতম সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করবে। জার্মানি তাই অধিক ভূমির জন্য অধিকারপ্রার্থী এবং দুর্বল রাষ্ট্রগুলো, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য এবং বৃহৎ সচল রাষ্ট্রগুলো তা অবশ্যই মেনে নেবে।
৩. যে-সমস্ত এলাকা, ভাষা এবং জাতি অর্থনৈতিকভাবে জার্মান স্বার্থের জন্য উপযোগী, সে-সমস্ত এলাকা জার্মানির শাসনাধীনে আসবে।
৪. পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ আফ্রো-এশিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে জার্মানি অজেয় অর্থনৈতিক এবং সামরিক অবস্থানে পৌঁছে যাবে, যেখান থেকে সে পৃথিবীব্যাপী কর্তৃত্ব করবে।
৫. সীমান্ত অস্থায়ী ব্যাপার যা জার্মান স্বার্থে পরিবর্তিত হবে এবং এটা যুদ্ধ শুরু করার জন্য খুবই উপযোগী।[৫]

হাউজহফার তাঁর ভূ-রাজনৈতিক ধারণাগুলোর মাধ্যমে নাৎসি শাসনের শক্তির বিচার-বিবেচনা ও পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেন এবং নাৎসি নেতৃত্বকে এভাবে ভূ-রাজনৈতিক নীতিমালাগুলোর বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে সম্প্রসারণবাদী আকাঙ্ক্ষা কার্যকর করতে প্রেরণা জোগান। তিনি হচ্ছেন এক নতুন জার্মান ব্যবস্থার মূল প্রবক্তা, যেখানে তিনি রাশিয়া এবং জাপানের সঙ্গে জার্মানির মৈত্রীর সুপারিশ করেন।

হাউজহফার জোর দিয়ে বলেন যে, যেহেতু জার্মানদের পর্যাপ্ত ভূমি নেই, তাই অন্যের ভূমি দখল করার অধিকার তাদের রয়েছে, বিশেষত যাদের উন্নতির সামর্থ্য নেই। প্রয়োজনবোধে অধম জাতিগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে তাদের জায়গা জার্মানির দখলে আনতে হবে। তিনি পূর্ব ইউরোপ, ফিনল্যান্ড, সুইডেন ও বাল্টিক রাষ্ট্রগুলো দখলের সুপারিশ করেন। এভাবে তিনি হিটলারের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হন এবং জার্মান সম্প্রসারণবাদের নীলনকশা প্রণয়ন করে এর মূল ভিত্তি রচনা করতে সহায়তা করেন।

http://thejobstudy.com

নিকোলাস জে. স্পাইকম্যান (Nicholas J. Spykman, 1893-1943)

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক নিকোলাস জে. স্পাইকম্যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রখ্যাত ভূ-রাজনীতিবিদ। ভূ-রাজনীতির উপর লিখিত তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত পুস্তক *The Geography of Peace*-এ তিনি ম্যাকাইন্ডারের হৃদভূমি তত্ত্বের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। স্পাইকম্যান ভূ-রাজনীতিতে 'ভৌগোলিক উপাদানের ভিত্তিতে একটা দেশের নিরাপত্তা নীতির পরিকল্পনা' (The planning of the security policy of a country in terms of its geographic factor)[৬] বলে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, একটা দেশের অবস্থান ঐ দেশের পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তিনি শক্তিকে শান্তিরক্ষার অন্যতম উপায় হিসেবে স্বীকার করে বলেন যে, শুধু বৃহৎ শক্তিগুলোর শান্তি সংরক্ষণ বা কার্যকর করার ক্ষমতা রয়েছে।

স্পাইকম্যান ম্যাকাইন্ডারকে খুবই নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর পুস্তকে ম্যাকাইন্ডার বর্ণিত হৃদভূমি এলাকা অন্তত নিকট ভবিষ্যতে বিশ্বশক্তির কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হতে পারবে কি না সে-ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি জলবায়ু এবং কৃষি উপাদানের সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেন; শক্তির অপরিমিত বণ্টন এবং উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তের ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা এ-সবকিছুই ম্যাকাইন্ডারের তত্ত্বের বিপক্ষে যুক্তি তুলে ধরে।

স্পাইকম্যান ম্যাকাইন্ডারের দৃষ্টিভঙ্গিকে মূল্যবান বিশ্লেষণী কাঠামো (analytical framework) বলে গ্রহণ করেন, কিন্তু দাবি করেন যে, যদি আমরা সাম্প্রতিক ইতিহাস এবং রণনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখব যে, ম্যাকাইন্ডারেরর অভ্যন্তরীণ বা প্রান্তিক চন্দ্রবলয় এলাকা হৃদভূমি এলাকার তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। স্পাইকম্যান এ-এলাকার নতুন নামকরণ করেন 'রিমল্যান্ড' (Rimland), যা মোটামুটিভাবে ম্যাকাইন্ডারের অভ্যন্তরীণ বা প্রান্তিক চন্দ্রবলয় এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করে। ম্যাকাইন্ডারের চেয়ে কিছুটা অধিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে স্পাইকম্যান দেখান যে, 'সাধারণভাবে স্থলশক্তি ও নৌশক্তির বিরোধিতা কোনকালে ছিল না। ঐতিহাসিক মৈত্রী সবসময় ছিল রাশিয়ার অভ্যন্তরস্থ রিমল্যান্ডের কিছু সদস্যের মধ্যে, অথবা রিমল্যান্ডের কোন প্রভাবশালী শক্তির বিরুদ্ধে যুক্তরাজ্য ও রাশিয়ার' (there has never really been a simple land power-sea power opposition. The historical alignment has always been in terms of some members of the Rimland within Russia; or Great Britain and Russia together against a dominating Rimland power.)[৭]। রাশিয়া, রিমল্যান্ড দেশসমূহ এবং সমুদ্র দেশসমূহের মধ্যে রাজনৈতিক মিলন হওয়া সত্ত্বেও স্পাইকম্যান দেখতে পান যে, রাশিয়া এবং সমুদ্রতীরবর্তী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্বের মৌলিক বিষয় হল কে রিমল্যান্ড রাষ্ট্রগুলো নিয়ন্ত্রণ করবে তা নিয়ে।

Go to Contents
http://thejobstudy.com

স্পাইকম্যান ম্যাকাইন্ডারের হৃদভূমি তত্ত্বের সমালোচনা করে বলেন যে, ম্যাকাইন্ডার হৃদভূমির গুরুত্বকে অতিরঞ্জিত করেছেন এবং অভ্যন্তরীণ/প্রান্তিক বলয়কে অবহেলা করেছেন। একেই তিনি রিমল্যান্ড নামে অভিহিত করেন যা 'মধ্যবর্তী এক অঞ্চল ... যা হৃদভূমি এবং প্রান্তিক সমুদ্রের মাঝে ... নৌশক্তি এবং স্থলশক্তির মধ্যবর্তী দ্বান্দ্বিক এলাকার এক বিরাট সংঘর্ষ নিবারক" (intermediate region ... between the Heartland and the marginal seas ... a vast buffer zone of conflict between sea power and land power.)[৮]। তিনি ঘোষণা করেন যে, ম্যাকাইন্ডারের উক্তি ভুল ছিল। তাঁর মতে, এটা বরং হওয়া উচিত ছিল—

'যে রিমল্যান্ড নিয়ন্ত্রণ করে সে ইউরেশিয়া শাসন করে,
যে ইউরেশিয়া শাসন করে, বিশ্বের ভাগ্য সে নিয়ন্ত্রণ করে'
(Who controls the Rimland rules Eurasia;
Who rules Eurasia controls the destinies of the World.)

স্পাইকম্যান প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বৈদেশিক এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির নীতিমালা নিয়ে ভূ-রাজনীতির ব্যাখ্যার অবতারণা করেন। তাঁর মতে, রিমল্যান্ড রাষ্ট্রগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি বিরোধী কেউ রিমল্যান্ডের কোন এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে, তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে, কারণ সেখান থেকে বিরোধী শক্তি নতুন পৃথিবীর উপর বেষ্টনী প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হবে। এই পরিপেক্ষিতে তিনি মত প্রকাশ করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত ব্রিটেনের সাথে সহযোগিতা করা।

স্পাইকম্যান তাঁর তত্ত্বে সমুদ্র বা ভূমি কোনটির উপর বেশি জোর দেননি, এমনকি তিনি আমেরিকার কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য ওকালতিও করেননি, বরং বিশ্বশান্তির জন্য তিনি শক্তিসাম্যের কথা বলেছেন। আমেরিকার নিরাপত্তার জন্য তিনি রিমল্যান্ডের রাষ্ট্রগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে বলেছেন বা কমপক্ষে রিমল্যান্ডের উপর সোভিয়েত কর্তৃত্ব যাতে প্রতিষ্ঠিত না হয়, সে-ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা কর্তৃক অনুসৃত ধারক নীতিতে (policy of containment) স্পাইকম্যানের প্রভাব রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে ভূ-রাজনীতি

নাৎসিরাই ভূ-রাজনীতির দুর্নাম বয়ে এনেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ভূ-রাজনীতিকে সামরিক শক্তি এবং আগ্রাসনের সাথে সমরূপে দেখার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। দুর্নাম সত্ত্বেও ভূ-রাজনৈতিক ধারণাগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালেও সিদ্ধান্ত প্রণেতাদের প্রভাবিত করতে থাকে। ভূ-রাজনৈতিক এবং শক্তিসাম্য তত্ত্বগুলোর প্রভাব বৃহৎ শক্তিগুলোর পররাষ্ট্রনীতিতে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে সোভিয়েত ইউনিয়ন হৃদভূমির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং পশ্চিম সীমান্তের রাষ্ট্রগুলোতে কম্যুনিস্ট শাসন চাপিয়ে দিয়ে এগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ

http://thejobstudy.com

কায়েম করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকে তুরস্ক পর্যন্ত ধারক চন্দ্রবলয় (Crescent of Containment) কার্যকর করতে এগিয়ে আসে। উত্তর আটলান্টিক চুক্তির (North Atlantic Treaty Organisation, সংক্ষেপে NATO) সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে একে অন্যকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়।

হৃদভূমি সীমানায় সোভিয়েত পদক্ষেপ, সোভিয়েত দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে প্রতিরক্ষামূলক, যা তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেবে। ১৮১২ সালে নেপোলিয়ন এবং ১৯৪১ সালে হিটলারের রাশিয়া আক্রমণের ইতিহাস থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের মনে এ-ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ধ্যানধারণা জন্ম নিয়েছে। অন্যদিকে ন্যাটো সদস্যভুক্ত দেশগুলো এ-সংগঠনকে তাদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপকে আগ্রাসী বলে বিবেচনা করে। অন্যদিকে ন্যাটোর ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের মনোভাবও অনুরূপ।

চীন পূর্বদিকের চন্দ্রবলয় এলাকায় অবস্থিত। ১৯৪৯ সালে কম্যুনিস্টরা ক্ষমতায় আসার পর দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকে চীনের সম্প্রসারণবাদী প্রবণতা দেখা যায়। তিব্বতকে ইতোমধ্যে চীন নিয়ন্ত্রণে এনেছে। চীনের এই সম্প্রসারণ ঠেকানোর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা (South East Asia Treaty Organisation, সংক্ষেপে SEATO) প্রতিষ্ঠিত হয়। কোন একটি দেশ যদি কম্যুনিস্টদের করতলগত হয়, তবে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহেরও তাদের খপ্পরে পড়তে হবে এতদ্বিষয়ে প্রণীত ডমিনো তত্ত্ব (Domino Theory) নামে এক ধারণা জন্মলাভ করে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম যুদ্ধে অংশগ্রহণ চীনের হাত থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্য রাষ্ট্রগুলোকে বাঁচানোর চেষ্টা হিসেবে দেখা হয়। রাশিয়া এবং চীনের মধ্যকার নতুনভাবে শুরু হওয়া দ্বন্দ্বও ভূ-রাজনৈতিক মূল্যায়নের গুরুত্বের প্রমাণ বহন করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আফ্রিকা এবং অন্যান্য অঞ্চলে বহু নতুন রাষ্ট্রের আবির্ভাবের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই বিশ্ব দ্বীপের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করে দেয়। তাদের মধ্যকার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকেও ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান, সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন ও দ্বিমেরু বিশ্ব সিস্টেমের অবলুপ্তির পর আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বর্তমানে রুশ-মার্কিন ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের প্যারাডাইম আর কার্যকর নয়। তবে এ-কথা সত্যি, ভূ-রাজনৈতিক গণনা এখনও রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তরাধিকারী রাষ্ট্র রাশিয়াসহ বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা মার্কিনিদের ভূ-রাজনৈতিক চিন্তাভাবনারই বহিঃপ্রকাশ। তা ছাড়া প্রান্তিক চন্দ্রবলয়ে চীন ও ভারতের বৃহৎ শক্তি হিসেবে উত্থান এবং ইউরোপীয় সংহতি প্রভৃতি নতুন ভূ-রাজনৈতিক যুগের সূচনা

করতে পারে। জাপানও তার প্রচণ্ড অর্থনৈতিক শক্তি নিয়ে পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। ইতোমধ্যেই জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের উনপঞ্চাশতম বার্ষিক অধিবেশনে ভাষণদানকালে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ লাভের ব্যাপারে জাপানের আকাঙ্ক্ষার কথা সরকারিভাবে ঘোষণা করেছেন।

পাদটীকা

১. Thomas A. Fitzgerald; Jr., *American Foreign Policy* (New York : Bengizer, Inc., 1972), p. 20.
২. *Ibid.*, p. 23.
৩. *Ibid.*, p. 26.
৪. *Ibid.*, p. 30.
৫. Norman D. Palmer and Howard C. Perkins, *International Relations : The World Community in Transition* (Calcutta : Scientific Book Agency, 1969), p. 43.
৬. T. V. Kalijarvi, *Modern World Politics* (New York : Crowell, 1942).
৭. Norman J. G. Pounds, *Political Geography* (New York : McGraw-Hill, 1972).
৮. Palmer and Perkins, *op. cit.*, p. 43.

Job Study
To make you prepared & confident

দশম অধ্যায়

তত্ত্ব
THEORY

তত্ত্ব বলতে সাধারণভাবে আমরা বুঝি কিছুসংখ্যক যুক্তিসিদ্ধ উক্তি, যেগুলো হয় অবরোহ পদ্ধতিতে কতগুলো বিমূর্ত, সাধারণ স্বতঃসিদ্ধ অথবা সত্য বলে ধরে নেয়া হয়েছে, এমন বস্তু থেকে গ্রহণ করা হয়েছে অথবা আরোহ পদ্ধতিতে বাস্তব ঘটনা অথবা উপাত্ত থেকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, যার মধ্যে বিধিসংগত বাক্যও থাকতে পারে, কমপক্ষে যার কিছুসংখ্যক পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় (A theory is a set of logically connected statements, either deductively derived from abstract, general axioms or assumptions or inductively formulated from facts or data, including law-like assumptions and statements, at least part of which is capable of empirical test.)। শ্রাগ (Clarence Schrag)-এর মতে, 'যে-কোন তত্ত্বের মধ্যে ব্যাপকভাবে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত যুক্তিসিদ্ধ উক্তি থাকবে। এর প্রথমটি তত্ত্বের ধারণাগুলো বর্ণনা করবে। দ্বিতীয়টি বর্ণিত ধারণাগুলোর মধ্যকার সম্পর্ককে প্রকাশ করবে। তৃতীয়টি ধারণাগুলোকে পর্যবেক্ষণে সক্ষম এমন বস্তুসমূহের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে তত্ত্বের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ব্যাখ্যাদানে সহায়ক হবে' (Any given theory is comprised largely of three different but closely related sets of statement. One set defines the concepts of the theory. A second expresses prescribed relationships among the defined concepts. The third provides an empirical interpretation of the theory by relating some of the concepts to observable phenomena.)[১] জেমস ক্যাপোরাসোও (James Caporaso) মোটামুটিভাবে একই মত পোষণ করেন। তিনি

Go to Contents
http://thejobstudy.com

বলেন যে, 'কোন তত্ত্বের মধ্যে কমপক্ষে থাকবে (১) কতগুলো ধারণা (২) এ-ধারণাগুলোর মধ্যকার পরস্পর সম্পর্ক ও (৩) কমবেশি কতগুলো পদ্ধতিগত অভিজ্ঞতার আলোকে পর্যবেক্ষণাবলি যা উক্ত সম্বন্ধাবলির যথার্থতা পরীক্ষা করতে পারে' (Stated in minimal terms, a theory involves (1) a set of concepts (2) relationship among these concepts and (3) some more or less systematic empirical observations to 'test' the validity of these relationships.)[২]।

যদি আমরা কোন সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে (scientific theory) বিশ্লেষণ করি, তবে আমরা এর বিভিন্ন উপাদানগুলোকে নিম্নরূপে দেখতে পাব। প্রথমত, অবরোহী তত্ত্বে স্বতঃসিদ্ধ ও প্রতিজ্ঞা অবশ্যই থাকবে। স্বতঃসিদ্ধ হল এমন কতগুলো উক্তি যেগুলোকে সত্য বলে ধরে নেয়া হয় (A deductive theory must contain both axioms and theorems. Axioms are propositions that are assumed to be true.)[৩]। গর্ডন হিল্টন (Gordon Hilton) বলেছেন যে, 'কোন স্বতঃসিদ্ধ হল গাণিতিক ব্যবস্থায় একটি প্রারম্ভিক উক্তি, যা ঐ ব্যবস্থায় প্রমাণিত নয়, কিন্তু সত্য বলে ধরে নেয়া হয়' (An axiom is an initial proposition in a mathematical system not proved in that system and assumed 'true'.)[৪]। তত্ত্ব নির্মাণে স্বতঃসিদ্ধগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটা তত্ত্ব নির্মাণের আদি ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। গবেষণার ব্যাপারে তাত্ত্বিকদের কোন এক স্থান থেকে কাজ আরম্ভ করতে হয় এবং স্বতঃসিদ্ধগুলো সে-ব্যাপারে নোঙর স্বরূপ। স্বতঃসিদ্ধের মাধ্যমে তত্ত্ব উন্নয়নের মূল ভিত্তি রচিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সিস্টেম তত্ত্ব (systems theory) উন্নয়নের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সিস্টেম (the international system) যে আছে—এ-স্বতঃসিদ্ধটি মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। স্বতঃসিদ্ধের প্রধান কাজ প্রতিজ্ঞা উৎপাদনে সহায়তা করা।

যে-কোন তত্ত্বের দ্বিতীয় উপাদান হল প্রতিজ্ঞা (theorem)। সাধারণত স্বতঃসিদ্ধ থেকে অবরোহপদ্ধতিতে অথবা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে প্রতিজ্ঞা পাওয়া যায়। প্রতিজ্ঞার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে হিল্টন বলেছেন যে, 'এটা গাণিতিক পদ্ধতিতে কোন অনুমিত উক্তি, যাকে স্বতঃসিদ্ধের মতো 'সত্য' হিসেবে গণ্য করা যায়' (A theorem is a deduced proposition in a mathematical system, as 'true' as the axiom.)[5]। এখন উক্তি সম্পর্কে মাইকেল হ্যাস (Micheal Haas)-এর সাথে একমত হয়ে আমরা বলতে পারি, 'উক্তির মধ্যে নিহিত থাকে দুই বা ততোধিক ধারণা এবং সেই সাথে ধারণাগুলোর মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ বলে গৃহীত সম্বন্ধ' (*a proposition* contains two or more concepts together with a postulated linkage between the concepts.)৬।

তৃতীয়ত, আমাদের জানা দরকার 'ধারণা' (concept) কী। আমরা ইতঃপূর্বেই দেখেছি যে, তত্ত্ব হল কতগুলো ধারণার সমষ্টি যখন সেগুলোর মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট

http://thejobstudy.com

সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে। এখন ধারণা সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, এটা আমাদের পক্ষে বোঝা যত সহজ, এর বর্ণনা তত সহজ নয়। বিভিন্ন পণ্ডিত ধারণার বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন কিন্তু এর ভেতর কোনটিই খুব বেশি পরিষ্কাররূপে বোধগম্য নয়। মাইকেল হ্যাস বলেছেন যে, 'ধারণা হল বাস্তব জগতের দৃশ্যমান বস্তুকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করার জন্য গৃহীত শ্রেণীবিভাগ' (A concept is a category for characterising phenomena in the real world.)[৭]। যেহেতু ধারণার মাধ্যমে বাস্তব জগতে দৃশ্যমান বস্তুকে বোঝানো হয়ে থাকে, সেহেতু এর পরিমাপ (measurement) করা দরকার। পরিমাপের জন্য সাধারণত কতগুলো নির্দেশক (indicators) থাকে, যেগুলোর মাধ্যমে প্রত্যেক ধারণাকে দৃশ্যমান বস্তু দিয়ে প্রতীকরূপে বর্ণনা করা হয় এবং নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক নির্দেশকের জন্য সংখ্যাবাচক শব্দ স্থির করা হয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি যে, কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারণাটিকে আমরা মাথাপিছু জাতীয় আয় (GNP per capita) দ্বারা পরিমাপ করতে পারি।

তত্ত্ব উন্নয়নের ব্যাপারে ধারণার গুরুত্ব এবং এ-দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক ভালোভাবে বোঝার জন্য আমরা বর্তমানে বহুল আলোচিত পরনির্ভরশীলতার তত্ত্ব (dependency theory) সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করতে পারি। এখানে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ (ecnomic imperialism) ব্যাখ্যা করার জন্য তিনটি ধারণাকে ব্যবহার করা হয়েছে। এ-ধারণাগুলো হল অসমতা (inequality), পরনির্ভরশীলতা (dependence) ও শোষণ (exploitation)। যদি দুই দেশের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনাকালে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে এ-তিনটি ধারণা বিদ্যমান, তবে আমরা মনে করতে পারি যে, পরনির্ভরশীল দেশটি যে-দেশটির উপর নির্ভর করে, তার সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের শিকার। আমরা এ-তিনটি ধারণা পরিমাপ করতে পারি[৮] এবং এভাবে যে-সংখ্যাবাচক শব্দগুলো পাব, তাদের গুণফলই নির্দেশ করবে পরনির্ভরশীলতার তত্ত্ব অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদের গভীরতা।

চতুর্থত, তত্ত্বনির্মাণকালে আমরা অনেক সময় মডেলের (model) সাহায্য নিই। মডেল বলতে সাধারণত বোঝায় 'ত্রিমাত্রিক অবিকল প্রতিরূপ" (A model is a *three-dimensional replica.*)[৯]। এ-ব্যাপারে দুটি শর্ত পূরণ হওয়া দরকার। প্রথমত, প্রধান জিনিসটির উপাদানগুলো ও মডেলের উপাদানগুলোর মধ্যে সব ব্যাপারে সামঞ্জস্য থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রধান জিনিসটি যে-নিয়ম অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করবে, মডেলটিকেও সে-নিয়মে কার্য সম্পাদন করতে হবে। তত্ত্ব উন্নয়নের ব্যাপারে মডেলের ব্যবহার সম্পর্কে বলা যায় যে, প্রাথমিক অবস্থায় একটি মডেলকে সামনে রেখে একজন তাত্ত্বিক তা থেকে তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন উক্তি আহরণ করতে পারেন। এ-ব্যাপারে ওরান ইয়াং (Oran Young) যথার্থই বলেছেন যে, 'কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উক্তিগুলো সেই মডেল থেকে যুক্তিসিদ্ধ সত্য হিসেবে অবশ্যই নিতে হবে, যে মডেলের উপর ভিত্তি করে তত্ত্ব গড়ে ওঠে' (The theorems of a scientific theory must be derivable as logical truths from the model upon which the

theory is based.)[১০]। উদাহরণস্বরূপ আমরা গালটুং (Johan Galtung)-এর আক্রমণের স্টেটাস তত্ত্বের (status theory of aggression) উপর নিচে দেয়া দুটি মডেলের উল্লেখ করতে পারি।

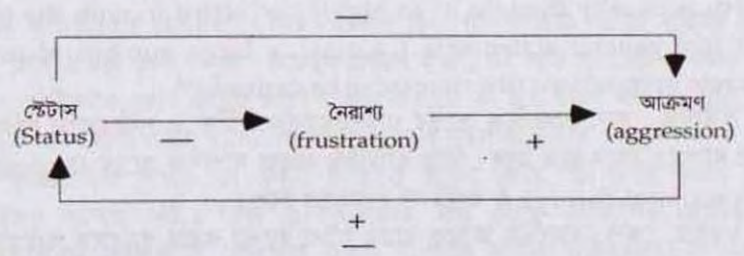

মডেল থেকে বিভিন্ন প্রকল্প (hypothesis) গ্রহণ করা হয় এবং সেগুলোকে উপাত্তের (data) সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা হয়। যদি পরীক্ষার পর দেখা যায় যে, প্রকল্পগুলো সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যভাবে সঠিক, তবে সেটিই তত্ত্ব হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

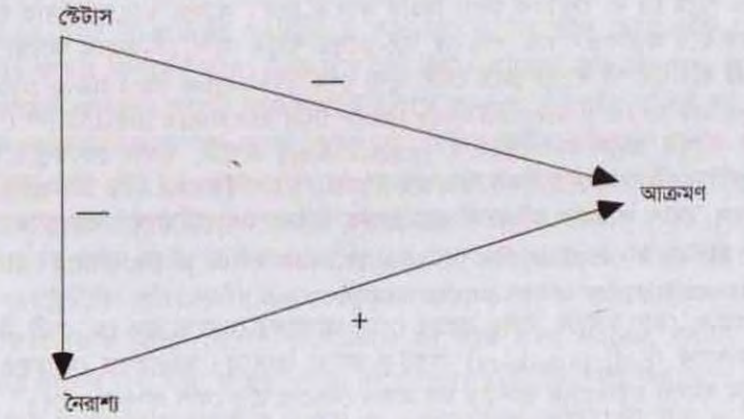

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, কোন প্রকল্প দুই বা ততোধিক চলকের (variables) সমবায়ে গঠিত এবং এখানে দেখানো হয়ে থাকে এ-চলকগুলোর মধ্যে সম্পর্ক কী অর্থাৎ এগুলো কোন্ ব্যাপারে কী ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম।

এখন আমাদের দেখা দরকার একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে আমরা কীভাবে মূল্যায়ন করব। প্রথমত, কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রতিজ্ঞাগুলো অথবা তত্ত্বগত উক্তিগুলো যুক্তিসঙ্গতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ (logically consistent) হওয়া দরকার। কার্ল পপার (Karl Popper) যথার্থই বলেছেন যে, "উক্তিগুলোর মধ্যে অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি অথবা পুনরুক্তিপূর্ণ প্রতিজ্ঞা গ্রহণযোগ্য নয়' (Internal contradictions in statements or tautologous propositions are not acceptable.)[১১]।

http://thejobstudy.com

দ্বিতীয়ত, যে-কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে অবরোহী দিক থেকে উর্বর হতে হবে। ক্যাপোরাসোর, মতো, 'কোন তত্ত্বকে তখনই উচ্চ অবরোহীসম্পন্ন মনে করা হবে যখন মাত্র অল্প কয়েকটি স্বতঃসিদ্ধের মাধ্যমে অনেকগুলো প্রতিজ্ঞা আহরণ করা সম্ভব' (A theory is usually thought of as highly deductive if, with the help of a few general statements (axioms), a large number of more concrete propositions (theorems) can be derived.)[১২]।

তৃতীয়ত, কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ধারণাগুলোকে সঠিক ও পর্যাপ্তভাবে পরিমাপ করার ব্যাপারে সক্ষম হতে হবে। কিন্তু যুক্তিসিদ্ধ অথবা দার্শনিক তত্ত্বের (logical or philosophical theory) এ-গুণটি না থাকলেও চলে।

চতুর্থত, কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে বাস্তব ঘটনা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে পর্যাপ্তভাবে সক্ষম হতে হবে। ক্যাপোরাসো যথার্থই বলেছেন যে, 'আমাদেরকে দেখতে হবে যে, তত্ত্ব বাস্তব ঘটনার সাথে খাপ খায় কি না অথবা পর্যবেক্ষণের কারণ দর্শাতে পারে কি না' (Whether the theory fits the facts or accounts for the observations.)[১৩]।

পঞ্চমত, যে-কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে তার পরিধি অর্থাৎ অধিকাংশ ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারে কি না সে-দিক দিয়ে বিচার করতে হবে। আমরা ক্যাপোরাসোর সাথে একমত হয়ে আবারও বলতে পারি যে, 'যে-তত্ত্বের পরিধি বেশি, সে-তত্ত্বকে আমরা স্বল্প পরিসর পরিধিবিশিষ্ট তত্ত্বের চেয়ে বেশি মূল্য দেব' (Theories that have broad scope are to be preferred over those that are more limited.)[১৪]। এর সাথে সাথেই আসে মিতব্যয়িতার (parsimony) প্রশ্নটি, অর্থাৎ যে-তত্ত্বটি যত মিতব্যয়ী, সেটি আমাদের নিকট তত গ্রহণযোগ্য। ওরান ইয়ংয়ের মতে মিতব্যায়িতার অর্থ হল 'বেশি পরিমাণ ঘটনাকে অল্পসংখ্যক উক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা' (The ability to explain the maximum number of phenomena with a minimum number of assumptions or premises.)[১৫]।

ষষ্ঠত, কোন তত্ত্বকে বিচার করতে গেলে আমাদের দেখতে হবে যে, সেটি নীতি নির্ধারকদের (policy-makers) কতটুকু কাজে আসবে। সাধারণত যে-তত্ত্বগুলো বর্তমান সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে যত সক্ষম সেগুলো তত বেশি প্রাধান্য পাবে।

সপ্তমত, কোন তত্ত্ব যদি এমন কোন দিকনির্দেশ দিতে পারে, যা অন্যথায় কারও মনে আসত না, তবে সে-তত্ত্ব তত বেশি জনপ্রিয় হবে।

পরিশেষে, একটি ব্যাপার আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তাত্ত্বিক যদি এমন কোন আভাস না দেন যে, তাঁর তত্ত্বকে কীভাবে খণ্ডন করা যাবে, তবে সে-তত্ত্ব খুব বেশি আবেদন রাখতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে 'যে-কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে কমপক্ষে নীতিগতভাবে খণ্ডনযোগ্য হতে হবে' (It requires that a theory be refutable in principle.)[১৬]। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও যদি দেখা যায় যে, বিভিন্ন প্রচেষ্টার পরও তত্ত্বটি খণ্ডন করা বা ভুল প্রমাণ করা সম্ভব নয়, তবে সে-তত্ত্বটি সবার নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

Go to Contents
http://thejobstudy.com

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে তত্ত্বের ভূমিকা (Role of Theory in International Relations)

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠে তত্ত্ব এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে-কোন রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক আচরণ বোঝার সুবিধার জন্য যদি আমরা তত্ত্বের সাহায্য গ্রহণ করি, তবে ঐ রাষ্ট্র কেন অনুরূপ আচরণ প্রকাশ করল, তা অতি সহজেই পরিষ্কার হয়ে যায়। একইভাবে কোন রাষ্ট্রের আচরণ পরবর্তীকালে কী রূপ ধারণ করতে পারে, সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার ব্যাপারেও তত্ত্ব আমাদের সহায়তা করতে পারে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যে একটি অতিশয় জটিল বিষয়, তা নিয়ে কারও মনে কোনরূপ সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-জটিলতার মধ্য থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে সহজভাবে বোধগম্য করার ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় আচরণসংক্রান্ত তত্ত্বের উপযোগিতা অনেক। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, সত্তরের দশকের শুরু থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন কেন তার পূর্ব শত্রু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ঝুঁকে পড়ল, এ-জটিল বিষয়টি অনুধাবন করার ব্যাপারে আমরা এতদ্‌সম্পর্কিত কয়েকটি প্রচলিত তত্ত্বের আশ্রয় নিতে পারি। যেমন, কারও মতে চীনা নেতৃবৃন্দ সোভিয়েত ইউনিয়নের তরফ থেকে বিপদের আশঙ্কা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়, যাতে করে সে একই সাথে উভয় পরাশক্তিকে শত্রু করে রাখার ঝুঁকি থেকে মুক্তি পেতে পারে। আবার অন্যদের মতে, চীনা রাজনীতি থেকে কট্টরপন্থীদের বিদায় ও শান্তির প্রবক্তাদের প্রবেশের ফলেই তার পররাষ্ট্রনীতিতে অনুরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়। যা হোক, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে তত্ত্বের কাজ হল, বিভিন্ন জটিল বিষয়কে পৃথক পৃথক শ্রেণীতে ভাগ করে তা থেকে কতগুলো সাধারণ নিয়ম খুঁজে বের করা, যা রাষ্ট্রীয় আচরণকে ব্যাখ্যা ও রাষ্ট্রীয় আচরণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম।

বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের দিক থেকে দেখতে গেলে বলা যায় যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়ক ও পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার সাথে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ও বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে কী নীতি গ্রহণ করবেন, সে-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তাঁরা তত্ত্বের সাহায্য নিতে পারেন। মোটের উপর বলা যেতে পারে যে, তত্ত্ব আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে ব্যাখ্যা ও এতদ্‌সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী করা এ-উভয় কাজেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পাদটীকা

১. Clarence Schrag, 'Philosophical Issues in the Science of Sociology', in Clarence Schrag, *Sociology and Social Research.*

২. James Caporaso, 'Methodological Issues in the Measurement of Inequality, Dependence and Exploitation', in Stephen J. Rosen and James R. Kurth (eds.), *Testing Theories of Economic Imperialism* (Lexington Books, 1974), p. 88.

http://thejobstudy.com

৩. Hubert M. Blalock, Jr., *Theory Construction* (New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1969), p. 10.
৪. Gordon Hilton, *A Review of the Dimensionality of Nations Project* (London : Sage Publication, 1973), p. 54.
৫. ঐ।
৬. Michael Haas, *International Conflict* (New York : The Bobbs-Merrill Co., Inc., 1974), p. 52.
৭. ঐ, পৃ. ৪৮।
৮. দেখুন, ক্যাপোরাসো, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।
৯. May Brodbeck, 'Models, Meanings and Theories', in May Brodbeck (ed.), *Reading in the Philosophy of the Social Sciences* (New York : The Macmillan Co., 1968), p. 579.
১০. Oran Young, 'The Perils of Odysseus', in Raymond Tanter and Richard H. Ullman (eds.), *Theory and Policy in International Relations* (New Jersey; Princeton University Press, 1972), p. 181.
১১. দেখুন Warren R. Phillips, 'Where Have All the Theories Gone?', in *World Politics*, Vol. xxvi, No. 2 (January, 1974), p. 163.
১২. James Caporaso, 'A Philosophy of Science Assessment of the Stanford Studies in Conflict and Integration', in Francis W. Hoole and Dina A. Zinnes (eds), *Quantitative International Politics : An Appraisal* (New York : Praeger Pbulishers, 1976), p. 356.
১৩. ঐ, পৃ. ৩৫৭।
১৪. ঐ, পৃ. ৩৫৬।
১৫. Young, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১।
১৬. Caporaso in Hoole and Zinnes (eds.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭।

একাদশ অধ্যায়

সনাতনপন্থা, আচরণবাদ ও উত্তর-আচরণবাদ

TRADITIONALISM, BEHAVIOURALISM AND POSTBEHAVIOURALISM

উনিশ শত ষাটের দশক পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ক্ষেত্রটি পদ্ধতিগত দিক থেকে সনাতনপন্থীদের (traditionalists) আধিপত্য দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। তাঁদের মতে, জ্ঞান হল এমন একটি জিনিস যা শুধু সরাসরিভাবে অংশগ্রহণ-পর্যবেক্ষণ ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অথবা পরোক্ষভাবে কূটনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক প্রকাশনা ও লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সম্পদাবলি গভীরভাবে অনুসন্ধান করে অর্জন করা সম্ভব। তাঁদের গবেষণার জন্য রাজনীতিজ্ঞদের স্মৃতিকথা (memoirs), আন্তর্জাতিক আইনের গ্রন্থাবলি ও দার্শনিকদের লেখাসমূহ অন্তর্ভুক্ত।

এরপর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে বাস্তববাদীদের (realists) উত্থান ঘটে যে সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। ধ্রুপদী বাস্তববাদের (classical realism) অন্যান্য অবদানের মধ্যে যেটি বেশি উল্লেখযোগ্য তা হল যে এটি বৈশ্বিক অবস্থানসমূহ ও এগুলোর মধ্যকার পরীক্ষামূলক, যার সত্যতা যাচাই করা যায়, যোগসূত্র সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বীয় চিন্তা-ভাবনার পথ উন্মুক্ত করে। এরই যৌক্তিক সম্প্রসারণ হল আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে আচরণবাদী পদ্ধতির (behavioural approach) অভ্যুদয়। কিন্তু যেহেতু আচরণবাদকে বহুলাংশে তত্ত্ব নির্মাণের পদ্ধতি এবং গবেষণাকর্ম চালানোর যৌক্তিকতা ও প্রণালী দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়, তাই এটাকে তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণের চেয়ে গবেষণাপদ্ধতি (methodology) হিসেবে বর্ণনা করাই অধিকতর শ্রেয়।

গত শতাব্দীর ষাটের দশকব্যাপী সনাতনপন্থীদেরকে কার্ল ডয়েস্ (Karl Deutsch), জে ডেভিড সিঙ্গার (J. David Singer) ও জেমস রোজনুর (James N.

http://thejobstudy.com

Rosenau) মত ক্রমবর্ধমানসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যবহারবাদীগণ চ্যালেঞ্জ জানাতে থাকেন, যারা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ক্ষেত্রটিকে অধিকতর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রদানে আত্মনিবেদিত ছিলেন। অতঃপর তাঁদের লক্ষ্য ছিল জীববিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিকট থেকে ধার করে অধিকতর বাস্তবধর্মী ও কঠোর পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে জ্ঞানের ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রধান অংশ গড়ে তোলা। ব্যবহারবাদীগণ তাঁদের গবেষণাকর্মে যে সকল জিনিসকে কাজে লাগিয়েছেন তা হল সামগ্রিক উপাত্ত (aggregate data), পরিমাণগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি (quantitative analysis) ও কম্পিউটার। তাঁদের প্রকাশিত রচনাবলিতে অন্তর্ভুক্ত সে লেখাসমূহ যেগুলো গুরুত্বারোপ করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গতিময়তাকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম তত্ত্বসমূহের নিয়মানুগ উন্নয়ন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা সত্যি প্রতিপাদনের উপর।

এরপর অনেকদিন যাবৎ সনাতনপন্থী ও ব্যবহারবাদী পণ্ডিতগণ বিভিন্ন পদ্ধতিগত বিচার্যবিষয় এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রটি কতটুকু পর্যন্ত জীববিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত বৈজ্ঞানিক পর্যায়ের সমকক্ষতা অর্জন করতে পার সে বিষয়ে মতবিরোধ নিয়ে বিভক্ত ছিলেন (চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ব্যবহারবাদীগণ যেখানে বিশ্বাস করতেন যে শেষ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পেতে তাঁদের অনুসৃত পদ্ধতি এত উচ্চ পর্যায়ের সূক্ষ্মতা ও দৃঢ়তায় পৌঁছবে যে সেগুলো এমনকি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঘটনাবলির সঙ্ঘটন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে সনাতনপন্থীগণ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে আন্তর্জাতিক পরিবেশের জটিলতা ও পরিমাণবাচক করার সীমাবদ্ধতা এমন যে বড় জোর যুক্তিসঙ্গতভাবে অভিজ্ঞতাভিত্তিক অনুমান পর্যন্ত আশা করা যেতে পারে। বস্তুত, অধিকাংশ ব্যবহারবাদী আবহাওয়াবিদদের মত ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা অর্জন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকতে রাজি, যারা সম্ভাব্যতা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন যেখানে একমাত্র যে ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় তা হল যে ভুল-ত্রুটি ঘটা অস্বাভাবিক নয়। উদাহরণস্বরূপ, চার্লস ম্যাকলিল্যান্ড (Charles A. McClelland) যেভাবে বলেছেন, ব্যবহারবাদীদের "লক্ষ্য এটা নয় যে [১৯৯৭ সনে] চীনে কি ঘটনাবলি সঙ্ঘটিত হবে সে সম্পর্কে আগাম কিছু বলা" বরং "বাতাস কোন দিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তা দেখানোর মত দক্ষতার উন্নতিবিধান করা," এবং এভাবে বর্ণিতাবস্থায় কি ঘটতে পারে" ("the goal is not to foretell what events will take place in China [in 1997]" but rather "to develop skill in showing "which way the wind is blowing and, therefore, what might well happen under stated circumstances")[১] সে সম্পর্কে পূর্বধারণা দেয়া।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে আচরণবাদ ছিল মোটের উপর সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাসমূহে বিস্তৃত একটি ব্যাপকতর আন্দোলনের অংশ। প্রায়শ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে অভিহিত আচরণবাদ সনাতনপন্থীগণ কর্তৃক অনুসৃত মানব আচরণের পন্থাসমূহকে, যার উপর ভিত্তি করে তাঁরা তত্ত্ব নির্মাণ করতেন, চ্যালেঞ্জ জানায়।

আচরণবাদী আন্দোলনের কেন্দ্রে ছিল এ পদ্ধতি অনুসারীগণ কর্তৃক এর দোষ-গুণ সম্পর্কিত কিছুসংখ্যক পূর্বানুমান (assumptions) ও বিশ্লেষণমূলক নির্দেশ একত্রে স্বীকার করে নেয়া। আচরণবাদ পরীক্ষা করে দেখতে চায় যে, বিধি হিসেবে গ্রহণযোগ্য সাধারণীকরণের (generalization) অর্থাৎ আন্তর্জাতিক প্রপঞ্চসমূহের প্যাটার্ন ও নিয়মিত ব্যবধানে সঙ্ঘটিত হবার প্রবণতার সত্যতা সম্বন্ধে দৃঢ় উক্তি উন্নীত করা যায় কিনা যা স্থান-কাল নির্বিশেষে অটল থাকবে বলে সাময়িকভাবে মেনে নেয়া হয়। আচরণবাদীগণ দাবি করেন যে বিজ্ঞান হল মুখ্যত একটি সাধারণীকরণমূলক কাজ। তাই বৈজ্ঞানিক গবেষণার উদ্দেশ্য হল আন্তঃরাষ্ট্রীয় আচরণের বারংবার সঙ্ঘটিত প্যাটার্ন ও সেগুলোর কারণসমূহ আবিষ্কার করা।

আসলে আচরণবাদীগণ যে বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করেন তা হল যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণে সুসম্বদ্ধ ও কঠোর পদ্ধতি অনুসরণ করা যেটি ব্যক্তি, গ্রুপ, রাষ্ট্র ও সিস্টেমের আচরণ সঠিকভাবে বুঝতে পারা, ব্যাখ্যা করা ও এতদ্‌সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর উপযোগী দৃশ্যমান জগৎ থেকে উপাত্ত নিয়ে যাচাই করা যায় এমন প্রণালীবদ্ধ তত্ত্বের সমাহার গড়ে তুলবে যা ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসারীদের, যারা সনাতনপন্থীদের অংশবিশেষ, মনে মনে উপলব্ধির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অনুমানমূলক বক্তব্যের, যেগুলো শুধু কাহিনী-ভিত্তিক, ত্রুটিসমূহ এড়াতে সাহায্য করবে। আচরণবাদীদের অনুসৃত গবেষণা পদ্ধতির পাঁচটি ধাপকে গারর্ (Ted Robert Gurr) এভাবে শনাক্ত করেছেন : (১) সমস্যা চিহ্নিতকরণ (problemation), (২) স্বাতন্ত্র্যকরণ (specification), (৩) পরিমাপকরণ (operationalization), (৪) উপাত্ত সংগ্রহ (data collection) ও (৫) পরিসংখ্যানগত পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলের ব্যাখ্যাদান (interpretation)[২]। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বে অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত দুই বা ততোধিক চলকের (variables) মধ্যে বিদ্যমান সম্বন্ধ বিষয়ে উক্তি, কোন কোন অবস্থায় এ সম্বন্ধ(সমূহ) অটল থাকবে বলে সাময়িকভাবে ধরে নেয়া যায় তা নির্দিষ্ট করে বলা, এবং সেগুলো ব্যাখ্যা করা। এ ধরনের তত্ত্বাবলি আবিষ্কার করতে আচরণবাদীগণ কোন বিশেষ সময়ে কোন নির্দিষ্ট দেশের ব্যাপারে পরিচালিত কেইস অধ্যয়ন (case study) নয়, বরং জাতিসমূহের মাঝে আড়াআড়িভাবে বিদ্যমান সম্পর্কের তুলনামূলক বিশ্লেষণের দিকে ঝুঁকে পড়েন। আচরণবাদীগণ আরও জোর দেন রাষ্ট্রসমূহের বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পর্কে উপাত্ত জড় করার প্রয়োজনীয়তা এবং তারা কিভাবে (অর্থাৎ সহযোগিতামূলক না দ্বন্দ্বমূলক) একে অন্যের প্রতি আচরণ করে তার উপর। তাই এটা সহজেই অনুমেয় যে আচরণবাদী আন্দোলন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তুলনামূলক ও পরিমাণবাচক গবেষণার উন্মেষ ঘটায় ও এটাকে পৃষ্ঠপোষকতা করে।

আচরণবাদীদের প্রচেষ্টা ছিল বিশ্লেষণের ব্যাপারে উচ্চতর মানের যথার্থতা ও নির্ভুলতা অর্জন করা। তাঁরা সত্যতা প্রমাণযোগ্য জ্ঞানের দ্বারা উদ্দেশ্যমূলক (subjective) বিশ্বাসকে স্থানাপন্ন, পরীক্ষণযোগ্য নজির (evidence) দ্বারা (প্রধানত

Go to Contents
http://thejobstudy.com
http://thejobstudy.com

সনাতনপন্থী পণ্ডিতদের) নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বজ্ঞাকে (intuition) স্থানচ্যুত, এবং প্রমাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে কিন্তু কেবল বিশ্বাসই যার ভিত্তি সে রকম জ্ঞানকে উপাত্ত ও পুনরায় নির্মাণ করা যায় এমন তথ্য দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে চেষ্টা করেন। বিশেষজ্ঞ হিসেবে যারা সুপরিচিত তাঁদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত মতামতের প্রতি সর্বসাধারণের যে আবেদন আছে বলে অভিযোগ করা হয় তদ্‌স্থলে আচরণবাদী বিজ্ঞানীরা যতক্ষণ পর্যন্ত না যথেষ্ট পরিমাণে নজিরের দ্বারা যে সত্য সমর্থিত নয় সেরূপ দাবিকে স্থগিত বলে বিবেচনা করে কঠোর পদ্ধতি অবলম্বন করে জ্ঞান অর্জন ও এটাকে বর্ধিতকরণের প্রয়াস পান। তাঁদের আকাঙ্ক্ষা হল নৈর্ব্যক্তিক (objective) ও বস্তুগত মূল্যনির্ধারণমুক্ত (value-free) গবেষণা পরিচালনা করা, যদিও তাঁরা স্বীকার করে নেন যে এ লক্ষ্য অর্জনের পথে অন্তরায় বিদ্যমান। তাঁরা এমন সব ধারণা, যেমন শক্তির, দ্ব্যর্থক মৌখিক সংজ্ঞাকে কিছু নির্দেশক (indicator) গঠনের মাধ্যমে তথাকথিত 'পরিমাপের উপযোগী' ('operationalize') করা দ্বারা প্রতিস্থাপিত করতে চান যার উপর ভিত্তি করে বাস্তবজগৎ সম্পর্কিত উপাত্তসংগ্রহ করে পরিসংখ্যানমূলক পরীক্ষা চালানো যায়, এবং যার তাৎপর্য একজন বিশ্লেষক থেকে পরবর্তীজনের নিকট অতি সহজে আদানপ্রদান করা যায়।[৩]

এভাবে আচরণবাদের অধিবক্তাগণ নতুনভাবে সৃষ্ট উপাত্ত দিয়ে পরস্পরবিরোধী প্রকল্পসমূহ (hypotheses) যাচাই করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের উপযোগী নতুন হাতিয়ারে সজ্জিত হয়ে আবির্ভূত হন। পুরো এক প্রজন্মের পণ্ডিতগণ এ নতুন ধারণাগত ও পদ্ধতিগত হাতিয়ার সহযোগে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালনার জন্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত হন। এ প্রক্রিয়ায় কিছুসংখ্যক আচরণবাদী পণ্ডিত জাতীয় সমাজসমূহের সামাজিক ও রাজনৈতিক গঠন প্রকৃতপক্ষে কিরূপ সে সম্পর্কিত বাস্তবজগতের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলিকে তাঁদের পরস্পরবিরোধী ধারণাসমূহের মাধ্যমে ব্যক্ত করেন।

যাচাইযোগ্য জ্ঞানের বর্ধিতকরণ (cumulation) একটি কঠিন, এমনকি ক্লান্তিকর কাজ, যেগুলো সমাধা করতে দরকার কাজের মাঝে নিজেকে একান্তভাবে নিয়োজিত রাখা ও ধৈর্য ধারণ করা। এ ব্যাপারে আচরণবাদীদের প্রথম দিককার উদ্যম ও আশাবাদ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে, কারণ এ জন্য তাঁরা যে শ্রম ব্যয় করেন তা তাৎক্ষণিক সুফল প্রদানে ব্যর্থ হয়। এর ফলে এমনকি আচরণবাদী আন্দোলনের নিজেদের মধ্যেই কেউ কেউ এ পদ্ধতিটি ও এর যথাযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে থাকেন। আচরণবাদের যিনি প্রথম দিককার অন্যতম প্রবর্তক, যাকে এর পিতৃপুরুষ বললেও অত্যুক্তি হয় না, সেই ডেভিড ইস্টন (David Easton) ১৯৬৮ সনে মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির (American Political Science Association, সংক্ষেপে APSA) বার্ষিক সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে আচরণবাদকে পরিত্যাগ বিষয়ক তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। সেখানে তিনি যে প্রায় দু'দশক আগে তাঁর নিজের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত আচরণবাদের নিন্দা করেন তার সঙ্গত কারণ হিসেবে এটির পদ্ধতিগত ত্রুটির কথা

উল্লেখ করেন। এ সময় সমালোচনার মূলে এ হেতু ছিল না যে প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিশ্বের মধ্যকার গভীর পার্থক্যের কারণে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দর্শন ও পদ্ধতি আদৌ প্রয়োগযোগ্য কিনা সে সম্পর্কিত বিবেচনা। বরং একটি আন্দোলন হিসেবে আচরণবাদ বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রচেষ্টা ও এর দার্শনিক ভিত্তিমূলকে মৌলিকভাবে ভুল বুঝেছে, এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের একটি সেকেলে, প্রত্যক্ষবাদী বা দৃষ্টবাদী (positivist) ধারণাকে প্রয়োগ করছে যেটি দার্শনিকভাবে বলতে গেলে আর সমর্থন করা যায় না।[৪] বস্তুত, ইস্টন ১৯৬৯ সনে প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ক্ষেত্রটি আচরণবাদকে অতিক্রম করে উত্তর-আচরণবাদী কালের (postbehavioural era) দিকে অগ্রসর হচ্ছে কিনা।

এ আত্ম-সমীক্ষার মর্মদেশে ছিল সার্বজনীন এক সেট সমালোচনা : (১) যে আচরণবাদে আত্মোৎসর্গকারী কিছুসংখ্যক পণ্ডিত বাস্তব-জগতের সমস্যাবলিকে ততটা গুরুত্ব না দিয়ে পদ্ধতিগত দিকটি নিয়েই নিজেদের ব্যতিব্যস্ত রাখছেন; (২) যে তাঁরা আকর্ষণীয় (যেগুলো প্রায়শ অতি সহজে আয়ত্ত করা যায়) প্রকল্পসমূহকে যাচাই করে দেখার জন্যই নিজেদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, কিন্তু যেগুলো রাষ্ট্রসমূহকে নিরাপদ রাখার এবং বিশ্বকে বসবাসের জন্য অধিকতর শ্রেয় স্থানে পরিণত করার দায়িত্বপূর্ণ কাজে যারা নিয়োজিত সেই নীতি-প্রণয়নকারীদের কাছে বহুলাংশে নগণ্য ও অর্থহীন বলে বিবেচিত হয়; এবং (৩) যে আচরণবাদের পদ্ধতি, যা দৃঢ় উপাত্তের উপর ভিত্তি করে তত্ত্ব নির্মাণ করতে আগ্রহী, মানুষের অতীত অভিজ্ঞতার প্যাটার্নের উপর নির্ভর করে যেটা কখনও কখনও দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্ব অথবা ভবিষ্যতের সাথে সম্বন্ধযুক্ত নয়। তাই তাদের প্রাপ্ত ফলাফল ঐতিহাসিকভাবে সঠিক হতে পারে কিন্তু আজকের অথবা আগামীদিনের বিশ্বের নিকট বহুলাংশে অপ্রাসঙ্গিক।[৫]

যদিও কিছুসংখ্যক আচরণবাদী গবেষণা সরাসরি নৈতিক ইস্যুসমূহের, যেগুলো ছিল আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের মধ্যকার কেন্দ্রীয় পার্থক্য, উল্লেখ করেছে তবু দারিদ্র, ক্ষুধা, সহিংসতা ও অন্য ধরনের অস্থিরতায় পরিপূর্ণ বিশ্বের অনেক নৈতিক দিক সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার ব্যাপারে এ গবেষণাসমূহের তুলনামূলক উপেক্ষার কারণে সেগুলো সমালোচনার সম্মুখীন হয়। তাই উত্তর-আচরণবাদী সমালোচনা (critique) এমন ধরনের নতুন গবেষণা এজেন্ডা দাবি করে যেগুলো নতুন আদর্শের ইস্যুসমূহের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে, এবং সামাজিক বিজ্ঞানের নানান অধীতব্য বিষয়সসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে এমন দৃষ্টিভঙ্গি (multidisciplinary perspective) থেকে সেগুলোর মূলে নিহিত দার্শনিক তাৎপর্য পুনঃপরীক্ষা করবে।

যা হোক, এটা কৌতূহলোদ্দীপক যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের এ নতুন পদ্ধতিটির অর্থাৎ উত্তর-আধুনিকতাবাদের প্রবক্তাগণ কদাচিৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে প্রত্যাখ্যান করার সুপারিশ করেন। প্রায়শই তাঁরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকেই নতুন ধরনের অনুসন্ধান চালানো অথবা বাস্তববাদী ও আদর্শবাদী ঐতিহ্যে লালিত তত্ত্বসমূহকে পুনর্গঠনের কাজে প্রয়োগ করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান।[৬]

http://thejobstudy.com

অনেকদিক থেকে দেখতে গেলে উত্তর-আচরণবাদী সমালোচনার অংশবিশেষ যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অপব্যবহার হচ্ছে সেটা আচরণবাদীদের জন্য ধ্রুপদীবাদীদের (classicists) বিরুদ্ধ-সমালোচনার চেয়ে অধিকতর ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হয়েছে, যদিও তথাকথিত উত্তর-আচরণবাদী যুগেও অর্থাৎ গত শতাব্দীর সত্তরের দশকব্যাপী সনাতনপন্থীদের সমালোচনা অব্যাহত থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে সনাতনপন্থীগণ ও আচরণবাদীগণ (উত্তর-আচরণবাদীগণসহ) উভয় পক্ষই স্বীকার করেন যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জ্ঞানের ধরন কি হওয়া উচিত সে ব্যাপারে কারও একচেটিয়া মতামত নেই। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে গত শতাব্দীর আশির দশকের শুরু থেকে আচরণবাদের আরেক শ্রেণির সমালোচকের উদ্ভব হয়েছে যারা উত্তর-আধুনিকতাবাদী (postmodernists) নামে পরিচিত যাদের গবেষণা সম্পর্কে এ গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায়ে ঈষৎ বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

পাদটীকা

১. Frederic S. Pearson and J. Martin Rochester, *International Relations : The Global Condition in the Late Twentieth Century* (New York : McGraw-Hill Publishing Co., 2nd ed., 1988), p. 21.
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ম্যাকলিল্যাণ্ডের এতদ্‌সংক্রান্ত লেখাটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সনে।

২. C. R. Mitchell, "Analysing the 'Great Debates' : Teaching Methodology in a Decade of Change," in R. C. Kent and G. P. Nielsson, (eds.), *The Study and Teaching of International Relations* (London : Frances Pinter [Publishers] Ltd., 1980), p. 33.
এখানে উল্লেখ্য যে বর্তমানে সামাজিক বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় পরিমাণবাচক গবেষণায় (quantitative research) এ ধাপগুলো অনুসরণ করা হয় এবং এতদ্‌সম্পর্কিত শিক্ষাদানের জন্য সিলেবাসে আলাদা ব্যবস্থা রাখা হয় যেখানে এগুলোর বিশদ বিবরণ থাকে।

৩. Charles W. Kegley, Jr. and Eugene R. Wittkopf, *World Politics : Trend and Transformation* (New York : St. Martin's Press, Fifth edition, 1995), p. 26.

৪. Mitchell, *op. cit.*, p. 30.

৫. Kegley and Wittkopf, *op. cit.*, p. 27.

৬. *Ibid.*, pp. 27-28.

Job Study
To make you prepared & confident
Go to Contents
http://thejobstudy.com

দ্বাদশ অধ্যায়

বাস্তববাদ ও নব্য-বাস্তববাদ

REALISM AND NEOREALISM

বাস্তববাদ (Realism) ও নব্য-বাস্তববাদ (Neorealism) সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে উদারনীতি (Liberalism) ও নব্য-উদারনীতির (Neoliberalism) উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা দরকার। উদারনৈতিক তত্ত্বের উদ্ভব হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে উন্নতিবিধানের (European Enlightenment) যুগ শুরু হবার সাথে এবং তা ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদারনীতির মধ্য দিয়ে বিংশ শতাব্দীতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসনের (Woodrow Wilson) আদর্শবাদ (Idealism) প্রচারের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করে। বর্তমান পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠের সূচনা ও অগ্রগতি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, দুই বিশ্বযুদ্ধ অন্তবর্তীকালীন সময়ে উদারনীতি অথবা আদর্শবাদ ছিল এ বিষয়টি অধ্যয়নের জন্য অনুসৃত প্রধান পদ্ধতি। সেখানে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে ক্রমান্বয়ে কিভাবে বাস্তববাদ আদর্শবাদের স্থান দখল করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে মূল পদ্ধতি হিসেবে গৃহীত হয়। তবে ঊনিশ শত সত্তরের দশকের শুরুতে বিশিষ্ট পণ্ডিত অ্যাক্সেলরড (Robert Axelrod) ও কিউহেনের (Robert O. Keohane) গবেষণাকর্মের মাধ্যমে উদারনীতি নতুন মোড়কে নব্য-উদারনীতি হিসেবে আবার নিজের জন্য খানিকটা স্থান করে নেয়। নব্য-উদারনৈতিক চিন্তাধারার অনুসারীগণ দেখাতে চান যে আন্তর্জাতিক সিস্টেমের অরাজক অবস্থায়ও রাষ্ট্রসমূহ অধিকাংশ সময় কেন নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার ব্যাপারে আগ্রহী থাকে।

যা হোক, উদারনীতির মত বাস্তববাদও দীর্ঘ ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ঐতিহ্যের ফলাফল, যদিও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর সরাসরি প্রয়োগ শুরু হয় কেবল

http://thejobstudy.com

নিকট অতীতে। বাস্তববাদী চিন্তাধারার আদি জনক হিসেবে যাকে অভিহিত করা যায় সেই থুকিদিদিসের (Thucydides, c 460-c400 B. C.) *হিস্ট্রি অব পেলোপোনেসিয়ান ওয়ার* (History of the Peloponnessian War) গ্রন্থের মধ্যেই বাস্তববাদের কমপক্ষে চারটি পূর্বানুমানের (assumptions) সন্ধান মেলে। প্রথমত, রাষ্ট্র (থুকিদিদিসের লেখায় এথেন্স অথবা স্পার্টা) হল সাধারণভাবে যুদ্ধ ও রাজনীতিতে প্রধান কর্মক (actor)। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র হল ঐক্যমূলক কর্মক (unitory actor) যেখানে একই সরকারে কর্মরত বিভিন্ন ব্যক্তি একই ধারণা ব্যক্ত করেন। তৃতীয়ত, রাষ্ট্র হল যৌক্তিক কর্মক (rational actor) যেখানে নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উদ্দেশ্যাবলি অর্জনের ব্যাপারে যৌক্তিকতা দ্বারা পরিচালিত হন, অর্থাৎ তাদের নিকট যতটুকু সম্পদ আছে তা দিয়েই যতটুকু কার্যসাধন করা সম্ভব এতটুকু করারই চেষ্টা করেন। চতুর্থত, বাস্তববাদীদের আসল উদ্বেগ হল নিরাপত্তা বিচার্যবিষয় (security issues)—বিদেশী ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার শত্রুর আক্রমণ ও নাশকতামূলক কার্যাবলি থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করা। রাষ্ট্র তার নিরাপত্তা বৃদ্ধিকল্পে অভ্যন্তরীণ সামর্থ্য বাড়ানো, অর্থনৈতিক ক্ষমতা গড়ে তোলা, এবং একই রকম স্বার্থ অনুসরণকারী অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে মৈত্রীব্যবস্থা সংগঠিত করার নীতি অবলম্বন করতে পারে। বস্তুত, থুকিদিদিসের নজরে আসে যে পেলোপোনেসিয়ান যুদ্ধের আগে ও ঐ যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এথেন্সের (Athens) নৌ ও বাণিজ্যিক শক্তির দ্রুত বৃদ্ধি ও প্রসারণ স্পার্টার (Sparta) মনে নিরাপত্তা ভীতি জাগিয়ে তুলে যার ফলে শক্তিসাম্য বজায় রাখার জন্য শেষোক্ত নগর রাষ্ট্রটি অন্যান্য নগর রাষ্ট্রের সাথে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে প্রথমোক্তটির শক্তি ও প্রভাবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রয়াস পায়। একই সাথে এ দুটো মূল প্রতিদ্বন্দ্বী নগররাষ্ট্রের বিরোধে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা ও বৃদ্ধিকল্পে অন্যান্য নগররাষ্ট্র যে কোন এক পক্ষের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।[১]

এতদ্‌সত্ত্বেও থুকিদিদিস বাস্তববাদের সবগুলো মূলনীতিকে শনাক্ত করতে পারেননি। বস্তুত, এগুলো উদ্ঘাটিত করতে আরও কয়েক শতাব্দী লেগে যায় এবং বাস্তববাদীদের সকলেই এগুলো সম্পর্কে একমত পোষণ করেন না। উদাহরণস্বরূপ, থুকিদিদিসের ছয় শতাব্দী পরে খ্রিস্টান বিশপ ও দার্শনিক সেইন্ট অগাস্টিন (St. Augustine, 345-430 A.D.) একটি মৌলিক পূর্বানুমান যোগ করে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে মানুষের প্রকৃতি "ত্রুটিপূর্ণ, অহংবাদী ও স্বার্থপর" ("flawed, egoistic, and selfish"),[২] যদিও এরূপ হওয়া পূর্বনির্ধারিত নয়। তিনি যুদ্ধের কারণ হিসেবে মানুষের এ মূল বৈশিষ্ট্যাবলিকে দায়ী করেছেন। যদিও পরবর্তী কালের বাস্তববাদীদের অনেকে মানুষের এ ত্রুটিপূর্ণ ও স্বার্থপর প্রকৃতি সম্পর্কিত বাইবেলের ব্যাখ্যার যথার্থতার ব্যাপারে সন্দিহান, তবু তাঁদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক পণ্ডিতই এ ঘটনার বিষয়ে দ্বিমত যে মানুষ মূলত "শক্তি-সন্ধানী ও আত্মমগ্ন" ("power-seeking and self-absorbed")।[৩]

প্রাচীনকালে রোমান রাজনীতিজ্ঞ, বক্তা ও লেখক সিসেরোও (Cicero, 106-43 B. C.) প্রকৃতপক্ষে বাস্তববাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে জন্য তিনি প্রশ্ন রেখেছিলেন যে "শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি ছাড়া আর কি করা যায়?" ("For what can be done against force without force?")।

রাষ্ট্রের জন্য মানুষের এ ত্রুটিপূর্ণ প্রকৃতির তাৎপর্য আধুনিককালে আরও অধিক বিকশিত করেছেন তাঁর লেখার মাধ্যমে ইতালির রাজনৈতিক দার্শনিক ম্যাকিয়াভেলি (Niccolo Machiavelli, 1469-1527)। তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *দি প্রিন্স-এ (The Prince)* তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে একজন নেতাকে তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতি হুমকির ব্যাপারে সর্বদা সজাগ থাকা দরকার। বিদেশীদের সম্ভাব্য আক্রমণের হাত থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য পূর্বব্যবস্থা হিসেবে ম্যাকিয়াভেলি মৈত্রীব্যবস্থা এবং বিভিন্ন আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক রণকৌশল ব্যবহারের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

ফলত সকল বাস্তববাদী তাত্ত্বিক কর্তৃক গৃহীত কেন্দ্রীয় মূলনীতিটি হল যে রাষ্ট্রসমূহ একটি অরাজক আন্তর্জাতিক সিস্টেমে অস্তিমান থাকে। এ মূলনীতিটি আদিতে গ্রন্থিবদ্ধ করেন দার্শনিক হবস (Thomas Hobbes)[৪]। তিনি আন্তর্জাতিক অরাজক অবস্থার যে চিত্র এঁকেছেন তাতে রাষ্ট্রসমূহের জন্য যে আদর্শ (norm) প্রযোজ্য তা হল "একে অন্যের দিকে তাদের অস্ত্রশস্ত্র তাক ও তাদের চক্ষু নিবদ্ধ করে রাখা" ("having their weapons pointing, and their eyes fixed on one another.")[৫]। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্রসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করতে খুব কমসংখ্যক বিধান অথবা নিয়মের ব্যবস্থা আছে।

গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ে যেভাবে আলোচিত হয়েছে (পরবর্তী অধ্যায়ে এ ব্যাপারে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হবে), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পর উদারনীতির সাথে মোহমুক্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক মর্গেনথু (Hans J. Morgenthau, 1904-80) ১৯৪৮ সনে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বাস্তববাদের উপর ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনাপূর্ণ প্রথম গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এটিতে তিনি তত্ত্ব যাচাই করে দেখার উপযোগী গবেষণা পদ্ধতি সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেন। থুকিদিদিস, অগাস্টিন ও হবসের মত মর্গেনথুও আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে শক্তির লড়াই হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি মত প্রকাশ করেন যে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষাকে নিশ্চিত করাই যেখানে নেতাদের একান্ত প্রয়োজনীয় সেখানে তাঁরা যে নৈতিকতা দ্বারা চালিত হবেন তা সাধারণ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নৈতিকতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এভাবে তাঁর মত বাস্তববাদীদের জন্য কোন নীতির রাজনৈতিক পরিণতি দ্বারা নৈতিকতাকে বিচার করতে হবে।

মর্গেনথুর *পলিটিক্স অ্যামং ন্যাশনস্ (Politics Among Nations)* শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকটি দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তরকালে অনেক বছর যাবৎ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধীতব্য বিষয়টির বাস্তববাদীদের জন্য বাইবেল বলে পরিগণিত হতে থাকে। মার্কিন

http://thejobstudy.com

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি এখন থেকে এ তত্ত্বটিকে ঘিরে আবর্তিত হয়: আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তি ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে কার্যকর কৌশল হিসেবে শক্তিসাম্যের আশ্রয় নেয়া। পররাষ্ট্রে দফতরের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব জর্জ কেনান (George F. Kennan, 1904—) যিনি উনিশ শত চল্লিশের দশকে *পলিসি প্ল্যানিং স্টাফের* (Policy Planning Staff) চেয়ারম্যান ছিলেন, এবং হেনরি কিসিঞ্জার (Henry A. Kissinger), যিনি সত্তরের দশকে প্রথমে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও পরে পররাষ্ট্র সচিবের দায়িত্ব পালন করেন, শুধু তাঁদের নীতিমালা সুপারিশের ক্ষেত্রে বাস্তববাদী তত্ত্বকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেননি, তাঁদের নিজেদের লেখার মাধ্যমে এ তত্ত্ব উন্নয়নেও খানিকটা অবদান রেখেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ঠাণ্ডা লড়াই চলাকালীন মার্কিন ধারকনীতির (policy of containment) স্থপতি হিসেবে কেনান শক্তিসাম্যকে ব্যবহার করেছেন। ধারকনীতির লক্ষ্য ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তিকে ঐ বিশাল দেশটির অব্যবহিত পশ্চিমে অবস্থিত পূর্ব ইউরোপীয় প্রভাব বলয়ের (sphere of influence) বাইরে যাতে সম্প্রসারিত না হতে পারে তা নিশ্চিত করতে মার্কিনীদের নেতৃত্বে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর সাহায্যে বাধা দান করা। আসলে সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে মার্কিনি শক্তির ভারসাম্য অর্জনের মধ্য দিয়েই সেটা সম্ভব হয়েছে। কেনান এ ব্যাপারে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে "জাতীয় সমাজকে প্রতিনিধিত্বকারী একটি সরকারের মূল আইনগত বাধ্যবাধকতা হল তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা, যেগুলো হল সামরিক নিরাপত্তা, রাজনৈতিক জীবনের অখণ্ডতা এবং জনগণের সমৃদ্ধি" ("a government's primary obligation is to the *interest* of the national society it represents ... its military security, the integrity of its political life and the well-being of its people.")[৬]।

একইভাবে উনিশ শত সত্তরের দশকব্যাপী প্রবল পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চাপ প্রয়োগের কাজে চীনের মত তৎকালীন কিছুটা দুর্বল হলেও সম্ভাবনাময় শক্তিকে ব্যবহারের জন্য, অথবা ভারতের (যেটি সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্র দেশ ছিল) ক্রমবর্ধমান শক্তির বিরুদ্ধে সমতা-রক্ষার্থে পাকিস্তানকে সমর্থন যুগিয়ে কিসিঞ্জার ধ্রুপদী বাস্তববাদীদের (classical realists) শক্তি সাম্যকে উৎসাহিত করেছেন। কঠোর বাস্তববাদী হিসেবে পরিচিত কিসিঞ্জারকে যখন একবার শৃঙ্খলা (order) ও ন্যায়পরতার (justice) মধ্যে তুলনা করে তাঁর নিজস্ব মতামত দিতে বলা হয়েছিল তখন তিনি বিশিষ্ট জার্মান কবি গ্যেটেকে (Goethe) উদ্ধৃত করে বলেছিলেন যে, "যদি আমাকে একদিকে ন্যায়পরতা ও বিশৃঙ্খলা এবং অন্যদিকে অন্যায় ও শৃঙ্খলার মধ্য থেকে একটিকে বাছাই করতে হয় তবে আমি সর্বদাই শেষোক্ত দিনটিকে পছন্দ করব" ("If I had to choose between justice and disorder, on the one hand, and injustice and order on the other, I would always choose the latter.")[৭]। এভাবে দেখা যায় যে বাস্তববাদী তত্ত্ব সুস্পষ্ট নীতি ব্যবস্থাপত্র উপস্থাপিত করে। বস্তুত, "বাস্তববাদ সকল রাজনৈতিক জীবনে শক্তি ও

Go to Contents
http://thejobstudy.com

নিরাপত্তার প্রাধান্যের" ("the primacy in all political life of power and security")[৮] উপর গুরুত্বারোপ করে। তবে বাস্তববাদী তাত্ত্বিকগণ নৈতিকতাকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকলেও ডোনেলি (Jack Donnelly) অভিমত ব্যক্ত করেন যে বাস্তববাদীদের নিজস্ব পরিভাষা অনুযায়ী জাতীয় স্বার্থ শুধু শক্তি ও নিরাপত্তা দ্বারা সংজ্ঞায়িত হলেও মানবাধিকার ও "অন্যান্য নৈতিক উদ্বেগ" ("other moral concerns") জাতীয় স্বার্থের অতিরিক্ত গঠনমূলক উপাদান হলে ভাল হয়।[৯] এ ছাড়াও প্রাচীন চীনের পণ্ডিত কনফুসিয়াস (Confucius), যিনি সমগ্র প্রাচ্যের বিশিষ্ট জ্ঞানী হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত, যথার্থই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে যারা নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে (প্রকারান্তরে বাস্তববাদীগণ) "প্রতারণা ও চাতুরীর" ("deceit and cunning") আশ্রয় নেয় তবে এগুলোতে অন্তর্নিহিত ত্রুটি থেকে যুদ্ধের উদ্ভব ঘটে।

বাস্তববাদ যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তা হল ব্যক্তিকে (individual) প্রধানত স্বার্থপর ও ক্ষমতালোভী হিসেবে দেখা। ব্যক্তিসকল যখন নিজেদের মধ্যে সংগঠিত হয়ে বসবাসের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র গড়ে তুলে তখন প্রতিটি রাষ্ট্র একইভাবে তার নিজের জাতীয় স্বার্থ অনুসরণ করে যা শক্তির পরিভাষা অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত হয়। এ রাষ্ট্রসমূহ অরাজক আন্তর্জাতিক সিস্টেমে অবস্থিত বলে তাদেরকে নিজেদের উপর নির্ভর করতে হয়। সুতরাং এটা সহজেই অনুমেয় যে নিরাপত্তার ব্যাপারে নির্ভর করা যায় রাষ্ট্রসমূহের উপর এমন কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতিতে তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগ হল নিজেদের নিরাপত্তাহীনতা দূর করা বিষয়ক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিজেদেরই পালন করা। এ ব্যাপারে তারা সাধারণত শক্তিসাম্য (balance of power) ও পারস্পরিক ভয় দেখিয়ে নিবৃত্ত করার (deterrence) মত ব্যবস্থাদির উপর নির্ভর করে থাকে।

এখানে বলা আবশ্যক যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যতই একটি পরিপূর্ণ উন্নত অধীতব্য বিষয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে, এ ক্ষেত্রটিতে এত বেশি প্যারাডাইমের (paradigm)[১০] উদ্ভব হতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর কালে একমাত্র ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্যারাডাইম ছিল ধ্রুপদী বাস্তববাদী প্যারাডাইম। কিন্তু উনিশ শত সত্তরের দশকের শুরু থেকে প্রথমে রবার্ট কিওহেন ও যোসেফ ন্যাই (Jesoph S. Nye) বহুত্ববাদী প্যারাডাইম (pluralist paradigm) উপস্থাপন করে এবং অতঃপর ব্রিটিশ পণ্ডিত জন বার্টন (John Burton) কর্তৃক প্রথমে প্রস্তাবিত বিশ্ববাদী প্যারাডাইম (globalist paradigm) ও পরিশেষে ষাটের দশকে ল্যাটিন আমেরিকান গবেষকগণ কর্তৃক সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত মার্ক্সীয় তত্ত্বের সম্প্রসারণের মাধ্যমে উন্নীত পরিনির্ভরশীলতা তত্ত্বের (dependency theory) উত্তরসূরি হিসেবে বিবেচিত প্রবক্তাগণ যে প্যারাডাইম উন্নয়ন করেন সেই নব্য-মার্ক্সবাদী প্যারাডাইমের (New-Marxist paradigm) আবির্ভাব একের পর এক বাস্তববাদী প্যারাডাইমকে সমালোচনা করা শুরু করে। যদিও এ সমালোপনাসমূহ ধ্রুপদী প্যারাডাইমটিকে পুরোপুরি আত্মসমর্পণে বাধ্য করাতে পারেনি, তবু এর ফলে সেটি অনেকটা কলঙ্কিত হয়। এমতাবস্থায় কয়েকজন পণ্ডিত নতুন লেবেলে বাস্তববাদী প্যারাডাইমটিকে পুনর্গঠিত করে সেটির

http://thejobstudy.com

আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান। বাস্তববাদের পুনর্ব্যাখ্যাকৃত এ ধরনটি নব্য-বাস্তববাদ (neorealism) নামে বহুল পরিচিত। এদের অন্যতম প্রতিভূ রবার্ট জিলপিন (Robert Gilpin) এ ব্যাপারে যথার্থই বলেছেন যে, "থুকিদিদিসের কাল থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃতি অপরিহার্যভাবে অপরিবর্তিত রয়ে গেছে : অরাজক অবস্থায় স্বাধীন কর্মকসমূহের মধ্যে সম্পদ ও শক্তির জন্য বারংবার সঙ্ঘটিত লড়াই" ("the nature of international relations [has remained] essentially unchanged since Thucydides : 'a recurring struggle for wealth and power among independent actors in a state of anarchy.'") ।[১১]

নব্য-বাস্তববাদের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা হলেন কেনেথ ওয়াল্টয (Kenneth Waltz) যিনি ১৯৭৯ সনে প্রকাশিত তাঁর সুবিখ্যাত *থিউরি অব ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স (Theory of International Politics)* শীর্ষক গ্রন্থে এতদ্‌সম্পর্কিত যে তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন সেটা কাঠামোগত বাস্তববাদ (structural realism) নামে প্রসিদ্ধ। অবশ্য এরও ঠিক দু'দশক পূর্বে ১৯৫৯ সনে তাঁর প্রকাশিত আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *ম্যান, দি স্টেট অ্যান্ড ওয়ার (Man, the State and War)*-এ তিনি সর্বপ্রথম বাস্তববাদকে পুনঃসূত্রবদ্ধ ও সুসম্বদ্ধ করতে সক্ষম হন। বাস্তববাদের এ ধরনটিতে তিনি মানুষের প্রকৃতির উপর দোষারোপ করার চেয়ে বিশ্ব রাজনীতির অরাজক অবস্থার উপরই বেশি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ষাটের দশকের অব্যবহিত পূর্বের লেখায়ই বলেছিলেন,

> প্রত্যেক রাষ্ট্র তার নিজস্ব জাতীয় স্বার্থ, তা যেভাবেই সংজ্ঞায়িত হোক না কেন, অনুসরণ করতে এমনসব উপায় অবলম্বন করে যা সে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করে। রাষ্ট্রসমূহের বহিঃস্থ লক্ষ্যসমূহ অর্জনের একটি উপায় হল শক্তি ব্যবহার করা, কারণ অরাজক অবস্থায় অনুরূপ এককসমূহের মধ্যে যে স্বার্থের সংঘাত বিদ্যমান তা দূর করতে কোন দৃঢ়, নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা নেই (Each state pursues its own interest, however defined, in ways it judges best. Force is a means of achieving the external ends of states because there exists no consistent, reliable process of reconciling the conflicts of interests that inevitably arise among similar units in a contition of ananchy.)[১২]।

ওয়াল্টযের মত নব্য-বাস্তববাদীর এ প্রচেষ্টার মূলে নিহিত আছে রাজনৈতিক বাস্তববাদকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি অধিকতর যথাযথ তত্ত্বে পরিণত করা। নব্য-বাস্তববাদীগণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সঙ্ঘটিত ঘটনাবলিকে ব্যাখ্যা করতে এত বেশি সাহসী যে তাঁরা সর্বজনীনভাবে প্রয়োগযোগ্য বিধিমালা (general laws) সকলের বিবেচনার্থ উপস্থাপন করতে পিছপা হন না। অধিকন্তু, তাঁদের আরও লক্ষ্য থাকে যাতে এগুলোর মাধ্যমে তাঁরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সাধারণ প্রবণতাসমূহের অধিকতর যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যার সাথে সাথে এতদ্‌সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতেও সক্ষম হন।

ধ্রুপদী বাস্তববাদীদের রাষ্ট্রসমূহ ও মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্যাবলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ব্যাখ্যা প্রদানের স্থলে নব্য-বাস্তববাদীগণ আন্তর্জাতিক সিস্টেম কাঠামোকে

(international system structure) অগ্রাধিকার দেন। ওয়াল্টযের মতে, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে এককটির উপর মনোনিবেশ করতে হবে তা হল আন্তর্জাতিক কাঠামো। কোন বিশেষ সিস্টেমের কাঠামো নির্ধারিত হয় বিন্যাসমূলক মূলনীতি দ্বারা, যথা, ঊর্ধে কোনরূপ কর্তৃত্বকারীর অনুপস্থিতি, এবং রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সামর্থ্যের বন্টন। এ সামর্থ্যসমূহ যেকোন সিস্টেমে রাষ্ট্রের অবস্থান নির্ধারণ করে। আন্তর্জাতিক কাঠামো নিজে থেকেই একটি প্রভাব; এটি রাষ্ট্রীয় আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং রাষ্ট্রসমূহ এটিকে নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম নাও হতে পারে। আসলে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসমূহের বৈশিষ্ট্যাবলি নয়, বরং আন্তর্জাতিক কাঠামো বিভিন্ন ঘটনাবলির ফলাফল নির্ধারণ করে। এভাবে ওয়াল্টায আন্তর্জাতিক সিস্টেমে শক্তির বন্টন ও রাষ্ট্রসমূহের কার্যাবলির মধ্যে সম্বন্ধ বর্ণনা করেছেন : ক্ষুদ্র দেশসমূহ বৃহৎ দেশগুলো থেকে পৃথক আচরণ প্রদর্শন করবে, এবং শক্তিসাম্য ব্যবস্থায় শক্তির সম্বন্ধাবলিতে পরিবর্তন সাধিত হলে এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ দেশসমূহের নিকট থেকে পক্ষ পরিবর্তনের প্রত্যাশা করা যেতে পারে।

ধ্রুপদী বাস্তববাদের মত নব্য-বাস্তববাদেও শক্তিসাম্য হল কেন্দ্রীয় মূলনীতি। কিন্তু পূর্বেকার বাস্তববাদীদের সাথে নব্য-বাস্তববাদীদের পার্থক্য হল যে শেষোক্ত পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করেন যে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার শক্তিসাম্য বহুলাংশে সিস্টেমের কাঠামো দ্বারা নির্ধারিত হয়। এরূপ সিস্টেমে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সম্ভাবনাসমূহ যৌক্তিকভাবে ক্ষীণ :

> যখন পারস্পরিক লাভের জন্য সহযোগিতার সম্ভাবনার সম্মুখীন হয়, তখন যে সকল রাষ্ট্র অনিরাপদ বোধ করে সেগুলো অবশ্যই নিজেদের নিকট প্রশ্ন রাখে যে অর্জিত কোনকিছু কিভাবে বণ্টিত হবে। 'আমরা উভয়ই লাভবান হব কিনা?' এ প্রশ্নটি উত্থাপন না করে তারা যে প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে বাধ্য হয় তা হল যে 'কে অধিক লাভবান হবে?' যদি কোন অপ্রত্যাশিত মুনাফা, ধরে নেই, দুই অনুপাত এক-এ বণ্টিত হবে, কোন একটি রাষ্ট্র তার ভাগে পড়া অসমানুপাতিক লাভ অন্য রাষ্ট্রটির ক্ষতিসাধন অথবা ধ্বংসসাধনের নীতি বাস্তবায়নের কাজে লাগাতে পারে। এমনকি উভয় পক্ষের জন্য বৃহৎ চূড়ান্ত লাভের উজ্জ্বল সম্ভাবনাও তাদের মধ্যে সহযোগিতার উদ্রেক করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের প্রত্যেকে অন্য রাষ্ট্রটি তার বর্ধিত সামর্থ্যসমূহকে কিভাবে ব্যবহার করবে সে ব্যাপারে ভীত থাকে (When faced with the possibility of coopeating for mutual gain, states that feel insecure must ask how the gain will be divided. They are compelled to ask not "Will both of us gain?" but "Who will gain more?" If an expected gain is to be divided, say, in the ratio of two to one, one state may use its disproportionate gain to implement a policy intended to damage or destroy the other. Even the prospect of large absolute gains for both parties does not elicit their cooperation so long as each fears how the other will use its increased capabilities).[১৩]

যদিও অরাজক আন্তর্জাতিক সিস্টেমে প্রত্যেক পক্ষের অনিরাপত্তা সহযোগিতাকে ব্যাহত করে, পক্ষসমূহরে মধ্যকার পারস্পরিক নির্ভরশীলতা (interdependence)

Job Study
To make you prepared & confident
http://thejobstudy.com

সহযোগিতা সহজতর করতে পারে। কিন্তু অনিরাপত্তার পারিপার্শ্বিক অবস্থায়, রাষ্ট্রসমূহ অন্যদের উপর অতি বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকে। এটাই ব্যাখ্যা যোগায় যে রাষ্ট্রসমূহ কেন অধিকতর কর্তৃত্ব ও আত্মনির্ভরশীলতা কামনা করে।[১৪]

ওয়াল্টযের কাঠামোগত বাস্তববাদ ধ্রুপদী বাস্তববাদের চেয়ে অধিকতর সুসম্বদ্ধ ও যৌক্তিকভাবে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ। অ্যাশলের (Richard K. Ashley) ভাষায়, এর নিজস্ব মাপকাঠি অনুযায়ী, কাঠামোগত বাস্তববাদ "ধ্রুপদী বাস্তববাদের এক অগ্রগতিমূলক বৈজ্ঞানিক পুনরুদ্ধার" ("a progressive scientific redemption of classical realism.")[১৫]। রবার্ট কিওহেনের মতে, বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কিত গবেষণায় ওয়াল্টযের অবদান ধারণাগত (conceptual)। তিনি আমাদেরকে সিস্টেমিক তত্ত্বের ভূমিকা, কাঠামোগত মডেলসমূহের ব্যাখ্যাদান ক্ষমতা এবং শক্তিসাম্যের বারংবার গঠনকে কিভাবে অবরোহী দিক থেকে সন্তোষজনকভাবে বোধগম্য করা যায় সেগুলো অধিকতর স্পষ্টরূপে চিন্তা করে দেখতে সাহায্য করেন। তিনি দেখান যে আন্তর্জাতিক সিস্টেম রাষ্ট্রীয় আচরণকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে এবং একই সাথে এর উল্টোটাও সত্যি। কিওহেন এগুলোকে বিরাট অবদান বলে স্বীকার করেন।[১৬] কিন্তু তিনি ওয়াল্টযের তত্ত্বে অনুসন্ধানমূলক (heuristic) তেমন কিছু নেই বলে কিঞ্চিৎ সমালোচনা করে বলেন যে, "আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে নতুনভাবে দেখার যা বড় ধরনের অভিনবত্বের বৈশিষ্ট্যসূচক এমন কিছুর প্রতি ওয়াল্টয ইঙ্গিত প্রদান করেন না" ("... Waltz does not point out 'new ways of seeing' international relations that point toward major novelties.")[১৭]। তিনি তবু বাস্তববাদকে পুনর্গঠন ও প্রণালীবদ্ধ করেছেন এবং এভাবে যেটা উন্নীত করেছেন তাকে কাঠামোগত বাস্তববাদ বলা যেতে পারে যার মৌলিক পূর্বানুমানসমূহ (fundamental assumptions) তাঁর পূর্ববর্তী ধ্রুপদী পণ্ডিতদের প্রদত্ত পূর্বানুমানগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[১৮]

এ ছাড়াও কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে মুল্যায়নের আরেকটি প্রধান বিচারের মানদণ্ড মিতব্যয়িতার (parsimony) দিক থেকেও ওয়াল্টযের তত্ত্বটি তেমন বেশি আকর্ষণীয় নয়। এ ব্যাপারেও কিউহেনের বক্তব্য সুস্পষ্ট। কাঠামোগত তত্ত্বের সর্বাধিক মিতব্যয়ী রূপ বিবেচনায় আনবে যে, যে কোন আন্তর্জাতিক সিস্টেমে শক্তির শুধু একটিই কাঠামো থাকবে। এরূপ বিমূর্ত ধারণা নির্মাণে শক্তি সম্পদাবলি সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট ও রূপান্তরযোগ্য (homogeneous and fungible) : অভীষ্ট ফলদানে সক্ষমতার ব্যাপারে কোন অর্থবহ ক্ষতিস্বীকার ব্যতিরেকে যেকোন প্রকার বিচার্যবিষয়ে ফলাফল অর্জনের জন্য এগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থনীতিতে টাকাকড়ি যে রকমভাবে ব্যবহৃত হয়, রাজনীতিতে শক্তিও অনুরূপভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এ সম্পর্কে উলফারস (Arnold Wolfers) যথার্থই বলেছেন যে, "অনেক ব্যাপারে, টাকাকড়ি বাজার অর্থনীতিতে যে ভূমিকা পালন করে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তি ও প্রভাব একই রকম ভূমিকা রাখে" ("in many respects, power and influence play the same role in international politics as money does in a market economy.")[১৯]।

ওয়াল্টযের মত কাঠামোগত বাস্তববাদী নব্য-বাস্তববাদী তত্ত্বকে সরলীকরণের কাজে যেভাবে কিছু কেন্দ্রীয় ধারণার (কাঠামো ও শক্তিসাম্য) উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন, তেমনি বাস্তববাদের সাথে বর্ধিত জটিলতা যুক্ত করে আরও স্বল্পসংখ্যাক পণ্ডিত ধ্রুপদী তত্ত্বটির পুনর্ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এদের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবার্ট জিলপিন তাঁর সুপরিচিত *ওয়ার অ্যান্ড চেইঞ্জ ইন ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স (War and Change in World Politics)* শীর্ষক গ্রন্থে এ ধরনের পুনর্ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি সেখানে বাস্তববাদীদের পূর্বানুমানসমূহ যে রাষ্ট্র হল প্রধান কর্মক, সিদ্ধান্ত-প্রণেতাগণ মূলগতভাবে যৌক্তিক আচরণ করেন এবং শক্তি নির্ধারণে আন্তর্জাতিক সিস্টেম কাঠামো একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে, মেনে নিয়ে বিগত ২,৪০০ বছরের পাশ্চাত্য ইতিহাস পরীক্ষা করে দেখেন যে, "প্রত্যেক আন্তর্জাতিক সিস্টেমে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার ক্ষমতার বন্টন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রধান অবয়ব গঠন করে" ("the distribution of power among states constitutes the principal form of control in every international system.")[২০]। এখানে জিলপিন বহুলাংশে স্থিতীয় (static) বাস্তববাদী তত্ত্বের সাথে যেটা যোগ করেছেন সেটা হল গতিশীলতা (dynamism), আবর্তনশীলতার এক ধারাবাহিকতা (a series of cycles)—কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রসমূহের জন্ম, সম্প্রসারণ ও মৃত্যুর আবর্তনশীলতা।

জিলপিনের মতে, রাষ্ট্রসমূহ আন্তর্জাতিক সিস্টেমে পরিবর্তন আনয়নে সচেষ্ট হয় যখন সেগুলো মনে মনে হিসেবে করে দেখে যে এটা করলে প্রত্যাশিত লাভের পরিমাণ খরচের পরিমাণের চেয়ে বেশি হবে। এভাবে স্পষ্টতই ধ্রুপদী বাস্তববাদীদের যৌক্তিক পূর্বানুমানকে প্রয়োগ করা হয়েছে।

এখানে জিলপিনের তত্ত্বের অভিনবত্ব প্রকাশ করতে বলা যায় যে যেখানে ধ্রুপদী বাস্তববাদ রাষ্ট্রসমূহের শক্তির দিক থেকে পড়ন্ত অবস্থায় পড়ার (decline of powers) ব্যাপারে কোন সন্তোষজনক যৌক্তিকতা তুলে ধরতে ব্যর্থতার পরিচয় দেয় সেখানে তিনি অর্থনৈতিক শক্তির গুরুত্বের পুন:নবীকরণের উপর ভিত্তি করে তা দেখাতে সফল হন। কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রসমূহ (hegemons) পড়ন্ত অবস্থায় পতিত হয় তিনটি প্রক্রিয়ার কারণে : সাম্রাজ্য থেকে ক্রমবর্ধমানহারে প্রান্তীয় আগম (marginal returns), একটি জাতি-রাষ্ট্র পর্যায়ের প্রপঞ্চ; সময় অতিবাহিত হবার সাথে সাথে অর্থনৈতিকভাবে কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে অধিক ব্যয় ও কম বিনিয়োগের প্রবণতা, যেটিও একটি জাতি-রাষ্ট্র পর্যায়ের প্রপঞ্চ; এবং প্রযুক্তির পরিব্যাপ্তি, যেটি একটি সিস্টেম পর্যায়ের প্রপঞ্চ যার মাধ্যমে নতুন রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ জানানোর শক্তি অর্জন করে।[২১]

Go to Contents
http://thejobstudy.com

http://thejobstudy.com

কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রের পড়ন্ত অবস্থায় নিপতিত হবার কারণ ব্যাখ্যা প্রদানের প্রচেষ্টায় জিলপিন প্রথমেই 'অসম ক্রমোন্নতির বিধি' ('law of uneven growth') সূত্রবদ্ধ করেছেন :

> বাস্তববাদের মতে, রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার যুদ্ধবিগ্রহের এবং আন্তর্জাতিক সিস্টেমসমূহে পরিবর্তনের মৌলিক কারণ হল রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে শক্তির অসম ক্রমোন্নতি। থুকিদিদিস ও ম্যাকাইন্ডার থেকে শুরু করে বর্তমানের পণ্ডিতগণ পর্যন্ত বাস্তববাদী লেখকগণ আন্তর্জাতিক সম্পর্কে গতিময়তা আনয়নের জন্য যে প্রকৃত ঘটনাকে দায়ী করেছেন তা হল যে কোন আন্তর্জাতিক সিস্টেমে শক্তির বন্টন সময় অতিবাহিত হবার সাথে সাথে অদলবদল হয় : এ অদলবদলের ফলে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার সম্পর্কাবলিতে গভীর পরিবর্তন সাধিত হয়, এমনকি তা আন্তর্জাতিক সিস্টেমটারই প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটায় (According to Realism, the fundamental cause of wars among states and changes in international system is the uneven growth of power among states. Realist writers from Thucydides and Mackinder to present day scholars have attributed the dynamics of internatiional relations to the fact that the distribution of power in an international system shifts over a period of time : this shift results in profound changes in the relations among states and eventually changes in the nature of the internationd system itself.)[২২]।

যা হোক, কিওহেনের মতে, এ বিধিটি সমস্যাটির সমাধান না বাতলিয়ে সেটা পুনরায় বিবৃত করে। এ প্যাটার্নটির কারণ নির্দেশিত করতে গিয়ে জিলপিন তিন সেট প্রক্রিয়ার উপর আস্থাসহকারে নির্ভর করেন। সাম্রাজ্যসমূহ যখন ক্রমোন্নতির পর্যায় অতিক্রম করতে থাকে তখন প্রথমদিকে "অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত যুদ্ধ চালাতে যে খরচ পড়ে তার চেয়ে দ্রুততর গতিতে বাড়ে" ("the economic surplus [increases] faster than the cost of war.")।[২৩] তথাপি শীঘ্র হোক বা দেরিতে হোক, ক্রমহ্রাসমান আগম আরম্ভ হয় : "ক্রমহ্রাসমান আগম বিধির সার্বজনীন প্রয়োগযোগ্যতা আছে এবং তা প্রত্যেক সমাজের ক্রমোন্নতিকে এস-আকৃতির বক্ররেখা দ্বারা বর্ণনা করার কারণ ঘটায়" ("the law of diminishing returns has universal applicability and causes the growth of every society to describe an S-shaped curve")।[২৪] দ্বিতীয়ত, উপরে যেভাবে উল্লেখিত হয়েছে, কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রসমূহ ক্রমবর্ধমানভাবে অধিক ব্যয় ও কম বিনিয়োগপ্রবণ হয়। তৃতীয়ত, আবার উপরের উল্লেখ অনুযায়ী, প্রযুক্তির পরিব্যাপ্তির ব্যাপারে জিলপিনের যুক্তি অধিকতর ব্যাপক :

> অন্য রাষ্ট্রসমূহে প্রযুক্তির পরিব্যাপ্তির প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাধান্যবিস্তারকারী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, সামরিক অথবা অর্থনৈতিক সাফল্য যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সে সুবিধা হারায়। এভাবে দৃষ্টান্ত দ্বারা এবং প্রায়শ অধিকতর সরাসরি উপায়ে, প্রাধান্যবিস্তারকারী রাষ্ট্র চ্যালেঞ্জ জানাতে সক্ষম শক্তিসমূহ সৃষ্টিতে সাহায্য করে (Through a process of diffusion [of teachnology] to other states, the dominant power loses the advantage on which its political, military, or economic success has been based. Thus by example, and frequently in more direct fashion, the dominant power helps to create challenging powers.)[২৫]।

জিলপিন এ প্রক্রিয়াটির উপর জোর দিয়ে বলেন যে এটিই প্রথমে ব্রিটেন ও পরে উনিশ শত সত্তরের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পড়ন্ত অবস্থায় পতিত হতে সাহায্য করেছে।

ধ্রুপদী বাস্তববাদের নিকট জিলপিন সুস্পষ্টভাবে তাঁর ঋণের কথা স্বীকার করেছেন। জিলপিন বিশ্বাস করেন যে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শক্তির পরিবর্তন সাধিত হলে তা যে তাদের মধ্যকার সম্পর্ককে পরিবর্তনের দিকে চালিত করে এটা থুকিদিদিসের জানা ছিল। থুকিদিদিস বুঝতে পেরেছিলেন যে পেলোপোনেসিয়ান যুদ্ধের আসল কারণ ছিল এথেন্সের শক্তিবৃদ্ধি যা স্পার্টা ও তার মিত্রদের মনে ভীতির সঞ্চার করে। ঐ যুদ্ধকে ব্যাখ্যা করতে থুকিদিদিস যে যুক্তি উপস্থাপন করেন, জিলপিন সেটাকে সাধারণীকরণের মাধ্যমে তাঁর তত্ত্ব উন্নয়ন করেন এবং তা বিশ্ব ইতিহাসের সামগ্রিক গতিপথের উপর প্রয়োগ করেন :

> অসাম্য অবস্থা সাম্যতাকে প্রতিস্থাপিত করে, এবং বিশ্ব এক নতুন রাউন্ড কর্তৃত্বকারী সংঘর্ষের দিকে চালিত হয়। এটা সর্বদাই এ রকম ছিল এবং সবসময়ই এ রকমই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ হয় নিজেদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে অথবা শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের এক কার্যকর বন্দোবস্ত গড়ে তুলতে শিখবে (Disequilibrium replaces equilibrium, and the world moves toward new round of hegemoric conflict. It has alwasy been thus and always will be, until men either destroy themselves or learn to develop an effective mechanism of peaceful change.)[২৬]।

জিলপিনের নব্য-বাস্তববাদী তত্ত্বকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এ সিস্টেমিক তত্ত্বটি মাঝেমধ্যে বিশেষ বিশেষ দেশে কেন অস্বাভাবিক শক্তির সমাগম ঘটে যাতে সেগুলো বিশ্বের বুকে হঠাৎ প্রাধান্যবিস্তারকারী অবস্থানে চলে যায় তার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারে না। অন্যান্য কাঠামোগত তত্ত্বের মত জিলপিনের তত্ত্বও কোন ঘটনার পরিণতি কি হবে সে সম্পর্কে প্রয়োজনের তুলনায় কম ভবিষ্যদ্বাণী করে। এটা আমাদের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পরিবর্তন হলে তা বুঝার ব্যাপারে অবদান রাখে কিন্তু সেটা কেন ঘটে তা ব্যাখ্যা করে না।

এভাবে জিলপিনের ধ্রুপদী বাস্তববাদের বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন অভিযোজন আমাদেরকে মানুষের প্রকৃতির নেতিবাচক বর্ণনামূলক দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ধ্রুপদী বাস্তববাদ থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে বিংশ শতাব্দীর আধুনিক মানবতার অতিস্তবাদী অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করে যেটা বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের দখলে থাকা মারণাস্ত্রের কারণে উদ্ভূত একের পর এক সংঘর্ষের ফলে মানবজাতিসহ আমাদের গ্রহে বসবাসরত সকল জীবনকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। জিলপিন এ সমূহ বিপদ উপলব্ধি করতে পারলেও শুধু এর গুরুত্ব বুঝতে আমাদের সাহায্য করতে পারেন কিন্তু তা দূরীকরণের উপায় বাতলে দিতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন।

http://thejobstudy.com

নব্য-বাস্তববাদের ব্যর্থতা সম্পর্কে লিঙ্কলেটার (Andrew Linklater) চমৎকার যুক্তি দিয়ে যথার্থই বলেছেন যে, আন্তর্জাতিক সিস্টেমের গঠনের বারংবার পরিবর্তনের প্রতি জোর দিয়ে "নব্য-বাস্তববাদ রাষ্ট্রশাসনকার্যের এমন রীতি বিবেচনা করতে পারে না যা শক্তি ও কর্তত্বের হিসাবনিকাশকে অতিক্রম করে যায়" ("neo-realism cannot envisage a form of statecraft which transcends the calculus of power and control.")[২৭]

এ অধ্যায়ের উপসংহারের এসে বলা যায় যে বাস্তববাদীগণ অনৈতিকতাকে কেন সমর্থন করেন তার কারণ হিসেবে বলা যায় যে তাঁরা বিশ্বাস করেন যে বিশ্বকে একটি অধিকতর শ্রেয় আবাসে পরিণত করার ব্যাপারে কল্পনাবাদীদের (utopians) লক্ষ্য ও জেহাদ শুধু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। রবার্ট আর্ট (Robert Art) ও কেনেথ ওয়াল্টযের মত নব্য-বাস্তববাদীগণও ধ্রুপদী বাস্তববাদের এ অভিমতকে ধারণ করে দাবি করেন যে, "অরাজক বিশ্বে রাষ্ট্রসমূহ নৈতিকতার ধ্বজাধারী বনতে সমর্থ হতে পারে না। নৈতিক আচরণ প্রদর্শনের সম্ভাবনা নির্ভর করে একটি কার্যকর সরকারের অস্তিত্বের উপর যা বেআইনি কার্যাবলিকে নিবৃত্ত ও শাস্তিদান করতে পারে" ("states in ananchy cannot afford to be moral. The possibility of moral behavior rests upon the existence of an effective government that can deter and punish illegal actions.")।[২৮]

পাদটীকা

১. Karen Mingst, *Essentials of International Relations* (New York : W. W. Norton & Co., 1999), pp. 71-72.
২. *Ibid.* p. 75.
৩. *Ibid.*
৪. "আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠে বিভিন্ন পদ্ধতি" শীর্ষক অধ্যায় *দার্শনিকগণ ও তাঁদের মতবাদ* উপ-শিরোনামে হবস সম্পর্কে আলোচনা দ্রষ্টব্য।
৫. Mingst, *op. cit.*, p. 75.
৬. Jack Donnelly, *International Human Rights* (Westview Press, Second Edition, 1998), p. 30, emphasis original.
৭ Quated in William H. Meyer, *Human Rights and International Political Economy in Third World Nations* (Westpart, Connecticut : Praeger, 1998), p. 43.
৮. Donnelly, *op. cit.*, p. 30.
৯. See, Meyer, *op. cit.*, p. 44.
১০. For a discussion on paradigm, see Md. Abdul Halim, "The Paradigmatic Status of International Relations," in *Journal of International Relations*, Vol. 2, No. 1 (July-December, 1994), pp. 1-19.
১১. See, *Ibid.*, p.14.

১২. Robert O. Keohane, "Theory of World Politics : Structural Realism and Beyond," reprinted in Paul Viotti and Mark Kauppi, *International Relations Theory* (New York : Macmillan Publishing Co., 1987), p. 192.
১৩. Mingst, *op. cit.*, p. 77.
১৪. *Ibid.*
১৫. Keohane, *op. cit.*, p. 194.
১৬. *Ibid.*, p. 199.
১৭. *Ibid.*
১৮. *Ibid.*, pp. 199-200.
১৯. Quoted in *Ibid.*, p. 193.
২০. Quated in Mingst, p. 78.
২১. *Ibid.*
২২. Keohane, *op. cit.*, p. 202.
২৩. *Ibid.*
২৪. *Ibid.*
২৫. *Ibid.*
২৬. *Ibid.*, p. 203.
২৭. Scott Burchill, "Realism and Neo-realism," in Scott Burchill, *et at.*, *Theories of International Relations* (Palgrave, 2nd edition, 2001), p. 93.
২৮. Donnelly, *op. cit.*, p. 31.

Go to Contents
http://thejobstudy.com

http://thejobstudy.com

Job Study
To make you prepared & confident

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মর্গেনথুর বাস্তববাদী তত্ত্ব

REALIST THEORY OF MORGENTHAU

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক হ্যানস মর্গেনথু (Hans J. Morgenthau) ১৯৪৮ সালে তাঁর *Politics Among Nations* নামক বিখ্যাত পুস্তকে বাস্তববাদী তত্ত্বসম্পর্কিত ছয়টি মূলনীতি (Six principles of political realism) প্রকাশ করেন।[১] তিনি বলেন যে, তাঁর এ-ছয়টি মূলনীতিকে অবাস্তব ও বিমূর্ত ধারণার পরিবর্তে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা উচিত। নিম্নে তাঁর মূলনীতিগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

১. মর্গেনথু মনে করেন যে, মানবচরিত্রে গভীরভাবে অন্তর্নিহিত কয়েকটি বস্তুগত বিধি দ্বারা রাজনৈতিক কার্যকলাপসমূহ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সুতরাং সমাজের উন্নতিকল্পে আমাদের প্রথমেই জানা দরকার সেই বিধিগুলো, যেগুলো সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। যেহেতু এ-বিধিগুলো মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দের উপর নির্ভরশীল নয়, সেহেতু এগুলো পরিবর্তন করতে গেলে ব্যর্থতার যথেষ্ট ঝুঁকি থাকে। মর্গেনথু তাঁর বাস্তববাদী তত্ত্বে বলেন যে, রাজনৈতিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে যে-রকম বস্তুগত বিধি প্রযোজ্য, অনুরূপভাবে একটি যুক্তিসঙ্গত তত্ত্ব উন্নয়ন করা সম্ভব, যা ঐ বস্তুগত বিধিগুলোকে প্রতিফলিত করবে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির এরূপ একটি তত্ত্বকে যুক্তি ও অভিজ্ঞতা—এ-দ্বৈত পরীক্ষার (dual test of reason and experience) মাধ্যমে বিচার করতে হবে। বাস্তববাদের ধারণা অনুযায়ী তত্ত্বের প্রধান কাজ হল বাস্তব ঘটনাকে নিরূপণ করা ও যৌক্তিকভাবে তাকে বোঝার চেষ্টা করা। এটা ধরে নেয় যে, কোন দেশের পররাষ্ট্র নীতিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে আমাদের পরীক্ষা করে দেখা দরকার তা কী কী রাজনৈতিক কার্য সম্পাদন করেছে এবং এগুলোর সম্ভাব্য পরিণতি কী হতে পারে। এখানে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার সময় কোন

রাজনীতিকের কাছে অনেকগুলো বিকল্প থাকতে পারে। এরূপ পরিস্থিতিতে দেখা দরকার যে, সবচেয়ে যুক্তিসিদ্ধ বিকল্পটি তিনি বেছে নিতে পারেন কি না। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এ ধরনের যৌক্তিক প্রকল্পগুলো (rational hypothesis) বাস্তব ঘটনাবলি ও তাদের ফলাফলকে পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ দেয় এবং এভাবেই আন্তর্জাতিক রাজনীতির ব্যাপারে একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

২. মর্গেনথুর দ্বিতীয় মূলনীতিকে তাঁর বাস্তববাদী তত্ত্বের চাবিকাঠি বলা যেতে পারে। এখানে তিনি বলেন যে, রাজনৈতিক বাস্তবতা (political realism) যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে, তা হল স্বার্থের ধারণা, যাকে শক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় (conecpt of interest defined in terms of power)। স্বার্থের এ-ধারণাটিই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বাস্তব ঘটনা ও যৌক্তিকতার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। এর মাধ্যমেই আমরা অন্যান্য কার্য যেমন অর্থনীতি, নীতিবিজ্ঞান, ধর্মনীতি ইত্যাদি থেকে রাজনীতিকে একটি স্বতন্ত্র কার্য হিসেবে পৃথক করতে পারি। তাই মর্গেনথুর যুক্তি অনুযায়ী এরূপ একটি ধারণা ছাড়া আন্তর্জাতিক বা অভ্যন্তরীণ কোন রাজনীতি সম্পর্কে তত্ত্ব উন্নয়ন সম্ভব নয়। কারণ স্বার্থই একমাত্র মাপকাঠি যার দ্বারা রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক ঘটনাবলির মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব। মর্গেনথুর বাস্তববাদী তত্ত্বের মূল কথা হল এই যে, এটি আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে দুটি প্রচলিত ভুল ধারণা সম্পর্কে সতর্ক করে দেয় : একটি হল অভিপ্রায়সম্পর্কিত উদ্বেগ ও অন্যটি হল মতবাদের অগ্রাধিকার সম্পর্কিত উদ্বেগ (A realist theory of international politics will guard against two popular fallacies : the concern with motives and the concern with idelogical preferences.)[২]। তিনি মনে করেন যে, কোন রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিকে শুধু অভিপ্রায়ের আলোকে বিচার করা বোকামির নামান্তর। অনুরূপভাবে এটাকে রাজনীতিকদের ব্যক্তিগত মতামতের পছন্দের মাধ্যমেও বিচার করা ঠিক নয়। এগুলোর তুলনায় জাতীয় স্বার্থের ধারণাটি অগ্রাধিকার পারে, কারণ কোন রাষ্ট্রের চিন্তায় ও কাজে সবসময়ই জাতীয় স্বার্থ বাড়িয়ে তোলা দরকার।

৩. বাস্তববাদ মনে করে না যে, স্বার্থের ধারণা, যা শক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়, তার অর্থ সব সময়ই স্থির থাকবে। বাস্তবিকপক্ষে স্বার্থের ধারণাই হল রাজনীতির মূল উপাদান এবং এটা সময় ও স্থানের অবস্থাবিশেষে প্রভাবিত হবে না। এভাবে স্বার্থের বিষয়টি অপরিবর্তিত থাকলেও সে-স্বার্থগুলো কখন কী হবে, তার পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। রাজনৈতিক বাস্তবতা মনে করে না যে, সমসাময়িক অবস্থাবলি যেগুলো অতিশয় অস্থিতিশীল এবং সবসময়ই যেখানে বৃহৎ আকারের আক্রমণের ভীতি বর্তমান—যার মধ্যে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হয়, সেগুলোকে পরিবর্তন করা যাবে না। বাস্তববাদীদের মতে, বর্তমান রাজনৈতিক পৃথিবীকে বিভক্তকারী জাতিরাষ্ট্রগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের বৃহৎ আকারের কতগুলো একক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে পারে। তাঁরা মনে করেন যে, সমসাময়িক বিশ্বের পরিবর্তনে সে-ধরনের শক্তিগুলোই কাজ করবে, যা অতীতে দেখা গেছে।

http://thejobstudy.com

৪. রাজনৈতিক বাস্তববাদ রাজনৈতিক কার্যাবলির নৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে সজাগ। কিন্তু মর্গেনথু মনে করেন যে, সার্বজনীন নৈতিক মূলনীতিগুলোকে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলির ক্ষেত্রে অবিচলভাবে প্রয়োগ নাও করা যেতে পারে। কারণ যদিও কোন ব্যক্তি তার নিজের জন্য বলতে পারে যে, পৃথিবী ধ্বংস হোক, তবু যেন ন্যায়বিচার কায়েম থাকে (*Fiat justitia pereat mundus*—Let justice be done, even if the world perish.)[৩]। কিন্তু রাষ্ট্রের এ-রকম কোন অধিকার নেই, কারণ তাকে সবার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। এ-দিক থেকে বিবেচনা করে তিনি যুক্তি দেখান যে, সার্বিক নৈতিকতাকে বাস্তবতার আলোকে পরিস্রুত করে রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রয়োগ করা উচিত। জাতীয় স্বার্থ রক্ষার খাতিরে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রয়োগকৃত নৈতিকতা ব্যক্তিগত জীবনের নৈতিকতা থেকে ভিন্নতর হতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় যে, জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাহ্য করে ব্যক্তিগত নৈতিকতা ও জাতীয় ক্ষেত্রের নৈতিকতাকে এক করে দেখলে জাতীয় জীবনে অনেক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

৫. রাজনৈতিক বাস্তববাদ কোন একটি বিশেষ জাতির নৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রণকারী নৈতিক বিধিসমূহের সাথে এক করে দেখতে অস্বীকার করে। যদি আমরা নিজেদেরসহ সমস্ত জাতিকে রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে দেখি, যেগুলো স্ব স্ব স্বার্থকে তুলে ধরতে ব্যস্ত, তবে আমরা সবার প্রতি সুবিচারে সক্ষম হব। এটা দুভাবে সম্ভব হতে পারে : আমরা নিজেদেরকে যেভাবে দেখি অন্যদেরকেও সেভাবে দেখব এবং অন্যকে নিজের মতো করে দেখার ফলে আমরা এমন নীতি গ্রহণ করতে সক্ষম হব, যা অপরের স্বার্থকে সম্মান দেখাবে এবং সাথে সাথে আমাদের নিজেদের স্বার্থকেও সংরক্ষণ ও বর্ধিত করবে।

৬. পরিশেষে তিনি বলেন যে, রাজনৈতিক বাস্তবতা ও অন্যান্য চিন্তাধারার মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য যথার্থ এবং সুগভীর। মর্গেনথু তাই তাঁর বাস্তববাদী তত্ত্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক থেকে রাজনৈতিক পরিধিকে তেমনভাবে স্বতন্ত্র রাখার পক্ষপাতী, যেমনভাবে অর্থনীতিবিদ, আইনবিদ ও অন্যেরা নিজেদের ব্যাপারে রেখেছেন। রাজনৈতিক বাস্তববাদ রাজনৈতিক চিন্তাধারা ব্যতীত অন্যান্য উৎকৃষ্ট চিন্তাধারার অস্তিত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে অজ্ঞ নয়। কিন্তু রাজনৈতিক বাস্তববাদী হিসেবে সে অন্যান্য চিন্তাধারাকে—তা যতই উৎকৃষ্ট হোক না কেন—রাজনৈতিক থেকে খাটো করে না দেখে পারে না। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও এর অর্থ এই নয় যে, সে অন্য কার্যাবলিকে অবজ্ঞা করবে। মর্গেনথুর মতে, বাস্তব মানব (real man) হল অর্থনৈতিক মানব, রাজনৈতিক মানব, ধর্মীয় মানব ইত্যাদির যোগফল।

উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মর্গেনথু মনে করেন যে, তাঁর বাস্তববাদী তত্ত্ব আন্তর্জাতিক রাজনীতি যেভাবে আছে এবং যা হওয়া উচিত তা বোঝার ব্যাপারে সাহায্য করে।

মর্গেনথুর বাস্তববাদী তত্ত্বকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করলে আমরা দেখতে পাব যে, তিনি একটি তত্ত্ব প্রণয়নের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে অনেকগুলো বিষয়কে গুলিয়ে

Go to Contents
http://thejobstudy.com

ফেলেছেন। তিনি একদিকে তাঁর তত্ত্বকে বাস্তববাদী বলেছেন এবং অন্যদিকে এর মধ্যে আদর্শগত উপাদানও (normative elements) প্রবেশ করিয়েছেন, কিন্তু এ-দুয়ের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য সম্বন্ধে সঠিকভাবে কোন কিছু বলেননি। এ ছাড়াও তিনি অভিজ্ঞতার আলোকে বাস্তববাদী তত্ত্বকে বিশ্লেষণের পরামর্শ দিলেও অন্য এক জায়গায় বলেছেন যে, রাজনৈতিক বাস্তবতা বিজ্ঞ পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে এমন এক তত্ত্বগত কাঠামো প্রদান করে, অভিজ্ঞতা যাকে কখনও সম্পূর্ণরূপে অর্জন করতে পারে না (Political realism presents the theoretical construct of a rational foreign policy which experience can never completely achieve.)[৪]। তাঁর এ ধরনের যুক্তি প্রদর্শন স্ববিরোধী (self-contradictory) বলে মনে হয়। তিনি যুক্তি দেখান যে, বিজ্ঞ পররাষ্ট্রনীতিই ভালো পররাষ্ট্রনীতি। কারণ শুধু বিজ্ঞ পররাষ্ট্রনীতি কম ঝুঁকি নিয়ে অধিক সুবিধা অর্জন করতে পারে এবং এ-জন্যই এটা পরিণামদর্শিতার নৈতিক শিক্ষা ও সাফল্যের রাজনৈতিক আবশ্যকতা উভয়ের সাথেই সঙ্গতিপূর্ণ (... political realism considers a rational foreign policy to be good foreign policy; for only a rational foreign policy minimizes risks and maximizes benefits and hence complies both with the moral precept of prudence and the political requirements of success.)[৫]। কিন্তু বিজ্ঞ পররাষ্ট্রনীতি কী, এ ব্যাপারে মর্গেনথু কোন পরিষ্কার ব্যাখ্যা দেননি। অধিকন্তু তাঁর এই উক্তি পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট (tautologous)। স্বার্থের দ্বন্দ্ব (confict of interest) সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য সম্পর্কেও এ-কথা সমভাবে প্রযোজ্য।

পাদটীকা

১. Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations : The Stryggle for Power and Peace* (Calcutta : Scientific Book Agency, 1969), pp. 3-14.
২. ঐ, পৃ. ৫।
৩. ঐ, পৃ. ১০।
৪. ঐ, পৃ. ৭।
৫. ঐ।

http://thejobstudy.com

চতুর্দশ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে তত্ত্ব অধ্যায়নে সাম্প্রতিক পরিবর্তনসমূহ

RECENT CHANGES IN THE STUDY OF THEORIES IN INTERANTIONAL REATIONS

বর্তমান গ্রন্থের পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে আমরা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে গত শতাব্দীর ষাটের দশকে শুরু হওয়া আচরণবাদ ও ঐ দশকের শেষের দিকে শুরু হওয়া উত্তর-আচরণবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছি যে ধারা সত্তরের দশকব্যাপী চলতে থাকে। আশির দশকে এসে এক শ্রেণির পণ্ডিত এ উভয় পদ্ধতিকেই সমালোচনা শুরু করেন। যেহেতু আচরণবাদ যে দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তা প্রত্যক্ষবাদ বা দৃষ্টবাদ (positivism) নামে পরিচিত ছিল, তাই সেটাকে পেছনে ফেলে যে নতুন ধারার সূত্রপাত হয় তাকে উত্তর-দৃষ্টবাদ (postpositivism) বলে অভিহিত করা হয় এবং সেটা উত্তর-আধুনিকতাবাদ (postmodernism) হিসেবেও পরিচিতি লাভ করে।

এখানে বলা আবশ্যক যে দৃষ্টবাদ হল একটি দার্শনিক ঐতিহ্য যার মূলে আছে চূড়ান্ত কারণসমূহ অথবা উদ্ভব সম্পর্কিত অনুমানকে বর্জন করে নির্দিষ্টরূপে প্রত্যক্ষকৃত বা সৃষ্ট ঘটনাবলি ও প্রপঞ্চসমূহের আলোকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এগুলোকে বিচার করা। তাই আচরণবাদীগণকে এবং যারা সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশ্বকে বুঝার একটি উপায় হিসেবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে আঁকড়ে ধরেন তাঁদেরকে সচরাচর দৃষ্টবাদী হিসেবে বর্ণনা করা হয়। উত্তর-আধুনিকতাবাদীগণ তাই উত্তর-দৃষ্টবাদমূলক, কারণ তাঁরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তিসমূহকে পুনঃপরীক্ষা করে দেখার আহবান জানান।

সনাতনপন্থী ও আচরণবাদীদের মধ্যকার পূর্বেকার বিতর্কের মত উত্তর-আধুনিকতাবাদ হল মানববিদ্যা সম্পর্কিত গবেষণায় বৃহত্তর আন্দোলনের অংশ যেটি 'বিচারমূলক সামাজিক তত্ত্ব' ('critical social theory'), 'উত্তর-কাঠামোবাদ'

('poststructuralism') অথবা 'বিনির্মাণবাদ' বা 'প্রতিনির্মাণবাদ' ('deconstructionism') ইত্যাদি বিভিন্নভাবে পরিচিত। এ সকল সংশ্লিষ্ট পদ্ধতিতে উত্তর-আধুনিক তাত্ত্বিকগণ বিশ্ব রাজনীতির প্রকৃতি হিসেবে এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যমূলক ভাবমূর্তিকে গ্রহণ করেন এবং তাঁদের ব্যতিক্রমের বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ হিসেবে 'বাস্তবতার সামাজিক গঠন' ('social constuction of reality') প্রচেষ্টায় নিজেদের নিয়োজিত করেন। সার্বিকভাবে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় ও বিশেষত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বের ভিত্তি সম্পর্কে তাঁদের সমালোচনামূলক অন্তর্দর্শনের সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য হল বাস্তবতাকে সত্যিকারভাবে বুঝতে পারার সম্ভাবনার প্রতি সন্দেহজনক মনোভাব পোষণ করা। উত্তর-আধুনিকতাবাদীগণ বিশ্বাস করেন যে আমরা আবিষ্কার করতে পারি এ রকম কোন নৈর্ব্যক্তিক আন্তর্জাতিক বাস্তবতা নেই—এটা সহজাতভাবে ধরাছোঁয়ার বাইরে। সুতরাং গবেষণার উদ্দেশ্য হল যারা এটা বুঝেন বলে অতি দাম্ভিকতার সাথে তর্ক করেন এ প্রতারণামূলক দাবির জন্য তাঁদের মুখোস উন্মোচিত করা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য উত্তর-আধুনিকতাবাদীগণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নকে অনুমোদন করতে অসম্মত হন। এর পরিবর্তে তাঁরা গ্রন্থাদির মূল পাঠ (text), এগুলোর মধ্যকার লুক্কায়িত অর্থ (hidden meaning) এবং বৈশ্বিক বিষয়াবলি যারা ব্যাখ্যা করেন সে রকম সিদ্ধান্ত-প্রণয়নকারী ও বিশ্লেষকদের লেখা, বক্তৃতা ও যুক্তিতর্কসমূহের বয়ান (discourses) অধ্যয়ন করেন। অন্যদের বাণী ও গ্রন্থাদির মূল পাঠসমূহের বিকৃতিগুলো ও ভুল-বর্ণনা ফাঁস করে দিয়ে এবং 'ঘটনাদির বিবরণে' ('stories') যে অলীক ভিত্তি বিদ্যমান তা বিনির্মাণের মাধ্যমে 'বহুবিধ বাস্তবতাসমূহের' ('multiple realities') সহাবস্থানকে শনাক্ত করা উত্তর-আধুনিকতাবাদীদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। এ জন্য বৈশ্বিক বিষয়াবলি সম্পর্কে অধিকতর শ্রেয় ব্যাখ্যা প্রদান করা ও এর উন্নতিবিধানকল্পে তত্ত্ব নির্মাণের সহায়ক উপায়সমূহ শনাক্ত করার পরিবর্তে এ পুঁথিগত সমালোচনার রীতি অন্যদের বিশ্লেষণসমূহের সীমাবদ্ধতা উন্মোচিত করতে (তাঁদের যুক্তিতে বিনির্মাণ) অধিকতর মানানসই।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে বিচারমূলক তত্ত্ব পদ্ধতি যে মুখবন্ধ দিয়ে শুরু হয় তা হল যে কোন একটি তত্ত্ব নির্দিষ্ট একটি সময় ও স্থানের পারিপার্শ্বিকতায় অবস্থান করে; মতাদর্শগত, সাংস্কৃতিক ও সমাজবৈজ্ঞানিক প্রভাবসমূহ দ্বারা তত্ত্ব রূপান্তরিত হয়। এভাবে হয় সনাতন অথবা আচরণবাদী পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে একটি সর্বজনীন তত্ত্ব নির্মাণ সম্ভব নয়। একজন বিচারবাদী তাত্ত্বিক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সিস্টেমের অধীনস্থ সামাজিক শক্তিসমূহ, যেগুলো সর্বদা পরিবর্তনশীল ও যেগুলোর কোন স্থায়ী অর্থ নেই, পরীক্ষা করে দেখেন। তাই বিচারবাদীগণ আন্তর্জাতিক বিন্যাসের উদ্ভব ও পরিবর্তনশীল কাঠামোর সাথে নিজেদেরকে সংশ্লিষ্ট করার মধ্য দিয়ে মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও শক্তিসম্পর্কিত ব্যাপারে আপত্তি তুলেন। তাঁরা তাঁদের জ্ঞানান্বেষণের ব্যাপারে প্রবলভাবে আদর্শবাদী এবং সমাজের আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনা ও বিকল্প ভবিষ্যৎসমূহের ব্যাপ্তি কতটুক তা শনাক্ত করতে চান।

http://thejobstudy.com

উত্তর-আধুনিকতাবাদী পদ্ধতিসমূহ, যেগুলো বিচারমূলক তাত্ত্বিকগণের গবেষণাকর্মের মাধ্যমে উনিশ শত আশির দশকে উন্নীত হয়, সম্পর্কে বলা যায় যে বাস্তবজগৎ থেকে জ্ঞান আহরণকারী আচরণবাদকে বিরোধিতা করা ছাড়া এ পদ্ধতিটি প্রকৃতপক্ষে কি তার কোন যথাযথ সংজ্ঞা এর উদ্যোক্তাগণ প্রদান করেননি। এ অধ্যায়ের প্রথম দিকে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, আচরণবাদীদের সাথে সরাসরি বৈসাদৃশ্যমূলক উত্তর-আধুনিকতাবাদীগণ তর্কের খাতিরে সত্য বলে ধরে নেন যে একক নৈর্ব্যক্তিক বাস্তবতা বলতে কিছু নেই। তাঁরা রাষ্ট্রের পুরো ধারণাটিকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেন, যেটিকে তাঁরা পণ্ডিত ও সাধারণ নাগরিক এ উভয় কর্তৃক কল্পনায় নির্মিত অলীক বস্তু বলে মনে করেন। উত্তর-আধুনিকতাবাদী পণ্ডিতগণ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে রাষ্ট্রসমূহ নিয়মমাফিক করে দেয়া পন্থা অনুসরণ করে চলে না, কিন্তু এগুলো সম্পর্কে যে কাহিনী বলা হয়, যেগুলো গল্পকথকের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিস্রুত হয়ে আমাদের নিকট পৌঁছে, শুধু তার মাধ্যমে জানা যায়। তাই তাঁরা মনে করেন যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বহুবিধ বাস্তবতা বিরাজমান।

বিচারবাদী তাত্ত্বিকগণ ফ্রাঙ্কফুর্ট চিন্তাধারা (Frankfurt school) দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট চিন্তাধারায় বিচারবাদী তত্ত্ব উন্নয়নের সূত্রপাত করেন ম্যাক্স হর্কহাইমার (Max Horkheimer) গত শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের দশকে। হর্কহাইমার কর্তৃক সূচিত এ পদ্ধতিটি মার্কিউজ (Herbert Marcuse), ফ্রমম্ (Erich Fromm), লওয়েনথাল (Leo Lowenthal) এবং অধিকতর সাম্প্রতিকালে হ্যাবারমাসের (Jurgen Habermas) গবেষণাকর্মের মাধ্যমে বিচারবাদী তত্ত্ব নতুন করে শক্তি অর্জন করে, এবং সেটি একটি দার্শনিক প্রতীকরূপে আত্মপ্রকাশ করে অন্তর্নিহিত সমালোচনা পদ্ধতির মাধ্যমে আধুনিক সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন শুরু করে।

প্রধানত কার্ল মার্ক্স (Karl Marx) কর্তৃক উন্নীত ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে (historical materialism) পুনর্গঠিত করার লক্ষ্যে গৃহীত প্রজেক্টের কর্ম পরিচালনায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে হ্যাবারমাস মত প্রকাশ করেন যে মার্ক্সবাদ (Marxism) সামাজিক কাঠামো গঠন ও ঐতিহাসিক পরিবর্তন আনয়নে শ্রমের গুরুত্বকে অতিমাত্রায় মূল্যায়িত করেছে এবং 'আন্তঃক্রিয়ার' ('interaction') ভূমিকাকে উনভাবে মূল্যায়িত করেছে। তিনি বলেন যে উৎপাদনসংক্রান্ত মার্ক্সীয় প্যারাডাইমে (paradigm) মানুষ কিভাবে শৃঙ্খলাপূর্ণ সমাজ সৃষ্টি ও সকল সদস্যের ইচ্ছার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া শেখে এতদ্‌সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি বিবেচনায় নেয়া হয়নি। ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে এভাবে সমালোচনার পর হ্যাবারমাস সেটাকে পুনর্গঠিত করতে যে বিচারবাদী তত্ত্ব উন্নয়ন করেন তা 'নীতিশাস্ত্র বয়ান' ('discourse ethics') অথবা 'নৈতিকতার বয়ান তত্ত্ব' ('the discourse theory of morality')[১] নামে প্রসিদ্ধ।

ফ্রাঙ্কফুর্ট চিন্তাধারা-প্রসূত বিচারবাদের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল সমসাময়িক সমাজের ঐতিহাসিক ও সামাজিক উন্নয়ন উপলব্ধির দ্বারা এর কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্যাবলি আত্মস্থ করা

নিয়ে মাথা ঘামানো এবং বর্তমানে বিরাজমান অসঙ্গতিসমূহ খুঁজে বের করা যেটা সমসাময়িক সমাজের অভ্যন্তরে সৃষ্টির শুরু থেকে অনুষঙ্গ হিসেবে প্রবিষ্ট যে কর্তৃত্বের ব্যাধি ও ধরনসমূহ বিরাজমান সেগুলোকে অতিক্রম করে যাবার সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে। ফ্রাঙ্কফুর্ট চিন্তাধারাকে অনুসরণ করে মানববিদ্যায় যখন বিচারমূলক তত্ত্ব উদ্ভাবন করা হয় তখন তার অভীষ্ট লক্ষ্য ছিল সনাতন পদ্ধতিতে তত্ত্ব-নির্মাণের ধারণাসমূহকে চ্যালেঞ্জ জানানো ও ভেঙে ফেলা এ অনুমিত ধারণার বশবর্তী হয়ে যে শেষোক্ত তত্ত্বসমূহ সূক্ষ্ম উপায়ে সমাজে অবিচার ও কর্তৃত্ব বজায় রেখে মানব স্বাধীনতা পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়নের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

উত্তর-আধুনিকতাবাদীগণ ফরাসি সামাজিক তাত্ত্বিক, যথা ফুকো (Michel Foucault), দেরিদা (Jacques Derrida), ডেরিয়ান (Der Derian), প্রমুখকে অনুসরণ করে 'আমূল সংস্কারমূলক ব্যাখ্যাদানের' ('radical interpretism') প্রচেষ্টা চালান। যেহেতু "সহিংসতা, অসমতা, অন্তর্ভুক্তিতে বাধাদান, দুর্ভিক্ষ, ও এর ফলাফল স্বরূপ উদ্ভূত অর্থনৈতিক নিষ্পেষণ এ ধরিত্রী ও মানবতার ইতিহাসে পূর্বে কখনও এত অধিক সংখ্যক মানুষকে ছোবল মারেনি" ("violence, inequality, exclusion, famine, and thus economic oppession [have never] affected as many human beings in the history of the Earth and of humanity.")[২], যা নেতৃস্থানীয় উত্তর-কাঠামোবাদী লেখক দেরিদাকে একটি 'নতুন আন্তর্জাতিক' ('new international,' মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে)-এর সমর্থনে ওকালতি করতে প্ররোচিত করে।

দু'শতাব্দীরও অধিককাল পূর্বে দার্শনিক কান্ট (Immanuel Kant) যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিরেন যে "শক্তির উপর দখল অবশ্যম্ভাবীভাবে স্বাধীনভাবে যুক্তিসহকারে বিচারের বিষয়টিকে কলুষিত করে" ("the possession of power inevitably corrupts the free judgment of reason"),[৩] তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ফুকো জানতে চান যে জ্ঞান (knowldege) ও শক্তির মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে কিনা এবং শেষ পর্যন্ত দেখতে পান যে "শক্তি ও জ্ঞান পরস্পরের পৃষ্ঠপোষক; এ দুটো সরাসরিভাবে একে অন্যকে নির্দেশিত করে" ("Power and knowledge are mutually supportive; they directly imply one another [sic].")।[৪] আরও অনেক দূর অগ্রসর হয়ে তিনি অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে আধুনিক বিশ্বে শক্তির প্রয়োগ সার্বিকভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব স্থাপনে সহায়ক। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উত্তর-আধুনিকতাবাদী তাত্ত্বিকগণ বিচারমূলক তত্ত্ব নির্মাণের কাজে ফুকোর এ অনুসিদ্ধান্তটি প্রয়োগ করে থাকেন।

ডেরিয়ান যুক্তি দেখান যে উত্তর-আধুনিকতাবাদ "শক্তির রাজনীতির পেছনকার গ্রন্থাদির মূল পাঠগত আন্তঃরাজনীতির খেলা" ("texual interplay behind power politics.")[৫] জনসমক্ষে প্রকাশ করার বিষয় নিয়ে মাথা ঘামান। এটি করতে গিয়ে উত্তর-আধুনিকতাবাদ যে রণকৌশল অবলম্বন করে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল বিনির্মাণ।

http://thejobstudy.com

মোটের উপর, দেরিদা, ফুকো, ডেরিয়ান ও লয়তার্দ (Jean-Francois Lyotard)-এর মতো পণ্ডিতগণ তাঁদের লেখার মাধ্যমে এরূপ প্রচলিত চিন্তা-ভাবনাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যে ইউরোপে অন্ধকার যুগের কুসংস্কারাদি থেকে মুক্ত আলোকপ্রাপ্ত জ্ঞানচর্চার (European Enlightenment) ধারা যে পূর্বানুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত তা হল "আধুনিকতা সরল রৈখিক ও প্রগতিশীল" ("modernity is linear and progressive")[৬], উত্তর-আধুনিকতাবাদী তত্ত্বকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যান। তবু ফ্রাঙ্কফুট চিন্তাধারা এবং এ ধারার অনুসারী উপরে-উল্লেখিত উত্তর-আধুনিকতাবাদীগণ আধুনিক বিশ্বের সমালোচনায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে তাঁদের আলোচ্যসূচিতে স্থান দেননি এবং সাম্প্রতিককালের পূর্ব পর্যন্ত একমাত্র হ্যাবারমাস এ বিষয়ে শুধু অপর্যাপ্ত প্রসঙ্গ টেনেছেন।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তর-আধুনিকতাবাদী বিশ্লেষকদের করণীয় কাজ দ্বিবিধ : এ অধীতব্য বিষয়টির মৌলিক ধারণাসমূহকে প্রতিনির্মাণ করা এবং এগুলোকে বহুবিধ বাস্তবতা দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা। রাষ্ট্র, জাতি, জাতীয়তা, বাস্তববাদ ইত্যাদি প্রধান ধারণাসমূহকে প্রতিনির্মাণ বা বিনির্মাণের অর্থ হল গ্রন্থাদির মূল পাঠে (অথবা উৎসসমূহে) লুক্কায়িত অর্থসমূহ খোঁজ করা যেগুলো পাওয়া যেতে পারে এর বাহ্যিক অবয়ব, সহপাঠ (subtext) ইত্যাদির তলায়। একবার যদি এ লুক্কায়িত অর্থসমূহ উদ্ঘাটিত করা যায় তবে এরপর উত্তর-আধুনিকতাবাদীগণ বিশৃঙ্খলা দ্বারা একদা-সুশৃঙ্খল দৃশ্য এবং বহুমুখী প্রাঞ্জল বর্ণনা দ্বারা দ্বিবিভাজনকে প্রতিস্থাপনের উপায় অবলম্বন করতে পারেন।

উত্তর-আধুনিকতাবাদী গবেষকগণ যে কেন্দ্রীয় ধারণাসমূহকে বিনির্মাণ ও সেগুলোকে বহুমুখী অর্থসমূহ দ্বারা প্রতিস্থাপনের কাজ শুরু করেছেন তার দুটো উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। প্রথমত, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সিনথিয়া ওয়েবার (Cynthia Weber) যুক্তি দেখান যে সার্বভৌমিত্ব (রাষ্ট্রের স্বাধীনতা) হয় সু-সংজ্ঞায়িত নয় সঙ্গতিপূর্ণভাবে ভিত্তিস্থিত এ দুটোর কোনটাই সত্যি নয়। সার্বভৌমত্বের বাহ্যিক অবয়বের তলদেশ খনন করে অর্থাৎ সনাতন দার্শনিকদের মূল্যায়ন অতিক্রম করে তিনি আবিষ্কার করেন যে বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক কোন বিশেষ মুহূর্তের জরুরি রাজনৈতিক প্রয়োজন ও তাদের অনুমোদনের উপর প্রতিষ্ঠিত সার্বভৌমত্বের ধারণা-গঠন অবিরতভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। সার্বভৌমত্বের বহুমুখী অর্থসমূহ যা দ্বারা প্রয়োজনীয় অবস্থায় রূপায়িত হচ্ছে তা হল সময়, স্থান ও ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে তত্ত্ব ও চর্চার জন্য তাঁর এ বিশ্লেষণের, যেটির মূলদেশ গ্রথিত আছে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও গৃহীত প্রথাসমূহ যেগুলো সার্বভৌমত্বকে পুনরায় বলবৎ করে সেগুলোর মধ্যে, গভীর তাৎপর্য আছে। এটা রীতিগত অর্থাৎ গতানুগতিক ধারণাসমূহকে চ্যালেঞ্জ জানায়।[৭]

দ্বিতীয়ত, ওয়েবার যেভাবে কেন্দ্রীয় ধারণাসমূহকে চ্যালেঞ্জ জানান (বিনির্মাণের কাজে নিয়োজিত), ঠিক তেমনি নারীবাদী (feminist) রাজনৈতিক তাত্ত্বিক ক্রিস্টিন সিলভেস্টার (Christine Sylvester) একটি বৃহদাকার উত্তর-আধুনিকতাবাদী

Go to Contents
http://thejobstudy.com

করণীয় কার্যের দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলে নেন : নারীদেরকে অংশরূপে গণ্য করাকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তত্ত্বের সমালোচনা করা। দ্বান্দ্বিকতামূলক (dialectical) যুক্তি ব্যবহার করে তিনি প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পান যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে মতাদি প্রকাশের অধিকারী প্রভাবশালী দলগুলোর মধ্যে অবশ্যই আলাপ-আলোচনা ও মত-বিনিময়ের ব্যবস্থা থাকা দরকার যেখানে পাশ্চাত্যের দেশসমূহের শ্বেত গাত্রবর্ণের পুরুষদের পাশাপাশি ভোটাধিকার-বঞ্চিত ও প্রান্তীয় অবস্থায় ঠেলে দেয়া নারী এবং অশ্বেতকায় জাতিসমূহের জনগণ অংশগ্রহণ করবে। তিনি অধীতব্য বিষয়টিতে তত্ত্বীয় মত-বিনিময়কে সহজতর করার উদ্দেশ্যে সহযোগিতামূলক আলাপ-আলোচনার একটি পদ্ধতি খুঁজে বের করার প্রস্তাব রাখেন। সিলভেস্টারের মতে, যদি এ ধরনের আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় তবে অন্যদের (অর্থাৎ যারা সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়ার বাইরে অবস্থিত) অভিজ্ঞতাসমূহও বিচার করে দেখার সুযোগ ঘটবে।

একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে সিলভেস্টার তাঁর বিচারমূলক পদ্ধতি পেশ করেন। সেটি হল *গ্রীনহাম কমন পিস ক্যাম্প (Greenham Common Peace Camp)* সম্পর্কে বিবরণ। এ ক্যাম্পটি ছিল প্রধানত নারীদের একটি গ্রুপ যারা উনিশ শত আশির দশকের প্রথমদিকে একটি ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েনের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ওয়েলসে (Wales) তাদের ঘরবাড়ি ও প্রতিবেশীদের ছেড়ে একশ মাইলেরও বেশি পথ পায়ে হেঁটে গিয়ে সে ঘাঁটিতিতে জমায়েত হন। যদিও প্রচার মাধ্যমগুলো এ পদযাত্রাকারীদের ইচ্ছাকৃতভাবে অগ্রাহ্য করে এবং এভাবে তাদেরকে স্বীয় মত প্রকাশে অক্ষম বলে গণ্য করা হয়েছিল—তারা প্রতিরোধের রাজনীতি বজায় রাখে এবং ক্যাম্পের নিকটবর্তী স্থানের অন্যান্য রাজনৈতিক সক্রিয় গ্রুপগুলোকে রিক্রুট করে ও ঘাঁটিতে নিযুক্ত সেনাবাহিনীর সদস্যদের বিজড়িত করে। ১৯৮৭ সনের ডিসেম্বর মাসে যখন মাঝারিপাল্লার পারমাণবিক অস্ত্রচুক্তি (Intermediate-range Nuclear Force Treaty, সংক্ষেপে INF Treaty) স্বাক্ষরিত হবার পর এ ক্ষেপণাস্ত্রসমূহকে ভেঙে ফেলার জন্য সরিয়ে নেয়া হয়, এখন ঐ নারীরা আরেকটি প্রতিবাদস্থলে চলে যায়, এবং এভাবে তারা পারমাণবিক যুগে ব্রিটেনের ভূমিকা সম্পর্কে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[৮]

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে নারীবাদী পদ্ধতিসমূহ তাদের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যসূচক ফোকাস ও এজেন্ডা উদ্ভাবন করে, বিশেষভাবে সবার দৃষ্টিগোচর করতে যে পুরুষ জাতি নিজেদের আধিপত্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য এ অধীতব্য বিষয়টিতে শক্তি ও জ্ঞানতত্ত্বকে কী পরিমাণে বিকৃত করছে তা প্রমাণ করতে যার পুনর্বিচারপূর্বক সংশোধন আবশ্যক।

বিচারমূলক আন্তর্জাতিক তত্ত্ব সত্তা সম্পর্কিত মতবাদ (ontology) ও জ্ঞানতত্ত্বমূলক (epistemological) প্রশ্নাবলির উপর গুরুত্বারোপ করার ব্যাপারে আদর্শবাদী চিন্তাধারার আশ্রয় নিতে যে স্বার্থ দ্বারা চালিত তা হল বন্ধন-মুক্তি (emancipation)। এ তাত্ত্বিকগণ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গুণগত পরিবর্তনের সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখতে চান যাতে সার্বজনীন স্বাধীনতা ও সমতা অর্জনের পথে বিরাজমান অপ্রয়োজনীয় প্রতিবন্ধকতাসমূহ অপসারিত করা যায়।

http://thejobstudy.com

বিচারমূলক তাত্ত্বিকগণ কেন সত্তা বিষয়ক প্রশ্নাবলির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন তা বুঝতে কক্সের (Robert W. Cox) যুক্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন যে, "যে কোন গবেষণার শুরুতেই থাকে সত্তা সম্পর্কিত মতবাদ। নির্দিষ্ট মৌলিক অপরিহার্য কাঠামো যা কোন প্রকার অর্থবহ অস্তিত্বশীল বস্তুসমূহের গঠনের সাথে জড়িত, এবং তাদের মধ্যকার তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্কসমূহের ধরন সম্পর্কে পূর্বধারণা ছাড়া আমরা বিশ্ব রাজনীতির কোন সমস্যাকে সংজ্ঞায়িত করতে পারি না।" ("ontology lies at the beginning of an enquiry. We cannot define a problem in global politics withont presupposing a certain basic structure consisting of the significant kinds of entities involved and the form of significant relationships among them.")[৯]। সকল তত্ত্বের কোন না কোন প্রকার সত্তা সম্পর্কিত মতবাদমূলক ভিত্তি থাকে কারণ সত্তা হল "কিভাবে রাজনৈতিক কর্মকবৃন্দ রাজনৈতিক বিশ্বকে নির্মাণ ও এর অভীষ্টসাধনের ক্ষমতা সম্পর্কে কল্পনা করে" ("how political actors construct the political world and imagine its purposes")[১০] তা মনোযোগের সাথে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখা।

সত্তাসংক্রান্ত প্রশ্নসমূহ শুধু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রাসঙ্গিক নিমিত্ত ও কাঠামোসমূহ শনাক্তকরণ ও বিশ্লেষণ নিয়েই যে উদ্বিগ্ন থাকে তাই নয়, একই সাথে এগুলো কর্তৃত্ব ও বর্জনের মত বিভিন্ন রকমের দুষ্কর্মের ঐতিহাসিক রূপান্তর কীভাবে হল এবং এ ব্যাপারগুলো সঙ্ঘটিত করতে ঐ নিমিত্ত ও কাঠামো কতটুকু সহযোগিতা করেছে তাও জনসমক্ষে প্রকাশ করে।

জ্ঞানতত্ত্বমূলক প্রশ্নসমূহ সম্পর্কে বলা যায় যে এগুলোর কাজ হল জ্ঞানসম্পর্কিত দাবির ন্যায্যতা প্রতিপাদন ও সত্যতা যাচাই করা। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বে জ্ঞানতত্ত্বমূলক প্রশ্নাবলি যে বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করে তা হল জ্ঞান কীভাবে সৃষ্টি করা যায়। এ অধীতব্য বিষয়টিতে জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোন তত্ত্বকে মূল্যায়ন করা একটি কঠিন কাজ, কারণ এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত থাকে, যেমন উঁচু পর্যায়ে বিমূর্তকরণ, স্বাতন্ত্র্যসূচক, বাস্তব ও অভিনব জ্ঞান অর্জিত হয়েছে কিনা তা নিরূপণ করা, ইত্যাদি।

সত্তাসংক্রান্ত ও জ্ঞানতত্ত্বমূলক প্রশ্নাবলি পরস্পরের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। প্রথমোক্তটির জিজ্ঞাস্য থাকে 'জ্ঞেয় বাস্তবতা কি' ('what is a knowable reality') যেটা নির্ভর করে তাত্ত্বিক কী জ্ঞানতাত্ত্বিক মনোভাব পোষণ করেন তার উপর। অন্যদিকে, জ্ঞানতাত্ত্বিক মনোভাব পোষণ নির্ভর করে তাত্ত্বিক যে সত্তাসংক্রান্ত অবস্থান গ্রহণ করেন যে 'কোনটি থেকে জানতে হবে' ('from which to know')" তার উপর।

এ বিকল্প বিচারবাদ স্পষ্টতই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে নতুন বলিষ্ঠতা যোগ করেছে। এটা মৌলিক প্রশ্নাবলিতে প্রত্যার্পন করতে প্ররোচিত করেছে যার মধ্যে রাষ্ট্রের প্রকৃতি এবং সার্বভৌমত্ব ও নাগরিকতার ধারণা অন্তর্ভুক্ত। পূর্বে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে অনুসৃত পদ্ধতিগুলো যে বিষয়াবলি, যেমন জেন্ডার (gender), ও গাত্রবর্ণসূত্রে

প্রাপ্ত জাতিকুলের (ethnicity) ভূমিকা বহুলাংশে অনুপস্থিত ছিল, কিন্তু এখন নতুন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহের দ্বার গবেষণা চালানোর জন্য উন্মুক্ত হয়েছে। নতুন গবেষণা পদ্ধতিসমূহ প্রচলিত হয়েছে যেগুলো গ্রন্থাদির মূল পাঠ, লিখিত বাণীসমূহ (written words) ও লুক্কায়িত অর্থসমূহের উপর গুরুত্বারোপ করে এরূপ বয়ান বিশ্লেষণকে (discourse analysis) উৎসাহিত করে। গবেষকগণ বিভিন্ন গ্রন্থাদির মূল পাঠের প্রতিও মনোযোগ দিচ্ছেন যেখানে তাঁরা শুধু পেশাদার ব্যক্তিদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখাসমূহই নয়, সেই সাথে সাধারণ ব্যক্তিদের জীবন-কাহিনীর পুঙ্খাপুঙ্খ বক্তব্যসমূহ নিজেদের জবানিতে বলা, যেমন গ্রীনহাম কমন ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী নারীদের কথাও পরীক্ষা করে দেখেন।

উত্তর-আধুনিকতাবাদী গবেষণাসমূহ যতই বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানচর্চার প্রাণচাঞ্চল্যকে পুনরুজ্জীবিত করুক না কেন, কতগুলো কারণে এ বিকল্প পদ্ধতিসমূহ ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে। প্রথমত, নৈর্ব্যক্তিক বাস্তবতা ছাড়া সত্যের অস্তিত্ব থাকতে পারে না; কোন প্রশ্নেরই একেবারে 'নির্ভুল' ও 'ভুল' জবাব হতে পারে না—যেটা সম্ভব তা হল ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি। কোন গ্রন্থের নির্ভরযোগ্য মূল পাঠ না থাকলে সকল পাঠকে সমানভাবে আইনগত বৈধ বলতে হবে। সনাতনপন্থী ও আচরণবাদী উভয়ের জন্যই এ উক্তিসমূহের (propositions) প্রত্যেকটিই অসুবিধা সৃষ্টি করে। এখানে প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় যে কোন বিশেষ তত্ত্বের আইনগত বৈধতা নির্ধারণ করতে গেলে কী কী বিচারের মানদণ্ড ব্যবহার করা হবে। এ ধরনের সর্বজনস্বীকৃত বিচারের মানদণ্ড নেই বিধায় পণ্ডিত বা ছাত্র, সিদ্ধান্ত-প্রণেতা বা ভাড়াটে লেখক, পেশাজীবী অথবা নবদীক্ষিত ব্যক্তি, প্রত্যেকেরই সমানভাবে গ্রহণযোগ্য বহুবিধ বাস্তবতা আছে। জটিলতা দ্বারা সরলতা প্রতিস্থাপিত হয়েছে, কিন্তু বিকল্প পদ্ধতিসসমূহের অসংখ্য সমালোচকের মতে, এ জটিলতা অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার নামান্তর মাত্র।[১২]

দ্বিতীয়ত, উত্তর-আধুনিকতাবাদীদের অন্যতম প্রতিভূ নারীবাদী তাত্ত্বিক, যেমন সিলভেস্টারের গবেষণায় কোন একটি বিশেষ কেইসে নারীদের অবস্থান গ্রহণের ফলে মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে বলা হলেও তা দ্বারা সাধারণীকরণ (generalization) করা যায় না। ইতিহাসে প্রমাণ আছে যে নারীরা ক্ষমতায় গেলে স্বৈরতান্ত্রিক ও নিষ্ঠুর মনোভাবের পরিচয় দেন।

তৃতীয়ত, উত্তর-আধুনিকতাবাদীগণ মূলধারার গবেষণাসমূহকে প্রত্যাখ্যান করতে যে মিথ্যা প্রমাণযোগ্যতার (falsifiability) আশ্রয় নেন সেটাকে কার্ল পপারের (Karl Popper) ভাষায় সাদাসিধা (naive) ও যুক্তিতর্কবহির্ভূত বদ্ধমূল ধারণাপ্রসূত (dogmatic) বলা যায়।[১৩] যদি তাঁরা একান্তই তাঁদের পূর্বসূরীদের অবদানসমূহকে যথার্থভাবে অস্বীকার করতে চান তবে তাঁদের উচিত ল্যাকাটোস (Imre Lakatos) প্রদত্ত গবেষণা কার্যক্রম (research programme) অনুসরণ করা, নিদেনপক্ষে পপারের বুদ্ধিবৃত্তিক (sophisticated) ও পদ্ধতিগত (methodological) উপায় অবলম্বন করা।[১৪]

http://thejobstudy.com

পাদটীকা

১. Andrew Linklater, "Marxism," in Scott Burchill, *et al.*, *Theories of International Relations* (Palgrave, 2nd edition, 2001), p. 146.
২. Quoted in *Ibid.*, p. 149.
৩. Richard Devetak, "Postmodernism," in *Ibid.*, p. 182.
৪. *Ibid.*
৫. *Ibid.*, p. 186.
৬. Scott Burchill, "Introduction," in *Ibid.*, p. 25.
৭. Karen Mingst, *Essentials of International Relations* (New York : W. W. Norton & Co., 1999), p. 13.
৮. *Ibid.*, pp. 13-14.
৯. Burchill, *op. cit.*, p. 17.
১০. *Ibid.*
১১. Jacqui True, "Feminism," in Burchill, *et al.*, *op. cit.*, p. 257.
১২. Mingst, *op. cit.*, p. 14.
১৩. See, Imre Lakatos, "Falsification and the Methodology of Scientific Research Programme," in Imre Lakatos and Alan Musgrave (eds.), *Criticism and the Growth of Knowledge* (London : Cambridge University Press, 1970), pp. 91-95, 102-103, 108-109, 116-117 and 124-126.
১৪. *Ibid.*, especially p. 116.

Go to Contents
http://thejobstudy.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

ক্রীড়াতত্ত্ব

GAME THEORY

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা প্রায়শ দেখতে পাই যে, দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র পরস্পরবিরোধী স্বার্থ নিয়ে একে অপরের সম্মুখীন হয়। এ-রকম অবস্থায় নিজ স্বার্থকে যতটুকু সম্ভব বেশি পরিমাণে পূরণ করার জন্য একটি রাষ্ট্র যে-কর্মপন্থা গ্রহণ করবে, তা অনেকটাই নির্ভর করবে অপর রাষ্ট্রটি অনুরূপভাবে তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে-কর্মপন্থা গ্রহণ করবে, তার উপর। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে উদ্ভূত এ-ধরনের পরিস্থিতি দ্বন্দ্ব পরিস্থিতি (conflict situation) হিসেবে পরিচিত। এ-রকম দ্বন্দ্ব পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলো কীভাবে নিজ নিজ স্বার্থকে সর্বাধিক মাত্রায় আদায় করার জন্য তার ব্যবহারযোগ্য বিকল্পগুলো থেকে সর্বোত্তম বিকল্পটিকে কর্মপন্থা হিসেবে মনোনীত করবে, সে-ব্যাপারে ধারণা দেবার জন্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কে যে-তত্ত্ব উন্নয়ন করা হয়েছে, তাই ক্রীড়াতত্ত্ব নামে খ্যাত। এখানে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, দ্বন্দ্ব পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেবার সময় প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই তার বিরোধীপক্ষ কী সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে, সে-বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখে। কারণ নিজ কর্মপন্থা তার জন্য যে-ফলাফল (pay-off) বয়ে আনবে, তা অনেকটা নির্ভর করবে তার বিরোধীপক্ষের গৃহীত কর্মপন্থার উপর।

ক্রীড়াতত্ত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিবার (Robert J. Lieber) বলেন, "আন্তর্জাতিক রাজনীতির দরকষাকষি এবং দ্বন্দ্বের বিশেষ বিশ্লেষণই ক্রীড়াতত্ত্ব' (Game theory is a special kind of analysis of bargaining and conflict of international politics.)[১]। নিউম্যান (John von Neuman) ও মর্গেনস্টার্ন (Oscar Morgenstern)-এর মতে, 'ক্রীড়াতত্ত্ব হল দ্বন্দ্ব এবং প্রতিযোগিতাপূর্ণ

http://thejobstudy.com

পরিস্থিতিতে, যেখানে প্রত্যেক প্রতিযোগীই নিজের লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করতে সচেষ্ট হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে, সেই যৌক্তিক সিদ্ধান্তের কৌশল সম্বন্ধে চিন্তারাজি' (Game theory is a body of thought dealing with rational decision strategies in situations of conflict and competition. when each participant or player seeks to maximize gains and minimize loss.)[২]।

মিলার (T.B. Millar)-এর বক্তব্য অনুসারে, 'কোন্ পরিকল্পনা উভয়ের স্বার্থের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অধিক সন্তোষজনক ফল প্রদান করবে, সে-সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অভিপ্রায়ে অল্পসংখ্যক রাষ্ট্রের স্বার্থের দ্বন্দ্ব অথবা প্রতিযোগিতা এবং পরিকল্পনাকে গাণিতিক আকার দান করার একটি উপায় হল ক্রীড়াতত্ত্ব। অর্থাৎ কোন্ নীতি অধিকতর যৌক্তিক হবে তা দেখিয়ে একটি দেশের আচরণ (পররাষ্ট্রনীতি) সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করার এটা একটি প্রচেষ্টা। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক ও তাত্ত্বিক অধ্যয়নে এটা পথ প্রদর্শকের কাজ করে' (It [game theory] is a way of putting into mathematical form the conflict or competition of interests and strategies between a small number of 'players' (i. e., nations) in order to deduce which strategy will yield the result most satisfactory to each one's interest. It is thus an attempt at making predictions about the behaviour (the foreign policy) of a country by showing which policy would be most rational, it gives a guide to the scientific and theoretical study of international relations.)[৩]।

উক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, ক্রীড়াতত্ত্বের মৌলিক ধারণা একটি বিশেষ ধরনের যৌক্তিকতার উপর নির্ভরশীল এবং এ-যৌক্তিকতার ভিত্তিতেই ক্রীড়াতত্ত্ব যে-কোন দ্বন্দ্ব পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে।

ক্রীড়া বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। খেলোয়াড়ের সংখ্যার দিক থেকে দেখতে গেলে সাধারণত এটা দু ধরনের হতে পারে। যথা, দু ব্যক্তির মধ্যে খেলা ও অনির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে (n-person) খেলা। আবার প্রাপ্য ফলাফল অনুযায়ীও এটা দু ধরনের হতে পারে, যথা, শূন্য-ফলাফল (zero-sum) খেলা ও পরিবর্তনশীল-ফলাফল (variable-sum) খেলা। যে-খেলায় খেলোয়াড়দের প্রাপ্য ফলাফলের যোগফল শূন্য, সেটি শূন্য-ফলাফল খেলা নামে পরিচিত। আর যেখানে তাদের প্রাপ্য ফলাফল, খেলার সময় তারা যে-কৌশল অবলম্বন করে তার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়—যেখানে তারা সবাই একযোগে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্তও হতে পারে—সেটি পরিবর্তনশীল-ফলাফল খেলা হিসেবে পরিগণিত। এভাবেই আমরা নিচের ছক অনুযায়ী চার ধরনের ক্রীড়ার নমুনা পেতে পারি।

প্রাপ্য ফলাফলের প্রকারভেদ

খেলোয়াড়ের সংখ্যা	শূন্য-ফলাফল খেলা	পরিবর্তনশীল-ফলাফল খেলা
দু ব্যক্তি	দু ব্যক্তির মধ্যে শূন্য-ফলাফল খেলা (উদাহরণ : দাবা, দু-ব্যক্তির মধ্যে পোকার ইত্যাদি)	দু ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তনশীল-ফলাফল খেলা (উদাহরণ : যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা)
অনির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি	অনির্দিষ্টসংখ্যক ব্যক্তি মধ্যে শূন্য-ফলাফল খেলা (উদাহরণ : বহু সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে পোকার, তিন ব্যক্তির লড়াই ইত্যাদি)	অনির্দিষ্টসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তনশীল-ফলাফল খেলা (উদাহরণ : যুক্তরাষ্ট্র, সেভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা)

১ নম্বর চিত্র : চার ধরনের ক্রীড়ার নমুনা
উৎস : Lieber, *op. cit.*, p. 21

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে শূন্য ফলাফল ক্রীড়ার উদাহরণ হিসেবে সাম্রাজ্যবাদ, সনাতন যুগের যুদ্ধ, ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। পরিবর্তনশীল-ফলাফল ক্রীড়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অস্ত্র প্রতিযোগিতা। এ ছাড়াও, উভয়পক্ষই একযোগে লাভবান অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিনা সেদিক দিয়ে বিচার করলে আমরা ধনাত্মক-ফলাফল ক্রীড়া (positive-sum game) ও ঋণাত্মক-ফলাফল ক্রীড়া (negative-sum game) এ দু রকম শ্রেণিবিভাগ পেতে পারি। প্রথমোক্তটির উদাহরণ হিসেবে বৈদেশিক সাহায্য, যেখানে সঠিক নীতি অবলম্বন করলে দাতা (donor) ও গৃহীতা (recipient) উভয়ই উপকৃত হতে পারে এবং আন্তর্জাতিক সংহতি, যেখানে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রই লাভবান হবার জন্য এরূপ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে থাকে, উল্লেখ করতে পারি। আর শেষোক্তটির অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে আধুনিক কালের যুদ্ধ, বিশেষত যেখানে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের ভীতি থাকে। এ ব্যাপারে পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশ্ব কমিশনের রিপোর্টে যথার্থই বলা হয়েছে যে 'পারমাণবিক যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না বিধায় কখনও এরূপ যুদ্ধ বাঁধানো উচিত নয়" ("a nuclear war cannot be won and [hence] must never [should] be fought")।[৪]

যদিও গাণিতিক দিক থেকে বিচার করতে গেলে অনির্দিষ্টসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তনশীল-ফলাফল খেলাই ক্রীড়াতত্ত্বের আদর্শ মডেল হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত জটিলতার জন্য এটা কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দিক থেকে দেখতে গেলে দু ব্যক্তির মধ্যে অনুষ্ঠিত পরিবর্তনশীল-ফলাফল খেলা, বিশেষত চিকেন মডেল ও কয়েদিদের উভয়-সংকট মডেলই অধিক বাস্তবসম্মত ও সম্ভাবনাময় এবং সে-জন্য আমরা এখন এ-দুটো সম্পর্কেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

http://thejobstudy.com

ক্রীড়াতত্ত্বের 'চিকেন মডেল' ('Chicken Model' of game theory)

ক্রীড়াতত্ত্বের 'চিকেন মডেল' ক্রীড়াতত্ত্বের two person variable-sum game-এর একটি বিশেষ দিক। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পৌরাণিকীতে এ-খেলার প্রচলন প্রথম লক্ষ করা যায়। এ-খেলার বর্ণনায় ধরা হয়ে থাকে যে, একটি সরু রাস্তা (যেখানে অতি সাবধানে দুটি গাড়ি পরস্পরকে অতিক্রম করতে পারে) দিয়ে দুজন কিশোর (teenager) দুটি গাড়ি (automobile) নিয়ে প্রচণ্ড বেগে বিপরীত দিক থেকে পরস্পরের দিকে ছুটে আসছে। এ-ভয়াবহ অবস্থায় প্রত্যেকের সামনের দুটি বিকল্প খোলা থাকে—হয় একপাশে সরে পড়া অথবা সরে না পড়া। কিন্তু যে প্রথমে সরে পড়বে, সে 'চিকেনে' (chicken) পরিণত হবে। আর যে সরে না পড়ে সোজা গাড়ি চালিয়ে যাবে, সে বীর (hero) হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে।

খেলোয়াড় দুজনকে A এবং B দ্বারা চিহ্নিত করা যাক। যেহেতু প্রত্যেকের দুটি করে বিকল্প (alternative) আছে, সুতরাং এ-খেলার সম্ভাব্য ফলাফল চার রকমের হতে পারে। খেলোয়াড় A-র দুটি বিকল্পের একটি হচ্ছে সরে পড়া, যেটিকে a_1 দ্বারা চিহ্নিত করা যায়; অপর বিকল্পটি অর্থাৎ সরে না পড়াকে a_2 দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। অনুরূপভাবে B-র সরে পড়া b_1 দ্বারা চিহ্নিত হবে এবং B-র সরে না পড়া b_2 দ্বারা চিহ্নিত হবে। উক্ত বিবরণকে একটি 'প্রাপ্য ফলাফল সূচি'-র (pay-off matrix) মাধ্যমে প্রকাশ করা হল (২ নম্বর চিত্র দ্রষ্টব্য)। প্রাপ্য ফলাফল সূচির প্রত্যেকটি ঘর সম্ভাব্য চারটি ফলাফলের প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে নির্দেশ করছে। A-র প্রাপ্য ফলাফলকে প্রত্যেক ঘরের নিচে বাম কোনায় এবং B-র প্রাপ্য ফলাফল প্রত্যেক ঘরের উপরে ডান কোনায় দেখানো হয়েছে। এখন সম্ভাব্য চারটি ফলাফল হচ্ছে :

১. a_1b_1 অর্থাৎ উভয়েই সরে পড়া। এখানে কেউ লাভবানও হচ্ছে না, আবার ক্ষতিরও সম্মুখীন হচ্ছে না। সুতরাং প্রত্যেকের প্রাপ্য ফলাফলের মান শূন্য (ধরা হয়েছে)।

২. a_1b_2 অর্থাৎ A সরে পড়ছে কিন্তু B সরছে না। এখানে A চিকেনে পরিণত হচ্ছে এবং এই ক্ষতির জন্য তার প্রাপ্য ফলাফল হচ্ছে—১০ এবং বীর হিসেবে স্বীকৃতি লাভের জন্য B-র প্রাপ্য ফলাফল হচ্ছে + ১০ (ধরা হয়েছে)।

৩. a_2b_1 অর্থাৎ A সরে পড়ছে না এবং B সরে পড়ছে। এখানে B চিকেনে পরিণত হওয়ায় তার প্রাপ্য ফলাফল হচ্ছে—১০ এবং A বীর হিসেবে পরিগণিত হওয়ায় তার প্রাপ্য ফলাফল হচ্ছে + ১০।

৪. a_2b_2 অর্থাৎ কেউই সরে পড়ছে না; যার ফলে উভয়েই মুখোমুখি সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। এ-ক্ষেত্রে উভয়েরই প্রাপ্য ফলাফল হচ্ছে—১০০ (ধরা হয়েছে)।

এবারে দেখা যাক, উল্লিখিত সম্ভাব্য চারটি ফলাফলের ভিত্তিতে এ-খেলায় 'যৌক্তিক পছন্দ' (mini-max) কী হবে। যেহেতু উভয় খেলোয়াড়ই এক বিশেষ ধরনের যৌক্তিকতা দ্বারা চালিত, সুতরাং সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে প্রত্যেকেই নিজের লাভের পরিমাণকে সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি এবং ক্ষতির পরিমাণকে সর্বাপেক্ষা হ্রাস করতে চাইবে। যেহেতু তাদের কেউই অপরে কী সিদ্ধান্ত নেবে, সে-সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু জানে

Go to Contents
http://thejobstudy.com

না, সুতরাং প্রত্যেকেই এমন একটা কৌশল অবলম্বন করতে চাইবে, যা নিকৃষ্ট ফলাফলগুলোর উৎকৃষ্টটির নিশ্চয়তা দেবে। এখন A যদি সরে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তার জন্য সম্ভাব্য ফলাফল হবে (১) a_1b_1 (যদি B-ও সরে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়) এবং এতে A-র প্রাপ্য ফলাফল হবে শূন্য; কিংবা (২) a_1b_2 (যদি B সরে না পড়ে) এবং এতে A-র প্রাপ্য ফলাফল হবে—১০। আবার A যদি সরে না পড়ার সিদ্ধান্ত নেয় তবে তার জন্য সম্ভাব্য ফলাফলগুলো হবে (১) a_2b_1 (যদি B সরে পড়ে) এবং তখন A-র প্রাপ্য ফলাফল হবে + ১০; কিংবা (২) a_2b_2 (যদি B সরে না পড়ে) এবং এক্ষেত্রে A-র জন্য প্রাপ্য ফলাফল হবে—১০০। সুতরাং প্রথম ক্ষেত্রে A-র জন্য নিকৃষ্ট ফলাফল হচ্ছে যখন তার প্রাপ্য ফলাফল—১০০। সুতরাং নিকৃষ্ট ফলাফলগুলোর মধ্য থেকে উৎকৃষ্ট মান অর্জনের জন্য যৌক্তিকভাবে A-র সিদ্ধান্ত হবে a_1। B-ও একই যৌক্তিক বিশ্লেষণে দেখতে পাবে, b_1 সিদ্ধান্তই তাকে নিকৃষ্ট ফলাফলগুলোর মধ্যে উৎকৃষ্টটির নিশ্চয়তা দিচ্ছে। তাই দেখা যায় যে, খেলার যৌক্তিক পছন্দ হচ্ছে a_1b_1 অর্থাৎ চলন্ত গাড়ির উভয় আরোহীই গাড়ির গতিবেগ কমিয়ে ধীরে ধীরে এক অপরকে অতিক্রম করবে।

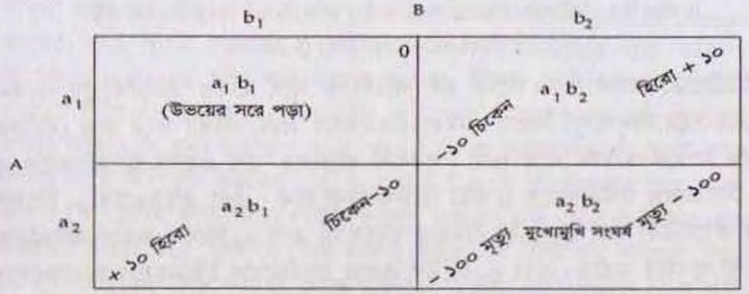

২ নং চিত্র : ক্রীড়াতত্ত্বের চিকেন মডেলের প্রাপ্য ফলাফল সূচি
উৎস : Lieber, *op. cit.*, p. 23

ক্রীড়াতত্ত্বের চিকেন মডেলের বাস্তব প্রয়োগ (Practical application of the Chicken model of the game theory)

ক্রীড়াতত্ত্বের চিকেন মডেলের সাহায্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উদ্ভূত বিশেষ ধরনের দ্বন্দ্ব পরিস্থিতির ব্যাখ্যা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ ১৯৬২ সনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার 'কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট' (Cuban Missile Crisis of 1962)-এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৬২ সনে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবায় ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করে, যা স্বাভাবিকভাবে আমেরিকার নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। আমেরিকা তার নিরাপত্তার উপর এ-হুমকি প্রতিহত করার লক্ষ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নকে কিউবা থেকে ঐ ক্ষেপণাস্ত্রগুলো সরিয়ে নিতে বলে। অন্যথায় পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে আমেরিকা সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর তার নিজের ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগের হুমকি দেয়। এ-পরিস্থিতিতে একটি নিশ্চিত আণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

http://thejobstudy.com

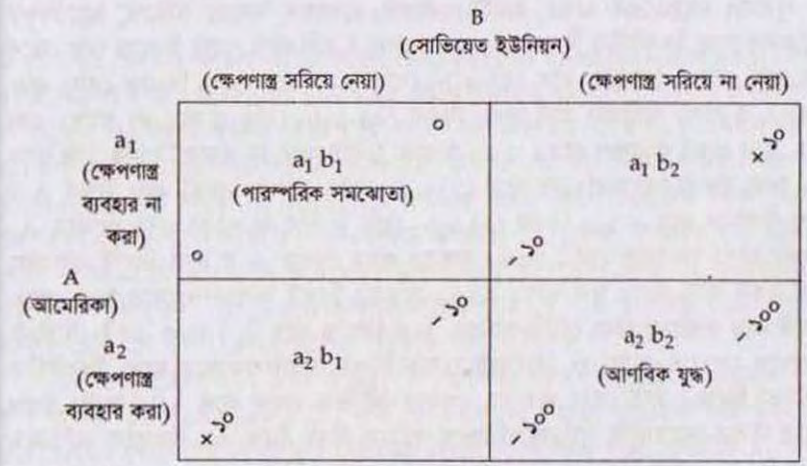

৩ নম্বর চিত্র : কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকটকালীন প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রাপ্য ফলাফল সূচি
উৎস : Lieber, *op. cit.*, p. 25

কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের এই পরিস্থিতি পূর্বে বর্ণিত ক্রীড়াতত্ত্বের চিকেন মডেলের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বিধায় আমরা একইভাবে একে ব্যাখ্যা করে তার যৌক্তিক সমাধান সম্পর্কে আভাস দিতে পারি। পূর্ববর্তী মডেলের ন্যায় এখানে আমেরিকাকে A এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে B দ্বারা চিহ্নিত করা যাক। এবং একইভাবে a_1 নির্দেশ করছে আমেরিকা তার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করবে না এবং a_2 নির্দেশ করছে আমেরিকা সেগুলো ব্যবহার করবে। এবং b_2 নির্দেশ করছে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার ক্ষেপণাস্ত্র সরিয়ে নেবে না এবং b_1 নির্দেশ করছে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবা থেকে সেগুলো সরিয়ে নেবে। তাদের প্রত্যেকের দুটি বিকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে চার রকমভাবে এই ঘটনাটি পরিণতি লাভ করতে পারবে, যা একইভাবে একটি প্রাপ্য ফলাফল সূচির (৩ নম্বর চিত্র দ্রষ্টব্য) সাহায্য দেখানো হয়েছে।

পূর্ববর্তী মডেলের ন্যায় যৌক্তিক বিশ্লেষণে এখানেও আমেরিকা দেখতে পাবে যে, ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার না করাই (a_1) হবে তার জন্য সবচেয়ে মঙ্গলজনক এবং এতে সে নিকৃষ্ট ফলাফলগুলোর মধ্য থেকে উৎকৃষ্টটি পেতে পারে। একই যৌক্তিক বিশ্লেষণে সোভিয়েত ইউনিয়নও দেখতে পাবে যে, কিউবা থেকে ক্ষেপণাস্ত্র সরিয়ে নেয়াই (b_1) তার জন্য মঙ্গলজনক এবং তা তাকে নিকৃষ্ট ফলাফলগুলোর উৎকৃষ্টটির নিশ্চয়তা দেবে। সুতরাং চিকেন মডেল থেকে প্রাপ্ত তাত্ত্বিক জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে, কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের যৌক্তিক সমাধান হবে উভয়ের জন্য আত্মসংগম (mutual restraint) অর্থাৎ a_1b_1 এবং বাস্তবক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছিল। এভাবে উভয় রাষ্ট্রই পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে একটি অনিবার্য আণবিক যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

অনেকের মতে কিউবার সংকটের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন তার ক্ষেপণাস্ত্র সরিয়ে নিয়ে চিকেনে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কারণ সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুরূপ আচরণের পর আমেরিকা এ নিয়ে আর বিশেষ উচ্চবাচ্য করেনি, যা সোভিয়েত ইউনিয়নের আত্মসম্মানকে খর্ব করতে পারত। এভাবেই প্রাপ্য ফলাফল সূচিতে আমরা দেখতে পাই যে, সংকট নিরসনের জন্য সহায়ক যৌক্তিক পছন্দ a_1b_1 অনুযায়ী উভয়ের প্রাপ্য ফলাফলের মান ছিল শূন্য।

ক্রীড়াতত্ত্বের কয়েদিদের উভয় সঙ্কট মডেল (The 'Prisoners' Dilemma' model of the game theory)

ক্রীড়াতত্ত্বের কয়েদিদের উভয়-সঙ্কট মডেল হচ্ছে two-person variable-sum game-এর অপর একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এ-খেলায় সাধারণত ধরে নেয়া হয় যে, দুজন সন্দেহকারীকে গ্রেফতার ও অন্তরীণ করা হয়েছে। কিন্তু সাক্ষ্য অথবা প্রমাণের অভাবের দরুন তাদেরকে অভিযুক্ত করা এবং সেই সাথে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এ-অবস্থায় সরকারি অভিশংসক (public prosecutor) তাদের সাথে পৃথক পৃথকভাবে দেখা করে সরকারি মনোভাব ব্যক্ত করেন। তিনি তাদেরকে বলেন যে, তারা যদি তাদের অপরাধ স্বীকার করে, তবে দুজনেই মাঝারি ধরনের সাজা ভোগ করবে (৫ বছরের কারাভোগ)। আর তারা যদি উভয়েই কোন প্রকার অপরাধের কথা অস্বীকার করে, তবে তিনি তাদেরকে হয়তো একটি অবৈধ অস্ত্র রাখার দায়ে অভিযুক্ত করবেন এবং এ-ক্ষেত্রে উভয়েই অপেক্ষাকৃত অল্প সাজা ভোগ করবে (১ বছরের কারাভোগ)। কিন্তু তাদের একজন যদি দোষ অস্বীকার করে এবং অন্যজন স্বীকার করে, তবে যে দোষ স্বীকার করবে, সে অতি অল্প পরিমাণ সাজা পাবে (৩ মাসের কারাভোগ) এবং যে দোষ অস্বীকার করবে, সে সবচেয়ে বেশি শাস্তি পাবে (১০ বছরের কারাভোগ)। এভাবে সরকারি অভিশংসক টোপ ফেলে কয়েদিদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করেন।

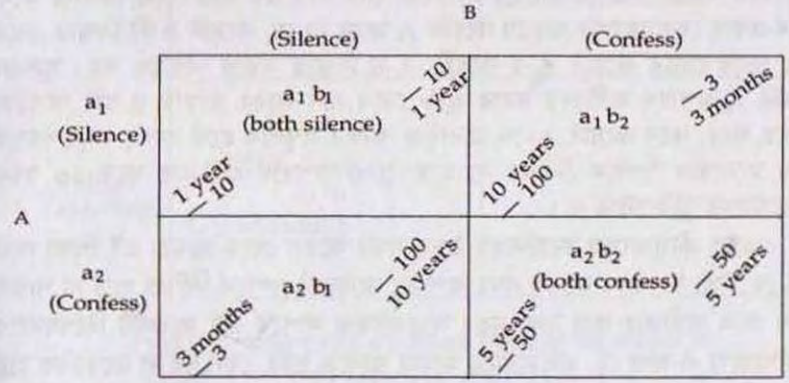

৪ নম্বর চিত্র : ক্রীড়াতত্ত্বের কয়েদিদের উভয়-সঙ্কট মডেলের প্রাপ্য ফলাফল সূচি
উৎস : Lieber, *op. cit.*, p. 29

http://thejobstudy.com

এখন উভয় কয়েদির নিকট দুটি বিকল্প খোলা আছে : (১) অপরাধ অস্বীকার করা (silence) ও (২) অপরাধ স্বীকার করা (confess)। ক্রীড়াতত্ত্বের মৌলিক ধারণা অনুযায়ী তাদের উভয়েরই মনোযোগ থাকে সর্বোচ্চ উপযোগের উপর। যেহেতু তারা উভয়-সঙ্কটে পতিত, সুতরাং তারা প্রত্যেকেই এমন ধরনের সিদ্ধান্ত নেবে, যাতে তাদের নিজ নিজ ব্যাপারে সর্বনিম্ন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

আমরা যদি কয়েদি দুজনকে কয়েদি A ও কয়েদি B দ্বারা চিহ্নিত করি, তবে এ-ক্ষেত্রেও সম্ভাব্য ফলাফল চার রকমের হতে পারে। কয়েদি A-র অপরাধ অস্বীকার করাকে যদি a_1 ও অপরাধ স্বীকার করাকে a_2 দ্বারা এবং কয়েদি B-র অনুরূপ অপরাধ অস্বীকার করা b_1 ও অপরাধ স্বীকার করা b_2 দ্বারা চিহ্নিত করলে আমরা নিম্নরূপ প্রাপ্য ফলাফল সূচি পাই (৪ নম্বর চিত্র দ্রষ্টব্য)।

১. a_1b_1 অর্থাৎ উভয়েরই দোষ অস্বীকার করা। এ-ক্ষেত্রে উভয়েই মোটামুটিভাবে লাভবান হবে।

২. a_1b_2 অর্থাৎ কয়েদি A-র দোষ অস্বীকার করা ও কয়েদি B-র দোষ স্বীকার করা। এখানে B অধিক লাভবান হবে কিন্তু A মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

৩. a_2b_1 অর্থাৎ কয়েদি A-র দোষ স্বীকার ও কয়েদি B-র দোষ অস্বীকার করা। এখানে উপরের উল্টোটি ঘটবে অর্থাৎ A অধিক লাভবান হবে আর B মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

৪. a_2b_2 অর্থাৎ উভয়েরই দোষ স্বীকার করা। এ-ক্ষেত্রে উভয়কেই কিছুটা ক্ষতি স্বীকার করে নিতে হবে।

এখন দেখা যাক, এই চারটি সম্ভাব্য ফলাফলের ভিত্তিতে এ-ব্যাপারে যৌক্তিক পছন্দ কী হবে। যেহেতু প্রত্যেক কয়েদিই তার নিজ নিজ স্বার্থ ও সুবিধার প্রতি মনোযোগ দেবে, সুতরাং তাদের যৌক্তিক পছন্দ হবে উভয়েরই দোষ স্বীকার (a_2b_2) করে ৫ বছর কারাভোগ করা। এখানে উল্লেখযোগ্য, তাদের এ-যৌক্তিক পছন্দ তাদেরকে সবচেয়ে ভালো প্রাপ্যের নিশ্চয়তা দেয় না। এর কারণ হল, তাদের মধ্যে কোন প্রকার যোগাযোগের অভাবে কয়েদি A জানে না যে, কয়েদি B কী সিদ্ধান্ত নেবে এবং অনুরূপভাবে কয়েদি B-ও কয়েদি A-র সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অবহিত নয়। সুতরাং কয়েদি A অপরাধ অস্বীকার করার ঝুঁকি নেবে না। কারণ কয়েদি B যদি অপরাধ স্বীকার করে, তবে কয়েদি A-কে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। অনুরূপভাবে A-র মনোভাব সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে B-ও অপরাধ অস্বীকার করে ১০ বছর কারাভোগের ঝুঁকি নেবে না।

এভাবে ক্রীড়াতত্ত্বের কয়েদিদের উভয় সঙ্কট মডেল থেকে আমরা এই শিক্ষা লাভ করি যে, ইচ্ছা থাকলেও অনেক সময় অপরের মনোভাব সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না পারার দরুন দোষ অস্বীকার করা সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে এই মডেলটি বিশেষভাবে প্রয়োগযোগ্য এ-জন্য যে, এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, কেন দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র তাদের নিজস্ব পছন্দের বিরুদ্ধেও অনেক সময় তাদের জন্য ক্ষতিকর এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়।

Go to Contents
http://thejobstudy.com

ক্রীড়াতত্ত্বের কয়েদিদের উপর সঙ্কট মডেলের বাস্তব প্রয়োগ (Practical application of the 'Prisoners' dilemma' model of the game theory)

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্রীড়াতত্ত্বের কয়েদিদের উভয়-সঙ্কট মডেল দ্বারা অনেক আন্তঃরাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব ও সংঘাতমূলক পরিস্থিতির চমৎকার বিশ্লেষণ প্রদান সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ আমরা ঠাণ্ডা লড়াই চলাকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্ত্র প্রতিযোগিতার (arms race) কথা উল্লেখ করতে পারি।

যদি আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে A ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে B দ্বারা এবং একইভাবে অস্ত্রশস্ত্র খাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অল্প পরিমাণ খরচ করাকে (low spending) a_1 ও অধিক পরিমাণ খরচ করাকে (high spending) a_2 দ্বারা এবং একই খাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের অল্প পরিমাণ খরচ করাকে b_1 ও অধিক পরিমাণ খরচ করাকে b_2 দ্বারা চিহ্নিত করি, তবে ক্রীড়াতত্ত্বের কয়েদিদের উভয় সঙ্কট মডেল থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের আলোকে দেখতে পাব যে, যতদিন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেরা পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে কোনরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ না হয়, ততদিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা চলতে থাকে (a_2b_2, ৫ নম্বর চিত্র দ্রষ্টব্য)। এর কারণ হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্রশস্ত্র খাতে খরচ কমিয়ে দিয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হতে চাইত না (U. S. disadvantage—100)। কেননা

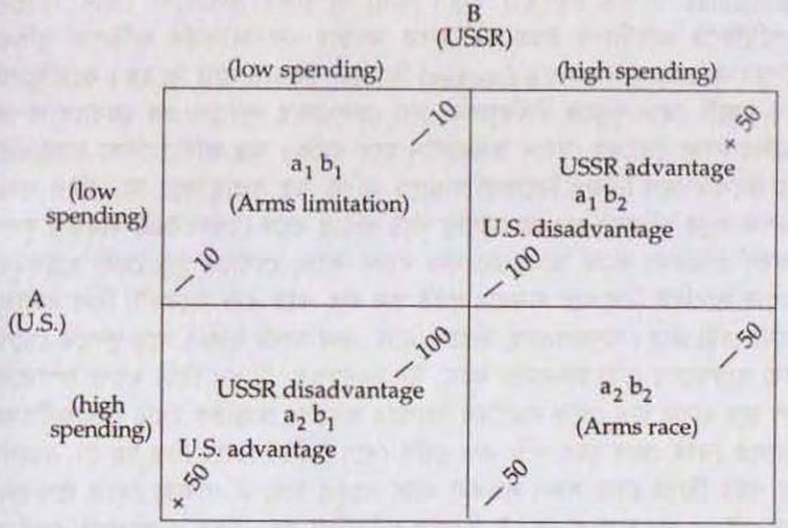

৫ নম্বর চিত্র : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্ত্র প্রতিযোগিতা
উৎস : Lieber, *op. cit.*, p.31.

প্রতিদানে সোভিয়েত ইউনিয়ন কম খরচ না করে বরং অধিক খরচ করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রধান সামরিক ও রাজনৈতিক সুবিধা লাভের সুযোগ নিতে পারত (U. S. S. R.

http://thejobstudy.com

advantage + 50)। অনুরূপভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নও অহেতুক ঝুঁকি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের সুযোগ দিতে রাজি ছিল না। যেহেতু তারা কখনও একে অপরের উদ্দেশ্যের সাধুতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেনি, তাই অস্ত্রশস্ত্র খাতে খরচ কমিয়ে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের (arms control) ব্যাপারে তারা সচেষ্ট ছিল না।

ক্রীড়া তাত্ত্বিকগণ তাঁদের পছন্দ অনুযায়ী গ্রহণীয় রণকৌশলসমূহ ক্রমানুযায়ী সাজাতে পারেন, কিন্তু অভিপ্রায় সম্পর্কে শুধু নির্দিষ্ট তথ্য তাঁদের সামনে থাকে যা দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে কোন রণকৌশলটি বেছে নিবেন। এবং চূড়ান্ত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কতটুকু মাত্রায় সম্পাদিত হবে তা প্রায়শ নির্ভর করে নেতৃত্বের গুণাবলি ও ইচ্ছা-শক্তির উপর, ব্যক্তিত্বের যে দিকসমূহ হিসেব করে বের করা সহজ নয়, বিশেষত সঙ্কটকালীন অবস্থায়।

কিছু কিছু আন্তর্জাতিক সঙ্কট দরকষাকষি ও যুদ্ধসীমায় ঠেলে দেবার ভীতি প্রদর্শনের (bargaining and brinkmanship) মত ক্রীড়া যেখানে উভয় পক্ষের প্রচেষ্টা থাকে প্রতিপক্ষকে নতি স্বীকারে রাজি করানো।

কয়েদিদের উভয়-সঙ্কটমূলক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন কোন কর্মক সমষ্টিগত স্বার্থের উপরে ব্যক্তিগত লাভ ও সুবিধা অনুসরণ করে। এটা অনেকটা বিনা মাসুলে ভ্রমণ (free rider)-এর ফলে সর্বসাধারণ যে ভোগান্তির (tragedy of the commons) শিকার হয় তার মত। আস্থা স্থাপনের উপযোগী কোন ভিত্তির অনুপস্থিতিতে কয়েদিদের উভয়-সঙ্কটমূলক অবস্থায় একজন কর্মক ব্যক্তিগত সুবিধা অনুসরণ করে যাতে তাকে বুদ্ধু (sucker) হিসেবে পাকড়াও হতে না হয়। কয়েদিদের উভয়-সঙ্কটে কোন বুদ্ধুকে দীর্ঘকালের জন্য জেলখানায় পাঠানো হয় যেখানে অপর কয়েদির সাজা ভোগের মেয়াদ স্বল্পকালীন হয়ে থাকে। অস্ত্র প্রতিযোগিতা চালানোর সময় নির্বোধ দেশ নিজের নিরাপত্তা বাড়াতে অধিক অস্ত্র সংগ্রহ করে না, যদিও তার প্রতিপক্ষ প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করে এগিয়ে থাকে। কোন মৈত্রী ব্যবস্থায় বৃহৎ শক্তিবর্গ প্রতিরক্ষা খাতে অধিকতর ব্যয় বরাদ্দ করে, যেখানে ক্ষুদ্র মৈত্রী রাষ্ট্রসমূহ মিত্রদের সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় খুবই কম ব্যয় করে এবং অনেকটা বিনা মাসুলে ভ্রমণের চেষ্টা করে। অনুরূপভাবে, সকলে মিলে কোন সম্পদ ভাণ্ডার গড়ে তুলতে গেলে অথবা সংরক্ষণের চেষ্টা চালানোর সময়, উদাহরণস্বরূপ, বিশ্বের তিনি মৎস্য সম্পদকে ধ্বংস হয়ে যাবার হাত থেকে বাঁচানোর ব্যাপারে সকলের আন্তরিক হবার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও কোন কোন বৃহৎ শক্তি এত বেশি বেগে তিনি শিকারে লিপ্ত হয় যে এগুলো শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত হবার সকল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও যারা এ প্রক্রিয়া থেকে লাভবান হবার চেষ্টা না চালায় তারা বুদ্ধুরাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হয়। হয়ত এ কারণেই এলস্টার (Jon Elster) রাজনীতিকে "কয়েদিদের উভয়-সঙ্কটমূলক পরিস্থিতিকে অতিক্রম করে যাবার উপায়সমূহ খুঁজে বের করার অধ্যয়ন" ("the study of [finding] ways of transcending the Prisoners' Dilemma")[৫] হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। বস্তুত, ক্রীড়া তত্ত্বের কয়েদিদের উভয়-সঙ্কট মডেলটি বিনা মাসুলে ভ্রমণজনিত সমস্যা

ও সর্বসাধারণের ভোগান্তির মত গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিকে কিভাবে অতিক্রম করা যায় সে ব্যাপারে নীতি-নির্ধারকদের অন্তর্দৃষ্টি যুগিয়ে সাহায্য করতে পারে। খেলোয়াড়গণ অতীতের ক্রীড়াসমূহ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতের ক্রীড়ায় কি রণকৌশল অবলম্বন করতে হবে তা নির্ধারণ করতে পারে।

পাদটীকা

১. Robert J. Lieber, *Theory and World Politics* (Cambridge, Massachusetts : Winthrop Publishers, Inc., n.d.), p. 18.
২. See J. A. Naik, *A Textbook of International Relations* (Delhi : The Macmillan Company of India Ltd., 1978), p. 18.
৩. T. B. Millar, 'On Writing About Foreign Policy', in James N. Rosenau (Ed.), *International Politics and Foreign Policy : A Reader in Research and Theory* (New York : The Free Press, 1969), pp. 63-64.
৪. See, *Our Common Future : A Perspective by the United Kingdom on the Report of the World Commission of Environment and Development* (July 1988), P. 51.
৫. Quoted in Russett and Starr, *op. cit.*, pp. 508-509.

http://thejobstudy.com

Job Study
To make you prepared & confident

ষোড়শ অধ্যায়

শক্তিসাম্য তত্ত্ব

BALANCE OF POWER THEORY

শক্তিসাম্য তত্ত্বে আমরা যে-কোন নির্দিষ্ট সাম্যাবস্থা ও রাষ্ট্রীয় আচরণের মধ্যে সংযোগ (linkage) সম্পর্কে ধারণা লাভ করি। এখানে সাম্যাবস্থার রূপকে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুটি রাষ্ট্র অথবা মৈত্রীজোটের মধ্যে শক্তির বণ্টন কী ধরনের, তাকে স্বাধীন চলক (independent variable) ও রাষ্ট্রীয় আচরণকে নির্ভরশীল চলক (dependent variable) হিসেবে গণ্য করা হয় এবং শক্তির বণ্টনের পরিবর্তনের সাথে রাষ্ট্রীয় আচরণের কী পরিবর্তন হবে, সে-বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়।

শক্তিসাম্য তত্ত্ব মোটামুটিভাবে তিনটি পৃথক প্রকল্পের (hypothesis) উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। প্রথম প্রকল্পটি শক্তিসাম্য ও রাষ্ট্রীয় আচরণের সংযোগ সম্পর্কে বলে যে, যখন দুটি রাষ্ট্র অথবা মৈত্রীজোটের মধ্যে শক্তির সমতা থাকে তখন তাদের মধ্যে যুদ্ধ বা দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং তাদের মধ্যে শক্তির অসমতা থাকলে শান্তি অথবা যুদ্ধের অনুপস্থিতি বেশি থাকে। শক্তির সমতা থাকলে দুটি বিবদমান পক্ষের উভয়ের চিন্তা থাকে যে, তাদের জয়ের সম্ভাবনা আছে এবং এভাবে একটি বিজয়লাভে ইচ্ছুক রাষ্ট্র তখনই বিজয় লাভের চেষ্টা করবে, যখন সে দেখবে যে তার জয়লাভের সম্ভাবনা সমান সমান এবং ব্যাপারটা তার প্রতিকূলে নয়। দিনা জিনেস (Dina A Zinnes) ও তাঁর সহযোগীরা এ-ব্যাপারে বলেন যে, 'একটি রাষ্ট্র যুদ্ধে যাবে না (অর্থাৎ আগ্রাসনে লিপ্ত হবে না অথবা এড়িয়ে চলা যায় এমন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে না) যদি সে উপলব্ধি করে যে, যখন এ-ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া হবে তখন তার নিজের শক্তি (অথবা তার সম্মিলিত শক্তি) তার শত্রুর শক্তির চেয়ে 'গুরুত্বপূর্ণরূপে কম' (A state will not go to war (i. e., commit aggression or allow itself to be drawn into an avoidable war) if it perceives its power (or the power of its coalition) as 'significantly' less than that of the enemy at the time that such a decision must be made)[১]।

Go to Contents
http://thejobstudy.com

অন্যদিকে এ-ধরনের যুক্তিও দেয়া যেতে পারে যে, যখন উভয় পক্ষেরই সমান সমান জয়ের সম্ভাবনা আছে, তখন তাদের পরাজয়ের সম্ভাবনাও সমান সমান। এরূপ অবস্থায় কোন প্রচ্ছন্ন আগ্রাসনকারী (potential aggressor) আক্রমণে লিপ্ত হবে না। কারণ সে মনে করবে যে, তার প্রচ্ছন্ন বিপক্ষেরও (porential opponent) তার সমান শক্তি আছে এবং এ-জন্য তার পরাজয়ের সম্ভাবনা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ। এভাবে শক্তিসাম্য তত্ত্বের দ্বিতীয় প্রকল্প বলে যে, যখন দুটি রাষ্ট্র অথবা মৈত্রীজোট সমান শক্তি নিয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হয়, তখন শক্তির সমতাই তাদেরকে আগ্রাসনমূলক কার্যাবলি থেকে বিরত রাখবে।

এভাবে উক্ত দুটি পরস্পরবিরোধী প্রকল্পের একটি বলে যে, শক্তি সমতা দ্বন্দ্বের পথ প্রশস্ত করতে চায় এবং অন্যটি বলে যে, শক্তির সমতা বৃহৎ আকারের দ্বন্দ্বকে নিবারণ করতে চায়। এ অবস্থায় দ্বান্দ্বিকতামূলক পদ্ধতি (dialectical method) ব্যবহার করে একটি তৃতীয় প্রকল্পে উপনীত হওয়া যায় যেটি বলে যে, যখন দুটি রাষ্ট্র সঠিক সমশক্তিবিশিষ্ট, তখন তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা কমে যায় এবং যদি কখনও তারা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, তবে তা সাধারণত নিচু পর্যায়ের হয়। নিচে দেয়া গ্রাফের মাধ্যমে শক্তিসাম্য তত্ত্বের মূল বিষয়বস্তু শক্তির বণ্টন ও দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা উত্তমরূপে বোঝা যাবে।

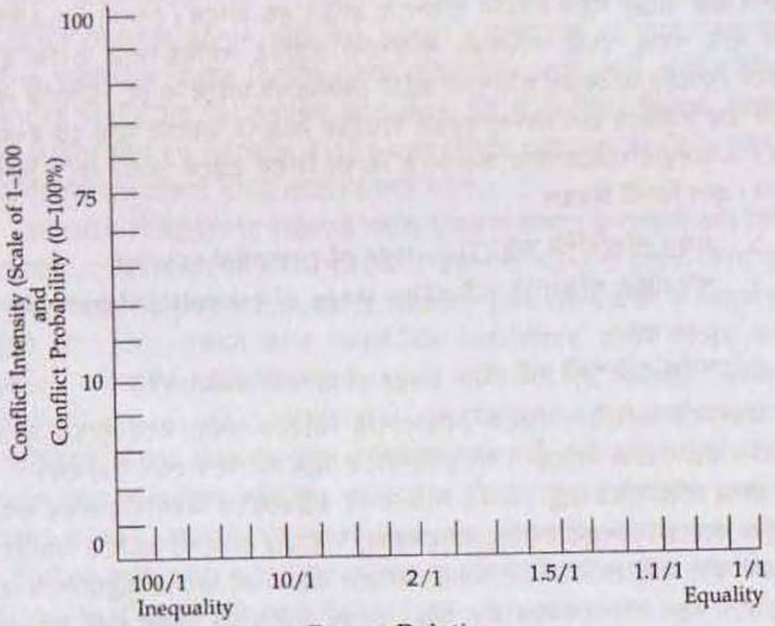

Hypothesized relation between power equality or inequality and level of conflict within a dyad.
Source : Sullivan, *op. cit.*, p. 167.

http://thejobstudy.com

কিন্তু একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, উল্লিখিত তিনটি প্রকল্পই মূলত স্থিতিশীল (static)। কারণ এগুলো রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্ককে বিশেষ একটি সময়ের আলোকেই বিচার করে। যেহেতু রাষ্ট্রীয় শক্তি পরিবর্তনশীল, সুতরাং আমাদের জানা দরকার যে, এরূপ অবস্থায় অর্থাৎ কোন রাষ্ট্রের শক্তির পরিবর্তন অথবা বৃদ্ধি ঘটলে তার আচরণের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন হবে কি না। অধ্যাপক অরগানস্কির 'শক্তির পরিবর্তন তত্ত্বের' সাহায্যে এটা বোঝা যাবে। তত্ত্বটি পরের পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হল।

শক্তি পরিবর্তন তত্ত্ব (Power Transition theory)

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে শক্তির বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে অধ্যাপক অরগানস্কি (A. F. K. Organski) তাঁর *World Politics*[২] নামক গ্রন্থে 'শক্তি পরিবর্তন তত্ত্ব' প্রদান করেন। এ-তত্ত্বে তিনি দেখিয়েছেন যে, একটি রাষ্ট্রের শক্তির পরিবর্তন ঘটলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে তা কীরূপ প্রভাব বিস্তার করবে।

অরগানস্কি প্রদত্ত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলে আমরা দেখতে পাই যে, একটি রাষ্ট্রের শক্তির যখন পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ শক্তি বৃদ্ধি পায়, তখন যুদ্ধ বাধার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। তিনি বলেছেন যে, কোন রাষ্ট্রের শক্তি যদি কোন কারণবশত সহসা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাহলে উক্ত রাষ্ট্রের সাথে বর্তমান শক্তিশালী রাষ্ট্রের যুদ্ধ বাধবে। কেননা, যে-রাষ্ট্রটির শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেটি অধিকতর শক্তিশালী রাষ্ট্রটির সমৃদ্ধির প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। যেহেতু অধিকতর শক্তিশালী রাষ্ট্রটি কোনমতেই চাইবে না যে, শক্তিবৃদ্ধি প্রাপ্ত রাষ্ট্রটি তার সমৃদ্ধিতে ভাগ বসাক, সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হওয়ার কথা। এ-অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অরগানস্কি বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রকে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করেন। গ্রুপ তিনটি নিম্নরূপ :

১. প্রচ্ছন্ন শক্তিবিশিষ্ট রাষ্ট্র (The stage of potential power),
২. পরিবর্তিত শক্তিশালী রাষ্ট্র (The stage of transitional growth in power)
৩. পর্যাপ্ত শক্তিশালী রাষ্ট্র (The stage of power maturity.)[৩]

অরগানস্কি প্রতিটি পর্যায়কে বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে বর্ণনা করে যুদ্ধের কারণ উদঘাটন করতে চেষ্টা করেছেন। পর্যায় তিনটিকে নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।

প্রচ্ছন্ন শক্তিবিশিষ্ট রাষ্ট্র : প্রচ্ছন্ন শক্তিবিশিষ্ট রাষ্ট্রগুলোকে অরগানস্কি প্রথম গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শিল্পকারখানায় অনগ্রসরতা, মান্ধাতার আমলের প্রচলিত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা এবং প্রধানত পল্লি অঞ্চলে বসবাস করা—এই গ্রুপের রাষ্ট্রগুলোতে এ-অবস্থাগুলো বহুল পরিমাণে লক্ষ করা যায়। তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন খুবই কম এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান খুবই নিচু। এ-গ্রুপের রাষ্ট্রগুলো প্রযুক্তিবিদ্যায় অনগ্রসর। এখানে জনসাধারণের শিক্ষার হারও অনেক কম। রাজনীতির ক্ষেত্রে তারা মধ্যযুগীয় অবস্থাকে অতিক্রম করতে পারেনি। এরূপ রাষ্ট্রগুলো প্রায়ই নব্য-ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার

শিকার। শাসনব্যবস্থায় সাধারণত জনগণের কোন ভূমিকা থাকে না, কারণ একটি ক্ষুদ্র অভিজাত সম্প্রদায় অদক্ষ সরকারি আমলাদের মাধ্যমে তা পরিচালনা করে থাকে। এখানে জনগণ ও সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করে জাতীয় উন্নয়নের প্রতি কোনরূপ নজর দেয়া হয় না। এহেন রাষ্ট্র সবদিক থেকে অনগ্রসর হয়ে থাকে।

পরিবর্তিত শক্তিশালী রাষ্ট্র : অরগানস্কি দ্বিতীয় গ্রুপটিকে পরিবর্তিত শক্তিশালী রাষ্ট্র বলে চিহ্নিত করেছেন। এরূপ রাষ্ট্রে খুব দ্রুতগতিতে শক্তির মৌলিক উৎসগুলোর পরিবর্তন ঘটে। শিল্পোৎপাদন এবং সাথে সাথে কৃষি উৎপাদনের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে মোট জাতীয় আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। রাজনৈতিক দিক থেকে কেন্দ্রীয় সরকার সবকিছুর নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে এবং জনগণ সরকারি কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। রাষ্ট্রীয় জীবনে বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিপুল উন্নয়ন সাধিত হয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে, পূর্বের স্থবিরতা থেকে রাষ্ট্র মুক্ত হয় এবং সেখানে জন্ম নেয় এক গতিশীলতা, যা তাকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা এনে দেয়।

পর্যাপ্ত শক্তিশালী রাষ্ট্র : তৃতীয় গ্রুপটিকে অরগানস্কি পর্যাপ্ত শক্তিশালী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ-ধরনের রাষ্ট্র সাধারণত শিল্পকারখানায় পরিপূর্ণ থাকে এবং এগুলোর উৎপাদন ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আজকের দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহ, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও রাশিয়াকে এই গ্রুপে ফেলা যায়। তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিরবচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি পাবার ফলে মোট জাতীয় আয় ও জনগণের জীবনযাত্রার মান সর্বাধিক হয়। এরূপ রাষ্ট্র প্রযুক্তিবিদ্যা, বিজ্ঞান, শিল্পকলা তথা জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। এ-রাষ্ট্রগুলো আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে থাকে।

অরগানস্কি বিভিন্ন গ্রুপের রাষ্ট্রগুলো সম্বন্ধে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, দ্বিতীয় গ্রুপের অর্থাৎ পরিবর্তিত শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো যুদ্ধের কারণ হবে। কেননা, সহসা শক্তিবৃদ্ধির ফলে এ-গ্রুপের রাষ্ট্রগুলো পূর্বের শক্তির বণ্টন ও সাম্যাবস্থাকে পাল্টে দেবে এবং এভাবে তারা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে থাকতে। পরিবর্তিত শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো যদি মনে করে যে, বর্তমানে বিরাজমান 'স্থিতাবস্থা' (status quo) তাদের জন্য সন্তোষজনক নয় (কেননা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তাদের প্রভাবের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর প্রভাব বেশি) তাহলে তারা এ-অবস্থার পরিবর্তন আনয়নে সচেষ্ট হবে এবং প্রয়োজন হলে শক্তি প্রয়োগ করবে। এভাবেই যুদ্ধ আরম্ভ হবে এবং বিশ্বশান্তি ব্যাহত হবে। এরূপ পরিস্থিতিতে শান্তি বজায় রাখার জন্য অধিকতর শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোকে সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর নতুন অবস্থাকে মেনে নেয়া দরকার।

অরগানস্কি এরপর 'সন্তুষ্টি' চলকটি (variable of 'satisfaction')-কে প্রবেশ করিয়ে শক্তি ও সন্তুষ্টির যৌথ সমন্বয়ে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। এগুলো হল :

http://thejobstudy.com

১. শক্তিশালী এবং সন্তুষ্ট রাষ্ট্র (Countries that are powerful and satisfied),
২. শক্তিশালী এবং অসন্তুষ্ট রাষ্ট্র (Countries that are powerful and dissatisfied),
৩. দুর্বল এবং সন্তুষ্ট রাষ্ট্র (Countries that are weak and satisfied),এবং
৪. দুর্বল এবং অসন্তুষ্ট রাষ্ট্র (Countries that are weak and dissatisfied)।[৪]

যতদূর সম্ভব অধিকাংশ রাষ্ট্রই ১, ৩ ও ৪ নম্বর শ্রেণিতে পড়বে। এদের সবাই কোন রকম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চাইবে না। কারণ তারা তাদের শক্তি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে অথবা তাদের দুর্বরতার জন্য যুদ্ধে সাফল্যলাভ করতে সক্ষম হবে না। আবার যে-সব রাষ্ট্র শক্তিশালী এবং সন্তুষ্ট তাদের মধ্যে যুদ্ধে বাধলে, ক্লড (Inis L. Claude)-এর ভাষায়,উভয়েরই সমান সমান ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। এভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া অতীতে বিশ্বযুদ্ধ পরিহার করেছিল। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রগুলো তাদের দুর্বলতার জন্য যুদ্ধের ব্যাপারে কৌতূহলী হয় না, কারণ তাদের সাফল্যলাভের সম্ভাবনা কম। কিন্তু যখন কোন রাষ্ট্রের শক্তির পরিবর্তন ঘটে এবং এর ফলে সে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হয় তখন সে পূর্ববর্তী শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর কাছে প্রতিযোগী হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রধানত দুটি কারণ তাদেরকে যুদ্ধের ব্যাপারে উৎসাহিত করবে। প্রথমত, অসন্তুষ্ট রাষ্ট্রগুলো তাদের বাড়তি শক্তিতে আস্থাবান হয়ে পূর্বের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোকে আক্রমণে প্রয়াসী হবে। দ্বিতীয়ত, পূর্বের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো যখন দেখবে যে, অসন্তুষ্ট রাষ্ট্রগুলোর শক্তিবৃদ্ধির ফলে তারা তাদের সমৃদ্ধির প্রতি হুমকি হয়ে দেখা দিচ্ছে, তখন তারা চাইবে যেন অসন্তুষ্ট রাষ্ট্রগুলো শক্তি বৃদ্ধি করতে না পারে এবং এ-ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য পূর্ব থেকেই তাদের উপর আক্রমণ চালাবে (War is more likely to occur because (1) the dissatisfied country may feel its newfound power permits it to take on the predominant power or (2) the dominant power, viewing the growing power potential of the dissatisfied nation, may decide on pre-emptive aggression.)[৫]।

পরিশেষে বলা যায় যে অরগানস্কি তাঁর একটি ধ্রুপদী রিবৃতিতে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, "যদি না তাদের মনে প্রত্যয় জন্মে যে তাদের জেতার ভাল সম্ভাবনা আছে, রাষ্ট্রসমূহ যুদ্ধে লিপ্ত হতে অনীহ থাকে, কিন্তু এটা উভয় পক্ষের জন্য প্রযোজ্য একমাত্র যখন দুটো রাষ্ট্রের শক্তি মোটের উপর সমান সমান থাকে অথবা নিদেনপক্ষে তারা তাই বিশ্বাস করে" ("nations are reluctant to fight unless they believe they have a good chance of winning, but this is true for both sides only when the two are fairly evenly matched, or at least they believe they are.")।[৬]

পাদটীকা

১. Dina A. Zinnes, Robert C. North, and Howard E. Coch, Jr., 'Capability, Threat and the Outbreak of War', in James N. Rosenau (ed.), *International Politics and Foreign Policy : A Reader in Resarch and Theory* (New York : The Free Press, 1961), p. 470.
২. A. F. K. Organski, *World Politics* (New York : Knopf, 1968).
৩. Michael P. Sullivan, *op. cit.*, p. 167.
৪. ঐ, পৃ. ১৬৮।
৫. ঐ।
৬. Quoted in Russett and Starr, *op. cit.*, p. 120.

Go to Contents
http://thejobstudy.com
Job Study
To make you prepared & confident

সপ্তদশ অধ্যায়

সিস্টেম তত্ত্ব

SYSTEMS THEORY

সিস্টেম কথাটি বর্তমানে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। গত প্রায় চার দশক যাবৎ আমরা সিস্টেম তত্ত্ব সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করলেও আগেকার দিনের পণ্ডিতগণও এ-সম্পর্কে ধারণা করতে পারতেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি যে, হব্‌স (Thomas Hobbes) তাঁর বিখ্যাত *Leviathan* গ্রন্থের ২২ নম্বর অধ্যায়ে সিস্টেম সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন।[১] আধুনিককালে সিস্টেম তত্ত্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবক্তা হলেন কানাডার আলবার্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বীয় জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক বারটালানফি (Ludwig von Bertalanffy)। এরপর সমাজবিজ্ঞানী পারসনস্ (Talcott Parsons) তাঁর নিজের ক্ষেত্রে গবেষণায় এ-তত্ত্বকে অনেক দূর নিয়ে যান, যা থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেন। কেনেথ বোল্ডিং (Kenneth Boulding) তাঁর অর্থনীতির আলোচনা থেকে সাধারণ সিস্টেম তত্ত্বকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপযোগী বলে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তীকালে অন্য পণ্ডিতগণ যেমন আনাতোল র‍্যাপোপর্ট (Anatol Rapoport), কার্ল ডয়েস (Karl W. Deutsch), জর্জ মডেলস্কি (George Modelski), মরটন কাপলান (Morton A. Kaplan), রিচার্ড রোজক্রান্স (Richard N. Rosecrance), চার্লস ম্যাক্‌লিল্যান্ড (Charles A. McClelland) প্রমুখ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সিস্টেম তত্ত্ব উন্নয়নে বিশিষ্ট অবদান রাখেন।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আচরণ প্রধানত ব্যক্তির কার্যকলাপ ও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার সাথে যারা জড়িত তাদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, অপর রাষ্ট্রগুলো সম্পর্কে তাদের ধারণা ও বিশ্বাস এবং সেই সাথে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ও ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে তার

আচরণ গড়ে ওঠে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আন্তর্জাতিক সিস্টেম (international system) রাষ্ট্রীয় আচরণকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। এখন আন্তর্জাতিক সিস্টেম কোন রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের আচরণকে কীভাবে এবং কতটুকু প্রভাবিত করে, অথবা অন্য কথায়, রাষ্ট্রীয় আচরণকে আন্তর্জাতিক সিস্টেমের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় কি না, সে-বিষয়ে পণ্ডিতগণ যে-তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সেটাই সিস্টেম তত্ত্ব হিসেবে বহুলপরিচিত।

সিস্টেম তত্ত্বে প্রথমেই ধরে নেয়া হয় (assumption) যে, আন্তর্জাতিক সিস্টেমের অবস্থিতি আছে এবং তা আচরণ করে। এ-তত্ত্বের আরেকটি উল্লেখযোগ্য স্বতঃসিদ্ধ (axiom) হল যে, রাষ্ট্রীয় আচরণ আন্তর্জাতিক সিস্টেম অথবা সাব-সিস্টেম (subsystem)-এ তার অবস্থিতির উপর নির্ভর করে, অথবা অন্যান্য রাষ্ট্র তার প্রতি কী ধরনের আচরণ করবে তার উপর নির্ভর করে (State behaviour is a function of its position in the international system, or sub-systems, or ... a function of how other states behave toward it.)[২]।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিদিন বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হয়। কোন সাধারণ লোকের কাছে মনে হতে পারে যে, এগুলো এলোপাতাড়িভাবে (random) ঘটে। কিন্তু সিস্টেম তত্ত্ববিদরা মনে করেন যে, আপাতদৃষ্টিতে এগুলোকে উদ্দেশ্যহীন মনে হলেও আসলে এগুলোর মধ্যেও 'সুসংগঠিত জটিলতা বিদ্যমান' (organized complexity prevails in inter-national relations.)[৩]। এ-সম্পর্কে ম্যাকলিল্যান্ড যথার্থই বলেছেন যে, 'যে-কোন নির্দিষ্ট দৃশ্যমান বিষয়, সত্তা, বৈশিষ্ট্য, সম্বন্ধ বা পদ্ধতিকে কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় হিসেবে গণ্য না করে বরং তার প্রসঙ্গ ও পারিপার্শ্বিকতার আলোকে বিবেচনা করা উচিত' (Any specific phenomena, entity, trait, relationship or process should be considered in its context or milieu rather than in isolation.)[৪]।

সিস্টেম তত্ত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আনাতোল র‍্যাপোপর্ট বলেছেন যে, 'একটি সম্পূর্ণ জিনিস যদি তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার দ্বারা সম্পূর্ণ জিনিস হিসেবে কাজ করে, তবে তাকে সিস্টেম বলা হয়। এবং বিভিন্ন ধরনের সিস্টেমের মধ্যে কীভাবে এটা সম্পন্ন হয়, তা যে-পদ্ধতি দ্বারা আবিষ্কার করার প্রয়াস চলে, তাকে সাধারণ সিস্টেম তত্ত্ব বলে' (A whole which functions as whole by virtue of the interdependence of its parts is called a system and the method which aims at discovering how this is brought about in the widest variety of systems had been called general systems theory.)[৫]। বোল্ডিং-এর মতে, 'সিস্টেম তত্ত্ব আপাতদৃষ্টিতে নানাবিধ বিষয়কে একটি অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ সৌধে স্থাপনের ব্যাপারে কাঠামো জোগায়' (Systems theory provides a framework of placing seemingly diverse disciplines into a more coherent structure.)[৬]। মরটন কাপলানও মোটামুটি একই মত প্রকাশ

http://thejobstudy.com

করে বলেন যে, 'সিস্টেম তত্ত্ব বিভিন্ন বিষয় থেকে আহরিত চলকগুলোর মধ্যে সংহতি স্থাপনের ব্যাপারে সুযোগ সৃষ্টি করে' (System theory permits the integration of variables form different disciplines.)[৭]।

একটি সিস্টেমকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। এটা সাধারণত শিথিলভাবে অথবা দৃঢ়ভাবে সজ্ঞবদ্ধ হতে পারে। এটা হতে পারে স্থায়ী অথবা অস্থায়ী। প্রত্যেক সিস্টেমের নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে, যা তাকে তার কার্যকর পরিবেশ থেকে স্বতন্ত্র রাখে। প্রত্যেক সিস্টেমের মধ্যেই যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে, যা অংশগুলোর মধ্যে তথ্যের আদানপ্রদান করে এবং এগুলোকে নিজে থেকেই সুবিন্যাস্ত রাখতে সক্ষম করে। প্রত্যেক সিস্টেমের কতগুলো ইনপুট (inpur) ও আউটপুট (output) আছে। যদি পাশাপাশি অবস্থিত দুটি সিস্টেম সংযুক্ত হয় তবে একটির আউটপুট অপরটির ইনপুটে পরিণত হতে পারে। সাধারণত কোন সিস্টেমের অবস্থাকে (state of system) তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আচরণ (characteristic behaviour) থেকে পৃথক করা যায়। কোন কোন ইনপুট একটি সিস্টেমের অবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারে এবং এর স্থিতাবস্থায় গোলমালের সৃষ্টি করতে পারে। এ-রকম অবস্থায় কোন কোন সিস্টেম তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে পারে। কিন্তু অনেক সময় এ-ধরনের ইনপুটগুলো এত অধিক প্রভাব বিস্তার করে যে, তা সিস্টেমের বৈশিষ্ট্যমূলক আচরণকে এমনভাবে বদলে দেয়, যার ফলে সে তার পূর্বের স্থিতাবস্থায় ফিরে না গিয়ে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সমতায় (level) দাঁড়ায় এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কার্যকর অবস্থায় স্থিতি অর্জন করে। সিস্টেমের উদাহরণ হিসেবে আমরা স্নায়ুতন্ত্র, মোটরগাড়ি, এ্যাপোলো মহাশূন্যযান, শক্তিসাম্য, সমষ্টিগত নিরাপত্তা ইত্যাদির উল্লেখ করতে পারি।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সাধারণত সংহতি, পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ও দ্বন্দ্ব অধ্যয়নে সিস্টেম কাঠামোকে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। একটু পরেই আমরা দেখব সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ও সংহতিতত্ত্ব উন্নয়নের ব্যাপারে সিস্টেম তত্ত্বকে কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

সিস্টেম তত্ত্ব উন্নয়নে বিভিন্ন পণ্ডিতের গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হল।

সিস্টেম তত্ত্ব উন্নয়নে মরটন কাপলানের অবদান (Contributions of Morton Kaplan to the Development of Systems Theory)

প্রথমেই বলতে হয় যে সিস্টেম তত্ত্ব উন্নয়নে যে সকল পণ্ডিত বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে মরটন কাপলানের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি যেজন্য বিখ্যাত তা হল যে আন্তর্জাতিক সিস্টেমের কয়েকটি বৈকল্পিক মডেল (alternative models) কাপলান উদ্ভাবন করেন। তিনি এ মডেলগুলোর অনুসৃত নিয়ম-কানুন এবং এগুলোর বিভিন্ন প্যাটার্নের মধ্যে সিস্টেমের আন্তঃক্রিয়া কিরূপ হতে পারে সে বিষয়েও পূর্ব-ধারণা প্রদান করেন। কাপলানের মতে, সিস্টেম তত্ত্বের ধ্রুপদী উক্তি পরিদৃষ্ট হয় মানব মস্তিষ্কের উপর অ্যাশবির (W. Ross Ashby) গবেষণাকর্মের মধ্যে।[৮] যদিও অ্যাশবি

কাজ করেছেন মানব মস্তিষ্ক নিয়ে এবং কাপলানের কাজের বিষয় ছিল আন্তর্জাতিক রাজনীতি, তাঁদের উভয়েই নিজ নিজ ক্ষেত্রে যে জিনিসগুলো নিয়ে আবিষ্ট ছিলেন তা হল সিস্টেমকে একগুচ্ছ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত চলক (variable) দ্বারা বর্ণনা করা যে চলকগুলো এর পরিবেশ থেকে পার্থক্যকরণযোগ এবং যেগুলো পরিবেশ থেকে আগত গোলমালের প্রভাবের মধ্যেও এটি কীভাবে নিজেকে বজায় রাখে তার বিবরণ প্রদান করে।

এ কাজটি করতে গিয়ে কাপলান আন্তর্জাতিক সিস্টেমের ছয়টি মডেল নির্মাণ করেন যা একটি তত্ত্বগত কাঠামো (theoretical framework) সরবরাহ করে। প্রত্যেকটি মডেল থেকে বিভিন্ন প্রকল্প (hypotheses) আহরণ করা যায় এবং এগুলোর মাধ্যমে তিনি তাঁর তত্ত্ব উন্নীত করেছেন। তাঁর প্রস্তাবিত এ মডেলগুলো হল : শক্তিসাম্য (the balance of power), শিথিল দ্বি-মেরু (loose bipolar), আঁটসাট দ্বি-মেরু (tight bipolar), বিশ্বজনীন (universal), প্রধানশক্তি সম্বলিত (hierarchical) ও একক ভেটো (unit veto)। প্রত্যেক মডেলের ভিতরে তিনি পাঁচ সেট চলক উন্নীত করেছেন : অপরিহার্য বিধি (essential rules), রূপান্তর বিধিসমূহ (transformation rules), কর্মক শ্রেণি বিভাগকারী চলক (actor classificatory variables), সামর্থ্য চলক (capability variables), ও তথ্য চলকসমূহ (information variables)। এ তথাকথিত অপরিহার্য চলকসমূহকে তিনি অপরিহার্য বলেছেন এ কারণে যে সেগুলো সিস্টেমের সাম্যাবস্থা (equilibrium) বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় আচরণ বর্ণনা করে। রূপান্তর বিধিসমূহ সাম্যাবস্থা বজায় রাখার প্রয়োজনীয় উপাদানের বাইরে অবস্থিত কোন কিছু সিস্টেমে প্রবেশ করলে (inputs) যে পরিবর্তনসমূহ দেখা দিতে পারে তা নির্দেশিত করে। কর্মক শ্রেণি বিভাগকারী চলকসমূহ কর্মকসমূহের গঠনমূলক বৈশিষ্ট্যাবলি ব্যাখ্যা করে। সামর্থ্য চলকসমূহ কর্মকসমূহের নিকট প্রাপ্তিসাধ্য অস্ত্রশস্ত্রের পর্যায়, প্রযুক্তি ও জাতীয় শক্তির অন্যান্য উপাদানকে নির্দেশিত করে। তথ্য চলকসমূহ সিস্টেমের মধ্যকার যোগাযোগের পর্যায় উল্লেখ করে।[৯]

এখন আমরা একে একে এ প্রত্যেকটি মডেলের জন্য প্রণীত বিধিসমূহ সংক্ষেপে পরীক্ষা করে দেখব যে সেগুলোতে কোন ধরনের কর্মক অন্তর্ভুক্ত, তাদের সামর্থ্য, উদ্দেশ্যাবলি ও লক্ষ্য নির্ধারণ কিভাবে হয়, তাদের রাজনৈতি আচরণের রীতি কিরূপ এবং সেগুলোর গঠনমূলক বৈশিষ্ট্যাবলি কি। তবে এর পূর্বে বলা দরকার যে যদি সংহতিমূলক কার্যাবলির ক্রমবিন্যাসানুযায়ী এগুলো যেভাবে বিন্যস্ত সে পরিমাপের ভিত্তিতে দেখা হয় তবে এটা স্পষ্ট হয় যে একক ভেটো সিস্টেম সর্বনিম্ন ও প্রধানশক্তি সম্বলিত সিস্টেম সর্বোচ্চভাবে সংহত (integrated)। কাপলানের মডেলগুলোতে সিস্টেমের পরিবর্তনসমূহ এগুলোর গঠনমূলক এককগুলোর ধ্রুবকসমূহের (parameters or constants) মানের পরিবর্তনের ফল। তিনি স্বীকার করে নেন যে বিরাজমান আন্তর্জাতিক সিস্টেমের অতি কম সংখ্যকই, যদি এরূপ ঘটে, তাঁর প্রকল্পিত মডেলগুলোর পুরোপুরি অনুরূপ। এতদ্‌সত্ত্বেও যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর মডেলের মাধ্যমে

Go to Contents
http://thejobstudy.com
http://thejobstudy.com

প্রকাশিত তত্ত্ব "সিস্টেমের ধ্রুবকসমূহে যথাযোগ্য সমন্বয় ঘটানো হলে" (suitable adjustments are made for the parameters of the system")[১০] তা রাষ্ট্রীয় আচরণকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হলে তিনি ঐ মডেলটির প্রয়োগ অব্যাহত রাখবেন। অধিকন্তু, সিস্টেমের পরিবর্তনের জন্য বিধিমালাকে নির্দিষ্টকরণের দ্বারা, যেটি একটি ব্যবস্থা গ্রহণ পর্যায়ের অপেক্ষক (function)[১১] (অথ্যাৎ, একটি সিস্টেমে অধিক পরিমাণে বিশৃঙ্খলাময় ইনপুট হলে সেটি এমনভাবে সাড়া দিবে যে সিস্টেমটির নিজেরই রূপান্তর ঘটবে), কাপলানের দাবি যে তিনি তাঁর মডেলগুলোকে আন্তর্জাতিক সিস্টেমসমূহে কিভাবে রূপান্তর ঘটে তা বুঝার উপায় হিসেবে নির্মাণ করেছেন।

কাপলানের প্রথম অর্থাৎ শক্তিসাম্য সিস্টেম মডেলটি বাস্তববাদী লেখকগণ, যেমন মর্গেনথু (Hans J. Morgenthau)-বর্ণিত আন্তর্জাতিক সিস্টেমের সমরূপ বলে ধরা যায়। এটির ব্যাপারে কাপলান যে বিধিমালা প্রণয়ন করেছেন তা হল : (১) কর্মকসমূহ তাদের সামর্থ্য বৃদ্ধি করে, কিন্তু যুদ্ধে লিপ্ত হবার চেয়ে একে অন্যের সাথে আলাপ-আলোচনা করে; (২) তাদের নিজেদের সামর্থ্য বাড়াতে তারা বরং যুদ্ধের আশ্রয় নিবে তবু কোন সুযোগকে হাত ছাড়া হতে দিবে না; (৩) তারা অন্য কোন অপরিহার্য কর্মককে নিশ্চিহ্ন করে দেবার পরিবর্তে বরং যুদ্ধ করা বন্ধ করে দিবে; (৪) যদি কোন একক কর্মক নিজে অথবা কোয়ালিশন গঠন করে সিস্টেমের মধ্যে কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থান দখল করতে চায় তবে অন্য কর্মকসমূহ তার বিরোধিতা করবে; (৫) যে সকল কর্মক জাতি-রাষ্ট্রের উর্ধে অবস্থিত এমন কোন সংগঠনগত মূলনীতিসমূহে একমত পোষণ করে তবে অন্য সকলে তাদেরকে বাধা দিতে চায়; এবং (৬) যে অপরিহার্য কর্মকসমূহ পরাজিত হয়েছে অথবা দুর্দশায় নিপতিত তাদেরকে গ্রহণযোগ্য ভূমিকা পালনকারী অংশীদার হিসেবে সিস্টেমে পুনঃপ্রবেশ করতে দিতে, অথবা পূর্বে যে কর্মকগুলোকে অপ্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করা হত তাদেরকে অপরিহার্য কর্মকদের শ্রেণিভুক্ত করতে কর্মকসমূহ অনুমতি দেয়।

কাপলানের দ্বিতীয় অর্থাৎ শিথিল দ্বি-মেরু সিস্টেমকে অনেক দিক দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক সিস্টেমের সাথে তুলনা করা যায়। এ মডেলে অন্তর্ভুক্ত থাকে প্রধান ব্লক কর্মকসমূহ (যেমন, ন্যাটো [North Atlantic Treaty Organization, সংক্ষেপে NATO] ও ওয়ারশ্ চুক্তি [Warsaw Pact]); প্রত্যেক ব্লকের মধ্যে একটি নেতৃস্থানীয় জাতীয় কর্মক (যেমন, ন্যাটোর ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ও ওয়ারশ্ চুক্তির ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন); ব্লকের বাইরে অবস্থিত জাতীয় কর্মকসমূহ (যেমন, ভারত); এবং সার্বজনীন কর্মকসমূহ (যেমন, জাতিসংঘ)। শিথিল দ্বি-মেরু সিস্টেমের ব্যাপারে প্রযোজ্য অনেকগুলো বিধিও কাপলান উপস্থাপন করেছেন। এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল : (১) প্রতিদ্বন্দ্বী ব্লকটিকে নিশ্চিহ্ন করতে ব্লকভুক্ত অন্যান্য কর্মকসমূহ কোন প্রধান শক্তির একক অথবা শীর্ষস্থানীয় অন্য দু একটির মিশ্রণে গঠিত কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত সংহতিমূলক মূলনীতিসমূহে একমত পোষণ করে, যুদ্ধে লিপ্ত হবার পরিবর্তে আলাপ-আলোচনা করে, বড় ধরনের যুদ্ধে নয়, বরং ছোটখাট যুদ্ধের আশ্রয় নেয়, এবং

প্রতিদ্বন্দ্বী ব্লককে নিশ্চিহ্ন করতে ব্যর্থ হবার পরিবর্তে বরং বড় ধরনের যুদ্ধে লিপ্ত হতেও পিছপা হয় না; (২) প্রতিদ্বন্দ্বী ব্লকের কর্মকসমূহের তুলনায় অন্য ব্লকের কর্মকগণ তাদের সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে ব্যস্ত থাকে; (৩) অপ্রধানশক্তি সম্বলিত অথবা অনির্দেশকারী প্রধানশক্তি সম্বলিত সাংগঠনিক মূলনীতিসমূহে একমত পোষণকারী ব্লক কর্মকসমূহ সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে যুদ্ধের চেয়ে বরং আলাপ-আলোচনা অধিকতর পছন্দ করে এবং এতদুদ্দেশ্যে তারা বড় ধরনের যুদ্ধ আরম্ভ করা থেকে বিরত থাকে; (৪) প্রতিদ্বন্দ্বী ব্লকের অধিকতর প্রভাবসম্পন্ন শক্তি অর্জনকে মেনে নেবার চেয়ে অন্য ব্লকের কর্মকগণ বরং বড় ধরনের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে; (৫) ব্লকের সদস্যগণ নিজেদের ব্লকের উদ্দেশ্যাবলির চেয়ে সার্বজনীন কর্মকসমূহের উদ্দেশ্যাবলিকে কম গুরুত্ব দেয়; এবং (৬) সার্বজনীন কর্মকসমূহ ব্লকদ্বয়ের মধ্যকার অসঙ্গতি কমায়, এবং কোন ব্লক কর্মক যদি বিরাট রকমভাবে পথভ্রষ্ট হয়, যথা শক্তি প্রয়োগের আশ্রয় নেয়, তবে তার বিরুদ্ধে ব্লক-বহির্ভূত সদস্য জাতীয় কর্মকসমূহকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে।

কাপলানের তৃতীয় অর্থাৎ আঁটসাট দ্বি-মেরু সিস্টেম অনেক দিক দিয়ে শিথিল দ্বি-মেরু সিস্টেমের অনুরূপ, কিন্তু এ দুটোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পার্থক্যও বিদ্যমান। আঁটসাট দ্বি-মেরু সিস্টেমে ক্ষুদ্রতর-সংখ্যক টাইপের কর্মক থাকে। সকল কর্মককে অবশ্যই প্রতিদ্বন্দ্বী ব্লকদুটোর যে কোন একটির সাথে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ থাকতে হবে; এখানে জোট-নিরপেক্ষতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ব্লকদ্বয়ের কাঠামো সিস্টেমের স্থিতাবস্থাকে প্রভাবিত করে। যদি উভয় ব্লক কর্মক প্রধান শক্তি সম্বলিত নয় এমনভাবে সংগঠিত থাকে, তবে সিস্টেমটি শিথিল দ্বি-মেরু সিস্টেমে রূপান্তর-প্রবণ হবে। সিস্টেমটি স্থায়িত্ব পাবে যদি উভয় ব্লক কর্মক প্রধানশক্তি সম্বলিতভাবে সংগঠিত হয়।

সিস্টেমের মধ্যে সংহতিমূলক কার্যসাধনের বন্দোবস্তসমূহ হয় দুর্বল নতুবা এগুলো বিরাজমান নয়। এ মডেলের বিধিসমূহও শিথিল দ্বি-মেরু সিস্টেমের ব্লক-নির্দেশিত বিধিমালার মত একই রকমের।

কাপলান-প্রকল্পিত চতুর্থ অর্থাৎ সার্বজনীন আন্তর্জাতিক সিস্টেম মডেলটি এখনও পর্যন্ত বাস্তবে পরিলক্ষিত হয়নি, কিন্তু শিথিল দ্বি-মেরু সিস্টেমের সর্বশেষ বিধিটি অনুসরণ করে সার্বজনীন কর্মকের কার্যাবলিকে সম্প্রসারিত করার ফলস্বরূপ এটি ধারণাগতভাবে উন্নীত করা সম্ভব। কাপলানের উপরে উল্লেখিত তিনটি মডেলের সাথে সার্বজনীন আন্তর্জাতিক সিস্টেমের পার্থক্য হল যে শেষোক্তটির সাব-সিস্টেম হিসেবে একটি রাজনৈতিক সিস্টেম আছে যেটা জাতীয় কর্মকসমূহ ও ব্যক্তি বিশেষকে "তাদের নিজেদের বিশেষ আলোপিত বৈশিষ্ট্য যেমন জাতি বংশের কারণে নয়, বরং নির্দিষ্ট অর্জনসমূহ" ("specific achievements rather than because of special qualities they possess, such as race")[১২] অনুযায়ী মর্যাদা ও পুরস্কার বণ্টন করে দিতে পারে। সার্বজনীন আন্তর্জাতিক সিস্টেম সংহতিমূলক কার্যসাধনের বন্দোবস্তসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে যেগুলো বিচারমূলক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদন করে। এটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিসমূহ হল : (১) সকল

http://thejobstudy.com

জাতীয় কর্মক তাদের পুরস্কার বাড়ানোর ও সুযোগ-সুবিধা পেতে প্রচেষ্টা গ্রহণ করে; (২) সকল জাতীয় কর্মক আন্তর্জাতিক সিস্টেমের সম্পদরাজি ও উৎপাদনের ভিত্তি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেয়; (৩) যখন ১নং ও ২নং বিধিদ্বয় পরস্পরবিরোধী হয়, তখন ১নং বিধিটি ২নং বিধিটির নিকট নতি স্বীকার করে, এবং ১নং বিধিটি অন্য কোন জাতীয় কর্মকের স্বল্পতম মানকে ভীতি প্রদর্শন করলে এটাকে সমগ্র সমাজের আরোপিত ভিত্তি-বিজড়িত বিবেচনাসমূহের অধীনস্থ করা হয়; (৪) তাদের নিজেদের উদ্দেশ্যাবলি অর্জন করতে সকল কর্মক শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি ব্যবহার করে; এবং (৫) আন্তর্জাতিক সিস্টেমের অঙ্গসমূহে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ আন্তর্জাতিক সিস্টেমের প্রয়োজন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেন।

কাপলান-প্রকল্পিত পঞ্চম অর্থাৎ প্রধানশক্তি সম্বলিত আন্তর্জাতিক সিস্টেমটিও পূর্বে পরিদৃষ্ট না হলেও তাঁর কৃতিত্ব এখানে যে তিনি এটার উদ্ভব যেভাবে হতে পারে বলে উল্লেখ করেছিলেন, প্রায় সেভাবেই ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্বে একমাত্র টিকে থাকা পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীন অনুরূপ সিস্টেম বাস্তবে রূপ পেয়েছে। তিনি এটাকে অনির্দেশিত অথবা নির্দেশিত হতে পারে বলে উল্লেখ করলেও দ্বি-মেরু অথবা সার্বজনীন সিস্টেম ভেঙে এটিতে রূপ পরিগ্রহ করলে যে সেটি অনির্দেশিত না হয়ে বরং নির্দেশিত হবে সে ব্যাপারে যথার্থই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এখানে মুখ্য কর্মকসমূহ যারা তারা জাতীয় কর্মক নয়, বরং স্বার্থধারী গ্রুপসমূহ। কর্মকসমূহকে আরোপিত বিচারের মানদণ্ড (criteria), যেমন তাদের বৈশিষ্ট্যাবলি, যার মধ্যে জাতি-বংশ ও বর্ণ অন্তর্ভুক্ত, অনুযায়ী পুরস্কার বণ্টন করা হয়। এটি অতি দীর্ঘস্থায়ী হবার সম্ভাবনা বেশি, কারণ বাইরের কোন রাজনৈতিক সিস্টেম এটির বিরুদ্ধে স্থানীয় বিদ্রোহকে সাহায্য করার সামর্থ্য রাখে না। তাই প্রধানশক্তি সম্বলিত সিস্টেম একবার প্রতিষ্ঠিত হলে এটাকে স্থানচ্যুত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

কাপলান-প্রকল্পিত ষষ্ঠ ও সর্বশেষ অর্থাৎ একক ভেটো সিস্টেমটিরও কোন বাস্তব অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হয়নি। এখানে কোন সার্বজনীন কর্মক নেই। তিনি যেভাবে উল্লেখ করেছেন, একক ভেটো সিস্টেমটি হবসিয়ান সিস্টেমের (Hobbesian system) মত যেখানে "সকলের স্বার্থাবলি পরস্পরবিরোধী—বস্তুত, দ্বন্দ্বে লিপ্ত—কিন্তু যেখানে প্রত্যেক কর্মক অন্যকে তার প্রতি যেটা করতে দিবে না অন্যের প্রতি সেটা না করার প্রাকৃতিক আইনের অতি অনুকূল বিধির প্রতি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখায়" ("the interests of all were opposed—were, in fact, at war—but in which each actor responded to the negative golden rule of natural law by not doing to others what he would not have them do to him.")।[১৩] একমাত্র যে শর্তে একক ভেটো সিস্টেম সম্ভব তা হল যদি সকল কর্মকের নিকট অন্য কর্মককে ধ্বংস করে দেবার সামর্থ্য রাখে এরূপ অস্ত্রশস্ত্র থাকে। অপরিহার্যভাবে, এ সিস্টেমটি সম্পূর্ণ, সার্বজনীন পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তারের মাধ্যমে উদ্ভূত হতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে এটা পরিস্ফুট যে তাঁর প্রত্যেকটি মডেলে কাপলান যে বিষয়গুলো নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন তা হল : (১) সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠানিক কেন্দ্রবিন্দু, যার

Go to Contents
http://thejobstudy.com

মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কর্মকের উদ্দেশ্যাবলির প্রকৃতি ও এগুলো অর্জন করতে কাজে লাগানোর মত তাদের দখলে থাকা হাতিয়ারসমূহ; (২) পুরস্কার বণ্টন, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সিস্টেম অথবা সাব-সিস্টেম কর্তৃক কতটুকু পরিমাণে তা বণ্টিত হয়; (৩) কর্মকদের জোটভুক্ত হবার ব্যাপারে পক্ষপাত; (৪) রাজনৈতিক কার্যাবলির পরিধি ও নির্দেশনা; এবং (৫) তাদের আচরণের ব্যাপারে কর্মকগুলোর নমনীয়তা ও উপযোগী করে নেবার ক্ষমতা। এভাবে বাস্তব জগতের আন্তর্জাতিক সিস্টেমের চেয়ে কাপলানের মডেলগুলোকে কম জটিল মনে হলেও এগুলো এমনভাবে পরিকল্পিত হয়েছে যাতে বাস্তব জগতের সাথে তুলনা করাকে সহজতর করতে উপাত্তের অর্থপূর্ণ ক্রমপর্যায়ানুসারে সাজান ও সামষ্টিক-পর্যায়ে (macrolevel) তত্ত্ব নির্মাণের ব্যাপারে অবদান রাখতে পারে।

শক্তির বণ্টন, মেরুসংখ্যা ও যুদ্ধ-বিগ্রহের সঙ্ঘটন (Distribution of Power, Polarity and the Incidence of War)

শক্তির বণ্টন ও যুদ্ধ-বিগ্রহের সঙ্ঘটন নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কয়েকজন তাত্ত্বিক বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে তত্ত্ব নির্মাণ করেছেন।[১৪] সিস্টেম তাত্ত্বিকগণও ব্যাপকভাবে আলোচনার দাবি রাখে এরূপ বিষয়টি নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছেন। যদিও কাপলান তাঁর মডেলগুলোতে অনেকগুলো আন্তর্জাতিক সিস্টেমের কার্যসম্পাদনকে বুঝার উপযোগী "অপরিহার্য বিধিমালার" ("essential rules") উপর দৃষ্টিপাত করেছেন, অন্যান্য পণ্ডিত যেমন কার্ল ডয়েস, জে ডেভিড সিঙ্গার (J. David Singer), কেনেথ ওয়াল্টয (Kenneth N. Waltz) ও রিচার্ড রোজক্রান্স প্রমুখ যুদ্ধের পুনঃপুনঃ সঙ্ঘটন ও তীব্রতার (frequency and intensity of war) জন্য বহুমেরুতা (multipolarity) ও দ্বি-মেরুতার (bipolarity) সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে তত্ত্ব প্রদান করেছেন। তাঁদের মতামত দ্বিধাবিভক্ত। ডয়েস ও সিঙ্গার যুক্তি দেখান যে, "সিস্টেম যতই দ্বি-মেরুতা থেকে বহুমেরুতার দিকে অগ্রসর হয়, যুদ্ধের পুনঃপুনঃ সঙ্ঘটন ততই হ্রাস পাবে বলে প্রত্যাশা করা উচিত" ("as the system moves away from bi polarity toward multipolarity, the frequency of war should be expected to diminish.")।[১৫] তাঁদের সাথে লক্ষণীয় বৈসাদৃশ্য প্রদর্শন করে ওয়াল্টয যুক্তি উপস্থাপন করেন যে দ্বি-মেরু আন্তর্জাতিক সিস্টেমের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের কারণে, অর্থাৎ পরাশক্তিদ্বয় ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার প্রচণ্ড বৈষম্যের কারণে এটি বহুমেরু সিস্টেমের চেয়ে অধিকতর স্থিতাবস্থা বজায় রাখার উপযোগী হবে।[১৬]

রোজক্রান্স কর্তৃক প্রস্তাবিত বিকল্প সিস্টেমটি তাদের আনুষঙ্গিক দায়ভার বাদ দিয়ে দ্বি-মেরুতা ও বহুমেরুতার ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যাবলিকে সংযুক্ত করেছে। তিনি। এটার নামকরণ করেছেন "দ্বি-বহুমেরুতা' ('bimultipolarity') যেখানে "বহিস্থ পরিসরে বিরোধিতা মেটাতে দুটো প্রধান রাষ্ট্র নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে; কিন্তু দ্বি-মেরু রাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বন্দ্বে বহুমেরু রাষ্ট্রগুলো সালিস ও সংঘর্ষ নিবারক হিসেবে কাজ করবে।

http://thejobstudy.com

কোন ক্ষেত্রেই দ্বন্দ্ব দূর হবে না, কিন্তু এটা সংযত রাখা যেতে পারে" ("the two major states would act as regulators for conflict in the external areas; but multipolar states would act as mediators and buffers for conflict between the bipolar powers. In neither case would conflict be eliminated, but it might be held in check.")।[১৭]

সিস্টেম তত্ত্বের আরেকটি বিশেষ দিক যে মেরুসংখ্যা (polarity) ও যুদ্ধের মধ্যে কোন অর্থবহ সম্বন্ধ আছে কিনা এবং থাকলেও সে সম্বন্ধের ধরন কিরূপ তা নিয়ে যারা গবেষণা চালিয়েছেন তাঁদের প্রাপ্ত ফলাফলও এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল। এ ব্যাপারে বাস্তব জগৎ থেকে উপাত্ত নিয়ে পরীক্ষামূলক গবেষণার মাধ্যমে পরস্পরবিরোধী ফলাফল পাওয়া গেছে। এর একটিতে দেখা গেছে যে শান্তিরক্ষকের ভূমিকা পালনকারী কর্তৃক কর্তৃত্বকারী এককমেরু সিস্টেমে (unipolar system) যুদ্ধ বিগ্রহের সংখ্যা অতি কম; দ্বি-মেরু সিস্টেমে যুদ্ধের সংখ্যা কম হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়; এবং বহুমেরু সিস্টেমে যুদ্ধের সংখ্যা ও যুদ্ধের ফলে মৃতের সংখ্যা অধিক। ১৮২৪ সন থেকে ১৯৩৮ সন পর্যন্ত সময়ব্যাপী সিস্টেম পরীক্ষা করে আরেকটি গবেষণায় জটিল সম্বন্ধ পাওয়া গেছে। মেরুসংখ্যা ও যুদ্ধের মধ্যে সাধারণ সরলরৈখিক সম্বন্ধের (simple linear relationship) পরিবর্তে এর গবেষকগণ যেটি শনাক্ত করেছেন তাকে বক্ররৈখিক সম্বন্ধ (curvilinear relationship) বলে অভিহিত করা হয় (নিম্নে প্রদত্ত চিত্র দ্রষ্টব্য)। আলোচিত গবেষণায় তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন যে, "দ্বি-মেরু সিস্টেমে যুদ্ধের সম্ভাবনা মাঝামাঝি ধরনের বেশি" ("the probability of war is moderately large in the bipolar system") কিন্তু সিস্টেমে যখন তিনটি বৃহৎ মেরু থাকে তখন তা অনেক পরিমাণে কম। আবার যদি নতুন মেরু যুক্ত হয় তবে এটা বেশ খানিকটা বেড়ে যায়—সিস্টেমে মেরুসংখ্যা যখন পাঁচ থাকে, তখন যুদ্ধের সম্ভাবনা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে। এরপর সিস্টেম ছয় মেরুবিশিষ্ট হলে আবার তা সুস্পষ্টভাবে হ্রাস পায়।[১৮]

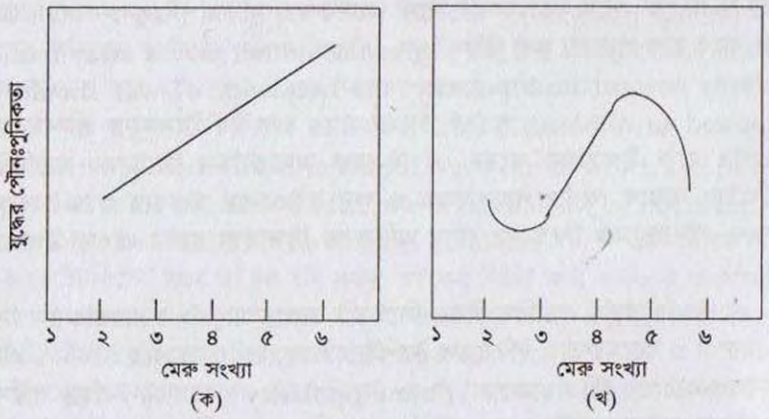

মেরুসংখ্যা ও যুদ্ধের পৌনঃপুনিকতার সরলরৈখিক (ক) ও বক্ররৈখিক সম্বন্ধ (খ)
Source : Russett and Starr, *op. cit.*, p. 111.

আবার ১৮১৬ সন থেকে ১৯৬৫ সন পর্যন্ত সময় থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে পরিচালিত আরেকটি গবেষণায় মেরুসংখ্যা এবং যুদ্ধের সংখ্যা অথবা ব্যাপ্তিকালের মধ্যে অপরিহার্য কোন সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায়নি। এর একটি কারণ হতে পারে যে উক্ত গবেষক শুধু সরল রৈখিক সম্বন্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন, কিন্তু বক্ররৈখিক সম্বন্ধের দিকটি এড়িয়ে গেছেন।[১৯]

সিঙ্গার ও স্মল (Melvin Small) দ্বিমেরু-বহুমেরু বিতর্ক ছাড়িয়ে সিস্টেমে মৈত্রীসংখ্যার পরিবর্তন কী প্রভাব রাখে সে বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে দেখতে পান যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে মৈত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে যুদ্ধের সঙ্ঘটন কমে যায়, অর্থাৎ মৈত্রীসংখ্যা ও যুদ্ধ বিপরীতভাবে সম্বন্ধযুক্ত, কিন্তু পক্ষান্তরে বিংশ শতাব্দীতে এ দুটো চলকের মান একই দিকে পরিবর্তিত হয়।[২০] এ আপাত বৈপরীত্বের ব্যাখ্যা হিসেবে বলা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মৈত্রীব্যবস্থা ছিল মূলত রক্ষণমূলক যেখানে বিংশ শতাব্দীর জন্য তা ছিল অধিকতর আক্রমণমূলক।

উইলিয়াম রিকার (William R. Riker) তাঁর নিজস্ব স্থিতাবস্থার বিধি প্রতিষ্ঠাকল্পে কাপলান-প্রকল্পিত শক্তিসাম্য সিস্টেমের বিধিমালা থেকে খানিকটা গ্রহণ করেছেন। তিনি 'আকার মূলনীতির' ('size principle') উপর গুরুত্বারোপ করেছেন যেটি অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীগণ এমন কোয়ালিশন গঠন করে যা তাদের পরস্পরের সাথে ভাগাভাগি করে নেয়া উদ্দেশ্য অর্জন করতে একত্রিত হবার জন্য যথেষ্ট, এবং প্রয়োজনের চেয়ে বৃহত্তর নয়।[২১]

সিস্টেম তত্ত্ব উন্নয়নের ম্যাকলিল্যান্ডের অবদান (Contributions of Charles A. McClelland in the development of systems theory)

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সিস্টেম তত্ত্ব উন্নয়নের ব্যাপারে ম্যাকলিল্যান্ডও বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন। তিনি বলেন যে, জাতিরাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার সম্পর্কগুলো বোঝার সুবিধার জন্য সিস্টেম তত্ত্ব একটি কলাকৌশলবিশেষ। তিনি তাঁর নিজের বিভিন্ন গবেষণামূলক লেখায় দিখেয়েছেন যে, সিস্টেম তত্ত্ব একটি সিস্টেম ও তার সাব-সিস্টেমগুলোর মধ্যকার আন্তক্রিয়াকে শনাক্তকরণ, পরিমাপ ও পরীক্ষা করে দেখার জন্য একটি সহজ কলাকৌশল। এ-তত্ত্ব একটি সিস্টেমে উদ্ভূত ও অন্য একটি সিস্টেমে প্রতিক্রিয়াশীল পুনঃ পুনঃ সংঘটিত আচরণের সংযোগকে পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ দেয় এবং এভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সিস্টেমের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার প্রকৃতি সম্পর্কে তত্ত্বীয় অন্তর্দৃষ্টি জোগায়। তিনি ইঙ্গিত দেন যে, সিস্টেমের পরিপ্রেক্ষিতে একটি জাতির আন্তর্জাতিক আচরণ ও কার্যাবলি হল দ্বিমুখী : আন্তর্জাতিক পরিবেশ থেকে কিছু গ্রহণ করাও তাকে কিছু দেয়া। এই দেয়া-নেয়ার সম্পূর্ণ ব্যাপারটাকে যখন সমগ্র জাতির বেলায় একত্রে বিবেচনা করা হয় তখনই তাকে আন্তর্জাতিক সিস্টেম বলে। ম্যাকলিল্যান্ডের মতে, এরূপ সিস্টেম কাঠামোই (systems framework) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে এক সমতা থেকে অন্যটিতে বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানান্তরের ব্যাপারে সুশৃঙ্খল পদ্ধতির জোগান দেয়।

http://thejobstudy.com

সিস্টেম তত্ত্বে ম্যাকলিল্যান্ডের বিশেষ অবদান হল এই যে, তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম অধ্যয়ন করে দেখিয়েছেন, কখন ও কী অবস্থায় দুই দেশের সম্পর্ক আন্তর্জাতিক সঙ্কটে (international crisis) রূপ নেয়। এ-ব্যাপারে তাঁর গবেষণাপদ্ধতি অতি পরিষ্কার। তিনি রাষ্ট্রীয় কার্যাবলিকে ২২টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এগুলো হল আশ্বাস দেয়া, অনুরোধ করা, দোষারোপ করা, রাজি হওয়া, আলোচনা করা, মত প্রকাশ করা, অস্বীকার করা, দাবি করা, সতর্ক করা, ভীতি প্রদর্শন করা, বলপ্রয়োগ করা, ইত্যাদি। কোন রাষ্ট্রের দৈনিক কার্যাবলিকে যদি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় তবে দেখা যাবে যে, এগুলোকে সম্পূর্ণরূপে দৈব ও পূর্বসংকেতবিহীন মনে হলেও এগুলোর মধ্যে কমপক্ষে উঁচুপর্যায়ের নমুনা (pattern) পাওয়া যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক সিস্টেম কোন বিক্ষিপ্ত, আকস্মিক সিস্টেম নয়, এটা অত্যন্ত সুসংগঠিত—এটা নির্ভর করে কীভাবে একে দেখা হয় তার উপর (The international system is not a sporadic spasmodic system but an extremely organized one, depending on how it is viewed.)[২২]। ম্যাকলিল্যান্ড তাঁর গবেষণায় সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন ঘটনার পরিমাণের মাধ্যমে ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে সংঘটিত বার্লিন সঙ্কট (Berlin crisis) এবং ১৯৫০ থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে সংঘটিত কুময়-মাৎসু সঙ্কট (Quemoy-Matsu crisis) সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। বার্লিনের ব্যাপারে তিনটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা যথা বার্লিন অবরোধ, ১৯৪৮ (Berlin 'Blockade' 1948), নির্দিষ্ট সময়সীমাসংক্রান্ত সংকট, ১৯৫২ (Berlin 'Deadline' crisis, 1952) ও বার্লিন দেয়াল, ১৯৬১ (Berlin Wall, 1961) প্রভৃতি বিষয়গুলো তাঁর আলোচনার মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। অনুরূপভাবে চীনের মূল ভূখণ্ড ও ফরমোজার মধ্যকার উপকূলবর্তী দ্বীপসমূহ—ট্যাচেন্‌স্, ১৯৫৫ (Tachens, 1955) ও কুময়, ১৯৫৮ (Quemoy in 1958) নিয়ে সঙ্কটের ব্যাপারটিও তিনি বিভিন্ন ঘটনার সাহায্যে বিশ্লেষণ করে দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। বিষয়টি বোঝার সুবিধার জন্য পরবর্তী পৃষ্ঠার দেয়া গ্রাফ দ্রষ্টব্য।

BERLIN

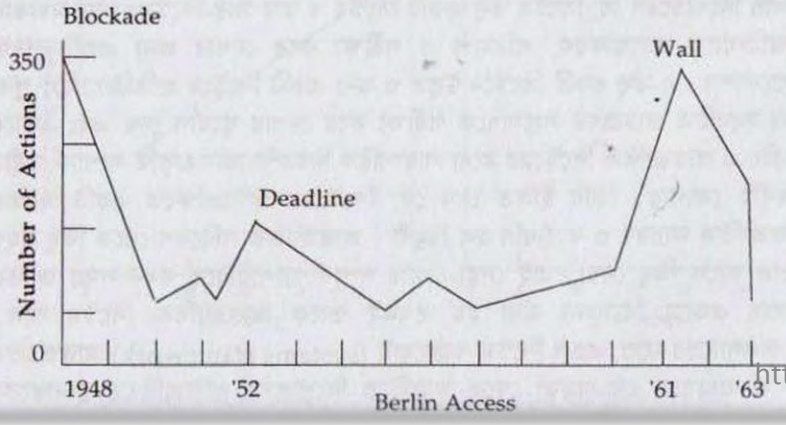

QUEMOY

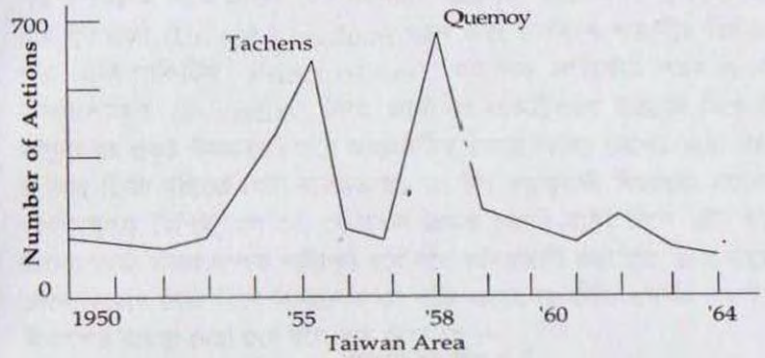

Fluctuations of international interaction, Berlin and Quemoy.
Source : Sullivan, *op. cit.*, p. 148.

Go to Contents
http://thejobstudy.com

পাদটীকা

১. দেখুন, James E. Doughetry and Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *Contending Theories of International Relations* (New York : J. B. Lippincott Co., 1971), p. 103.
২. Michael P. Sullivan, *International Relations : Theories and Evidence* (New Jersey : Prentice Hall, Inc., 1976), p. 150.
৩. দেখুন, ঐ পৃ. ১৪৫।
৪. দেখুন, ঐ।
৫. দেখুন, Dougherty and Pfaltzgraff, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২-১০৩।
৬. ঐ, পৃ. ১০৬।
৭. দেখুন, ঐ, পৃ. ১১৫।
৮. ঐ, পৃ: ১৫৬।
৯. ঐ, পৃ: ১৫৬-৫৭।
১০. ঐ, পৃ: ১৫৭।
১১. অপেক্ষক বলতে বুঝায় যে দুটো রাশি পরস্পরের সাথে এমনভাবে সম্বন্ধযুক্ত যে একটির কোন পরিবর্তন হলে অন্যটিরও অনুরূপ পরিবর্তন হবে।
১২. Dougherty and Pfaltzgraff, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫৯।
১৩. ঐ, পৃ: ১৬০।
১৪. শক্তিসাম্য তত্ত্ব দ্রষ্টব্য।
১৫. Dougherty and Pfaltzgraff, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২।
১৬. দেখুন, ঐ, পৃ: ১৬৪।
১৭. ঐ, পৃ: ১৬৫।
১৮. Russett and Starr, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১১।
১৯. ঐ, পৃ: ১১১-১২।
২০. Dougherty and Pfaltzgraff, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৩।
২১. ঐ, পৃ: ৪৫০।
২২. দেখুন, Sullivan, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭।

http://thejobstudy.com

Job Study
To make you prepared & confident

অষ্টাদশ অধ্যায়

সংহতি তত্ত্ব

INTEGRATION THEORY

সংহতি তত্ত্ব কী (What is integration theory) : সংহতি তত্ত্বের মৌলিক ধারণা হচ্ছে যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিরাজমান স্বার্থসংঘাত, দ্বন্দ্ব, ভয়, সন্দেহ, ঈর্ষা ইত্যাদি যা তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, তা ভুলে গিয়ে যদি দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের জনগণ পদ্ধতিগতভাবে একত্র হতে পারে, তবে তারা একে অপরের ভালোমন্দ এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জানতে পারবে এবং এর ফলে তাদের মধ্যকার পারস্পরিক শত্রুতা কমে যাবে। মাইকেল হ্যাস (Michael haas)-এর মতে, আন্তর্জাতিক সংহতি পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের দ্বন্দ্ব, বাদানুবাদ, উদ্বেগ ও উৎপীড়নকে রোধ করা যায় (Bridges can be built and preventive measures can be taken in the relations between nations and humans long before the outbreak of tensions, disputes, conflict or violence itself.)[১]। মূল কথা হল, যে-কোন সংহতি পদ্ধতির কাছ থেকে শান্তিপূর্ণ আচরণ আশা করা যায়।

সংহতি তত্ত্বের অন্যতম প্রধান স্থপতি কার্ল ডয়েস (Karl W. Deutsch) এ তত্ত্বটি উন্নয়নের শুরুতে নিরাপত্তা সম্প্রদায়ের (security community) প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি দু ধরনের নিরাপত্তা সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন : বহুত্ববাদী নিরাপত্তা সম্প্রদায় (pluralistic security community) ও মিশ্রিত নিরাপত্তা সম্প্রদায় (amalgamated security community)। এর মধ্যে প্রথমোক্তটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতা বৃদ্ধি করে, এবং শেষোক্তটি দুই বা ততোধিক ভূখণ্ডের সম্মিলনে একক রাষ্ট্র গঠনে ভূমিকা পালন করে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণার (১৭৭৬) পর যুদ্ধে জয়লাভ করে মার্কিন মুলুকে তেরটি ঔপনিবেশিক ভূখণ্ডের একত্রিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ ও জাতি গঠন, অষ্টাদশ

শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রাক্তন দেশ স্কটল্যান্ড, ওয়েল্‌স, আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের একত্র হয়ে যুক্তরাজ্য (United Kingdom) গঠন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শত শত প্রিন্সিপ্যালিটিস (Principalities), আংশিক সার্বভৌম শহর ও নগর, ও রাজবংশসমূহ (dynasties) নিয়ে জার্মানির একত্রীকরণ ইত্যাদি মিশ্র নিরাপত্তা সম্প্রদায়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও আন্ত:ক্রিয়া বৃদ্ধিতে যেটা ব্যবহৃত হয় তা হল বন্ধুত্ববাদী নিরাপত্তা সম্প্রদায়। এর পার্থক্যমূলক বৈশিষ্ট্য হল যে, যে সকল একক (জাতি-রাষ্ট্র) মিলে এটা গঠন করে তাদের মধ্যে সকল সম্পর্ক শান্তিপূর্ণ হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়, এবং তাদের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে সাধারণত তা শক্তি প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন ছাড়াই আপস-মীমাংসার ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে ধরে নেয়া হয়।[২]

সংহতি তত্ত্বকে বিশেষজ্ঞরা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। যোহান গালটুং (Johan Galtung)-এর মতে, 'সংহতি হচ্ছে সেই পদ্ধতি যেখানে দুই বা বহু বিষয় একত্র হয়ে একটি নতুন বিষয় গঠন করে। যখনই বিষয়গুলো একীভূত হবে, তখনই তাদের মধ্যে সংহতি স্থাপিত হবে' (Integration is the process whereby two or more actors form a new actor; when the process is completed, the actors are said to be intergrated.)[৩]। আরনেস্ট হ্যাস (Ernst B. Haas)-এর মতে, 'সংহতি হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যেখানে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ইচ্ছা করবে তাদের আনুগত্য, আশা ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে একটা নতুন কেন্দ্রের দিকে চালিত করতে, যার সাংগঠনিক কর্তৃত্ব থাকবে পূর্বের বিরাজমান জাতিরাষ্ট্রের উপর' (Integration is a process whereby political actors in several distinct national settings are persuaded to shift their loyalties, expectations and political activities toward a new centre, whose institutions possess or demand jurisdicition over the pre-existing national states.)[৪]। কার্ল ডয়েস (Karl W. Deutsch)-এর মতে, 'রাজনৈতিক সংহতি হচ্ছে এমন একটি অবস্থা যেখানে একদল লোক একটি ভূখণ্ডে সংযুক্ত হবে একটি সম্প্রদায়সুলভ মনোভাব নিয়ে এমন একটি সংগঠনে, যেখানে ঐ সংগঠনের মাধ্যমে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তারা নির্ভরযোগ্যভাবে আশা করতে পারে শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের' (Integration is a condition in which a group of people have attained within a territory a sense of community and of institutions and practices strong enough and widespread enough to assure for a ling time dependable expectations of peaceful change among its population.)[৫]।

বিশেষজ্ঞগণ একমত যে, জাতিসমূহের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার জন্য পৃথিবী আস্তে আস্তে একটি বিশ্বসম্প্রদায়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। যদিও এ-মুহূর্তে একটি বিশ্ব-সরকার বাস্তবরূপ নিচ্ছে না, তবু তাঁরা একমত নন যে, সংহতি স্থাপনের জন্য একটি

http://thejobstudy.com

রাজনৈতিক অঙ্গ (political body) গঠন অপরিহার্য কি না। ডয়েস বলেন যে, সত্যিকার সংহতিপূর্ণ সম্প্রদায় গঠনের জন্য কোন রীতিসিদ্ধ চুক্তি (formal agreement) দরকার নাও থাকতে পারে। তাঁর মতে, যে-জাতিগুলো নিজেদের মধ্যে উচ্চ এবং নিয়মিত পর্যায়ে যোগাযোগ ও লেনদেন রক্ষা করে, তারা অন্য জাতিসমূহ যারা চুক্তির মাধ্যমে আবদ্ধ, তাদের চেয়ে অধিকতর সংহতিপূর্ণ (Truly integrated communities may not necessarily be those that declared they are integrated by means of a formal agreement. Rather ... those nations that retain high and consistent levels of communications and transactions with each other may be more integrated than those that have signed agreements.)[৬]।

আচরণবাদী দশকের তত্ত্ব উন্নয়নের ধারা অনুযায়ী সংহতি তত্ত্ব এর নিজস্ব ক্ষেত্র এবং এর সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য ক্ষেত্র যেমন কার্যকারণবাদী তত্ত্ব (Functionalist theory), সিস্টেম তত্ত্ব (Systems theory), যোগাযোগ তত্ত্ব (Communications theory), সিদ্ধান্ত-গ্রহণ তত্ত্ব (Decision-making theory), শিক্ষণ তত্ত্ব (Learning theory) ইত্যাদি থেকে জ্ঞান ধার করে ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করেছে। অন্য বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ডয়েস-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি নরবার্ট উইনার (Norbert Wiener)-এর যোগাযোগ তত্ত্ব এবং টালকট পারসন্‌স্ (Talcott Parsons)-এর সিস্টেম তত্ত্ব ব্যবহার করেছেন। এ-তত্ত্ব দুটি ডয়েসকে তাঁর তত্ত্ব উন্নয়নে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। তিনি দেখিয়েছেন, যে, একটি সংহতি স্থাপনের সাফল্য কীভাবে বিভিন্ন গঠনমূলক একক ও পুরো সংহতি এককের মধ্যে বিরাজমান যোগাযোগের উপর নির্ভর করে। তিনি তাঁর সহযোগীদের সাহায্য নিয়ে উত্তর আটলান্টিক অঞ্চলে রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের উপর সংহতি তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ রচনা করেছেন। তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা বর্ণনা দিয়েছেন এমন কতগুলো প্রভাবশালী উপাদানের উপর, যেগুলো কোন সম্প্রদায়ের গঠন ও সাফল্যজনক কার্যাবলির জন্য প্রয়োজন। একই সময় তাঁরা সে-সব বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, যা সচরাচর ভাঙনের (disintegration) পথকে প্রশস্ত করে।

আঞ্চলিক সংহতির অন্যতম প্রধান উপকার হল যে এটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে আন্ত:ক্রিয়াকে উৎসাহিত করে এবং সংহতি অঞ্চলের মধ্যে গোষ্ঠীগত স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। এখন আমরা সংহতি তত্ত্ব নির্মাণে কয়েকজন বিশিষ্ট তাত্ত্বিকের অবদান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

কার্ল ডয়েস : ডয়েস গঠনমূলক এককগুলো ও পুরো সংহতি এককটির মধ্যে যোগাযোগ ও লেনদেনের ব্যাপারে জোর দিয়েছেন। কেননা তিনি মনে করেন যে, উঁচু পর্যায়ের লেনদেন বজায় থাকলে উঁচু পর্যায়ের উদ্বেগ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টির সম্ভাবনা কম (A high level of transactions is unlikely to produce high tension and conflict)[৭]। এ-দুয়ের মধ্যকার সম্পর্ক ভালোভাবে বোঝার জন্য আমরা রজার কোব ও

চার্লস এলডার (Roger Cobb and Charles Elder)-এর এতদ্‌সম্পর্কিত বর্ণনার উল্লেখ করতে পারি।

প্রথমত, কয়েক ধরনের যোগাযোগ অবশ্যই থাকবে। দ্বিতীয়ত, উভয় পক্ষের যোগাযোগ রক্ষার জন্য তাদের কোন-না-কোন স্বার্থ অবশ্যই থাকতে। তৃতীয়ত, যে-জাতিগুলো পারস্পরিকভাবে কাজ করবে তাদের মধ্যে একের সাথে অপরের সুসংহতি থাকবে। চতুর্থত, কোন বিশেষ ব্যাপারে দুই জাতির মধ্যে কার্যকলাপ বজায় থাকলে তাদের মধ্যে উদ্বেগ ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি না হওয়াই স্বাভাবিক।[৮]

এভাবে ডয়েস-এর সংহতি তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে যে, যখন বিভিন্ন এককের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়, তখন এই কার্যাবলিতে নিহিত জটিলতাও বৃদ্ধি পায় এবং এই জটিলতাগুলো দূর করার জন্য বিভিন্ন একক বিভিন্ন কার্যকলাপে লিপ্ত হয় এবং এরই একটি সুফল হল অধিকতর সহযোগিতা (As communication increases between units, the complexities inherent in such activity increase and to handle these complexities the units formalize their interactions, one result of which is greater collaboration.)[৯]।

আর্নেস্ট হ্যাস : আর্নেস্ট হ্যাস তাঁর তাত্ত্বিক কাঠামোতে (theoretical framework) বলেন যে, সংহতির সাথে অগ্রসর হওয়া অথবা এর প্রতিরোধ করা নির্ভর করে সংহতি একক গঠনে নিয়োজিত বৃহৎ দলগুলোর লাভ অর্জন অথবা ক্ষতি স্বীকারের সম্ভাবনার উপর (Decision to proceed with integration, or to oppose it, depends upon the expectations of gain or loss held by major groups within the unit to be integrated.)[১০]।

তিনি ডেভিড মিত্রানি (David Mitrany) কর্তৃক পূর্বেই উন্নীত কার্যকারণবাদী তত্ত্বকে সংস্কার করেন। কার্যকারণবাদী তত্ত্বের মতে, জাতিসমূহের মধ্যে বিরাজমান সংঘাত হল সামাজিক অসমতার ফল, যা মূলত অর্থনৈতিক সুবিধাদির অসমবণ্টনের জন্য দেখা দেয় (Conflict among states is the result of social inequality, arising primarily from the maldistribution of economic benefits.)[১১]।

হ্যাস কার্যকারণবাদী তত্ত্বের সাথে শক্তির ধারণাকে যুক্ত করে আরেক ধাপ অগ্রগতির পথে নিয়ে যান এবং বলেন যে, শক্তিকে কল্যাণমূলক কার্যাবলি থেকে পুরোপুরিভাবে পৃথক করা যায় না। তাঁর মতে, শক্তিসম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি কল্যাণমূলক কার্যাবলিতে রূপ নিতে পারে (Power oriented governmental activities evolve toward welfare oriented action.)[১২]। এ-জন্য যা দরকার তা হল একটি শিক্ষণ পদ্ধতি (learning process)। এ-কথা বাস্তবিকই সত্যি যে, কোন একটি কার্যকর ব্যাপারে সংহতি পদ্ধতির শিক্ষা অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায় এবং এভাবেই আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে পরিহার করা সম্ভব (Integrative lesson learned in one functional context will be applied in others, thus eventually supplanting international politics.)[১৩]।

Go to Contents
http://thejobstudy.com

হ্যাস তাঁর spill-over ধারণাকে উন্নত করেছেন সিস্টেম তত্ত্বের 'input-output' ধারণার সাথে মিত্রানির কার্যকারণবাদী তত্ত্বের 'ramification' মতবাদের সমন্বয়ে। Spill over-এর সংজ্ঞার জন্য আমরা ক্যাপোরাসো (James Caporaso)-র সাথে একমত হতে পারি। ক্যাপোরাসো বলেছেন যে, spill over হচ্ছে সাধারণভাবে এমন একটা পদ্ধতি, যা কোন সামাজিক বিভাগের সংহতি কার্যাবলিকে এবং অন্যান্য সম্পর্কযুক্ত বিভাগকেও ঐ একই দিকে চালনা করবে। এটা সম্ভব হয় একটা শিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে। Input-output-এর মূলনীতি সম্পর্কে হ্যাস-এর মত হচ্ছে যে, গঠনমূলক এককগুলোর সরকারি নীতি হচ্ছে input, যেগুলো প্রক্রিয়াজাত হয়ে সংহতি পদ্ধতির মাধ্যমে যৌথ সিদ্ধান্ত হিসেবে output হয়ে বেরিয়ে আসে।

অমিতাই এটজায়নি (Amitai Etzioni) : আন্তর্জাতিক সংহতি ও যোগাযোগ তত্ত্বে যাঁরা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে অমিতাই এটজায়নি অন্যতম। তিনি অত্যন্ত জোরালো যুক্তির সাহায্যে তাঁর মতামতকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তিনি অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে সংহতির জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হিসেবে বর্ণনা করেন (Inter-dependence among the participating units as a necessary precondition for integration.)[১৪]। কার্ল ডয়েস-এর যোগাযোগ তত্ত্ব এবং হ্যাস-এর কার্যকারণবাদী তত্ত্ব থেকে ধার করে এটজায়নি বলেন যে, সংহতি পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান যোগাযোগ পরস্পরের জন্য সুফল বয়ে আনবে। Spill over-এর ধারণা অনুযায়ী যে-কোন ক্ষেত্রে সংযোজন (unification) অপর একটি ক্ষেত্রের সংযোজনের বেলায় অগ্রবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে।

সংহতি ও যোগাযোগ তত্ত্বে এটজায়নির বিশেষ অবদান এই যে, তিনি সিদ্ধান্ত প্রণয়নের ফলাফল হিসেবে সংহতি ও যোগাযোগ তত্ত্বকে নির্দেশিত করেছেন, যেখানে স্বার্থের বিষয়টি প্রাধান্য লাভ করেছে। এ-দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন দেশ নিজেরা যেমন সংহতি পদ্ধতিতে যোগদান করে, সেরূপ অন্যদেরকেও এ-ব্যাপারে প্ররোচিত করে। কারণ তারা মনে করে যে, এভাবেই তাদের স্বার্থ অধিকতরভাবে সংরক্ষিত হবে। সংহতি ও যোগাযোগ তত্ত্বের উপর এটজায়নির মডেল সংহতি পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহকে তাদের নিজস্ব শক্তি সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ দেয়। তিনি মনে করেন যে, 'একটি নতুন সম্প্রদায় গড়ে ওঠে, যখন অন্যদের তুলনায় একটি অধিকতর শক্তিশালী রাষ্ট্র সংযোজন পদ্ধতিটি পরিচালনা করে' (A new community is formed ... when a nation more powerful than the other potential members 'guides' the unification process.)[১৫]।

এটজায়নির প্রতিজ্ঞাসমূহের (propositions) মধ্যে দুটি সর্বাধিক গুরুত্বের দাবিদার। প্রথমত, অল্প কয়েকটি এলিট (elite) ইউনিটের মিলনের ফলে যে-দৃঢ় বন্ধন গড়ে ওঠে, তা অনেকগুলো এলিট ইউনিটের সমন্বয়ে গঠিত ঐক্যজোটের চেয়ে অধিকতর সাফল্য লাভ করবে বলে মনে হয়। কারণ যদি এলিট ইউনিটের সংখ্যা বেশি

থাকে তবে তাদেরকে অনেক বেশি সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মোকাবিলা করার সম্ভাবনা বেশি (Unions with fewer elite units are more likely to succeed than unions with many elite units, since the greater the number of elite units, the more formidable are likely to be the problems which must be resolved.)[১৬]। দ্বিতীয়ত, যে-ঐক্যব্যবস্থায় সদস্যদেশসমূহের প্রত্যেকেই সমানভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে, তা অন্য যে-কোন ঐক্যের চেয়ে অধিকতর সাফল্য লাভ করবে বলে মনে হয়, যেখানে প্রত্যেক সদস্যদেশের সমান ভূমিকা পালনের সুযোগ নেই (Egalitarian ... unions ... are more likely to succeed than non-egalitarian unions.)[১৭]।

যোহান গালটুং : যোহান গালটুংও আন্তর্জাতিক সংহতি ও ও যোগাযোগ তত্ত্বে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত নিপুণভাবে বিবৃত করেছেন। আন্তর্জাতিক সংহতি ও যোগাযোগ সম্পর্কে তাঁর ধারণা এই যে, এ-পদ্ধতি পুরো সংহতি ব্যবস্থা ও এর গঠনে সহায়তাকারী অংশগুলোর মধ্যে ভাববিনিময়ের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। তিনি আরও বলেন যে, এই পদ্ধতি ততদিনই ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি লাভ করবে এবং ধীরে ধীরে স্থায়িত্ব লাভের দিকে এগিয়ে যাবে, যতদিন এতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকেই এর প্রতি দৃঢ় সমর্থন দিয়ে যাবে। (Integration develops and endures so long as the unit is supported by its component parts.)[১৮]। এ-সমর্থন input হিসেবে কাজ করে, যেমন অংশগ্রহণকারী এককগুলোর পুরো সংহতি এককটির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ অথবা এর জন্য ব্যয় বরাদ্দ করা। পুরো সংহতি এককটির স্থায়িত্ব নির্ভর করে এটা তার অংশগ্রহণকারী অঙ্গগুলোকে কতটুকু output প্রদান করতে সক্ষম তার উপর। এই output অর্থাৎ সুফলগুলোর মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজ নিজ দেশের ভাবমূর্তি যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে সহায়তাদান, শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়ন, যেমন রপ্তানি বাজার সৃষ্টি এবং উন্নতমানের জীবনযাত্রা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি (Support forms an input such as acts of allegiance or the allocation of resources from the parts to the whole ... The existence of the integrated unit depends upon its ability to offer outputs to its parts. Such outputs include the provision by a nation of a sense of identity to individuals, ensuring protection from enemies, or furnishing economic gains such as markets and high living standards.)[১৯]।

অন্য বিখ্যাত পণ্ডিতগণ যাঁরা সংহতি তত্ত্বের উপর গবেষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে জোসেফ নায়ই (Joseph S. Nye), হেয়ার্ড আলকার (Hayward Alker), ডোনাল্ড পুচালা (Donald Puchala), অ্যালান পেলস্কি (Alan L. Pelowski) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

http://thejobstudy.com

পাদটীকা

১. See Michael P. Sullivan, *International Relations : Theories and Evidence* (New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1976), p. 308.
২. See K. J. Holsti, *International Politics : A Framework for Analysis* (Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 5th edition, 1988), p. 435.
৩. See James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *Contending Theories of International Relations* (New York : J. B. Lippincott Co., 1971), p. 283.
৪. See *Ibid.*, p. 281.
৫. See *Ibid.*, P. 282.
৬. Sullivan, *op. cit.*, p. 210.
৭. *Ibid.*, P. 212.
৮. *Ibid.*
৯. *Ibid.*
১০. Dougherty and Pfaltzgraff, *op. cit.*, p. 293.
১১. See sullivan, *op. cit.*, p. 212.
১২. Dougherty and Pfaltzgraff, *op. cit.*, p. 293.
১৩. *Ibid.*
১৪. *Ibid.*, p. 288.
১৫. See Sullivan, *op. cit.*, p. 213.
১৬. See Dougherty and Ptaltzgraff, *op. cit.*, pp. 289-290.
১৭. *Ibid.* p. 290.
১৮. *Ibid.*, p. 283.
১৯. *Ibid.*

Go to Contents
http://thejobstudy.com

ঊনবিংশ অধ্যায়

সিদ্ধান্ত প্রণয়ন কাঠামো

DECISION MAKING FRAMEWORK

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের উদ্দেশ্য হল রাষ্ট্র কখন সহযোগিতামূলক আচরণ প্রকাশ করে এবং কখন আক্রমণাত্মক মনোভাব পোষণ করে তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা। যেহেতু রাষ্ট্র শুধু বিমূর্ত সত্তা এবং সিদ্ধান্ত প্রণেতাদের কার্যাবলির মাধ্যমেই তার আচরণ প্রকাশ পায়, তাই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যয়নে তাঁদের কার্যধারা বিশ্লেষণ অত্যাবশ্যক। এ-দিক থেকে বিচার করলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যয়নে সিদ্ধান্ত প্রণয়ন যে শুধু একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তাই নয়, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাত্ত্বিকদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের একটি প্রধান আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুও বটে।

বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা ও রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাবার ফলে এখন আর কোন দেশের পক্ষেই বিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভব নয়। সব রাষ্ট্রেরই কোন-না-কোন প্রয়োজন মেটাতে বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে হয়। পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমেই এ-ধরনের সম্পর্ক বজায় রাখা হয়। পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রণেতাগণ বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। বস্তুতপক্ষে সিদ্ধান্তের গুণাবলির উপরই পররাষ্ট্রনীতির সার্থকতা অথবা ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে। সিদ্ধান্তের গুণাবলি আবার অনেকগুলো উপাদানের উপর নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পণ্ডিত ও গবেষকগণ এ-উপাদানগুলো অনুধাবন করতে ইচ্ছুক এবং তাঁদের সাম্প্রতিক গবেষণার অনেকটা মনোযোগ উন্নত সিদ্ধান্তের শর্তাবলি উন্মোচনের দিকেই নিবিষ্ট করেছেন। যদিও তাঁদের মূল লক্ষ্য এতদ্‌সম্পর্কিত তত্ত্ব উদ্ভাবন করা, তবু যতদিন পর্যন্ত এটা সমাধা করা সম্ভব না হয়, তাঁরা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। ইতোমধ্যেই তাঁরা সিদ্ধান্ত প্রণয়নের অনেক মডেল তৈরি করেছেন। বর্তমান অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হল এ-সকল মডেলসংবলিত সিদ্ধান্ত প্রণয়নের কাঠামো সম্পর্কে ধারণা দেয়া। একই সাথে সংকলটকালীন সিদ্ধান্ত প্রণয়ন সম্পর্কেও এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

http://thejobstudy.com

এ-অধ্যায়ের শুরুতেই সিদ্ধান্ত প্রণয়নের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এরপর সিদ্ধান্ত প্রণয়নের কাঠামোকে বোঝানোর জন্য এতদ্‌সম্পর্কিত বিভিন্ন মডেল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, সিদ্ধান্ত প্রণয়নসম্পর্কিত গবেষণা এখন পর্যন্ত পরিপূর্ণ তত্ত্বের মর্যাদা অর্জন করতে পারেনি। তাই আমরা ধারণাগত কাঠামো (conceptual framework) কথাটি ব্যবহার করব যার মধ্যে অনেকগুলো মডেলকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। পরিশেষে সংকটকালীন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত প্রণয়ন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করা হবে।

সিদ্ধান্ত প্রণয়ন কী?

সিদ্ধান্ত প্রণয়নকে সংক্ষেপে অনেকগুলো ব্যবহারযোগ্য বিকল্প থেকে বেছে নেয়া বলা যেতে পারে, যেখানে এগুলোর কার্যকারিতার ব্যাপারে কিছুটা অনিশ্চয়তা বিদ্যমান থাকে। জাতীয় রাজনীতির চেয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে, বিশেষত পররাষ্ট্র নীতির সিদ্ধান্ত প্রণয়নের ব্যাপারে, অনিশ্চয়তা আরও বেশি থাকে, কারণ অন্যান্য দেশ কী করবে সে-সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি অনুধাবনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত প্রণয়ন পদ্ধতিটি অভিনব ব্যাপার নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সিদ্ধান্ত প্রণয়নের ব্যাপারটি সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যদিও এ-ধারণাটি কূটনৈতিক ইতিহাসের নানা বর্ণনায় ও সরকারি কার্যকলাপের মধ্যে বহু পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে গ্রিক ঐতিহাসিক থুকিদিদিস (Thucydides) তাঁর বিখ্যাত *The Peloponnesian War* নামক গ্রন্থে বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দের যুদ্ধ ও শান্তি, মৈত্রীজোট ইত্যাদি সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন। এ-দিক থেকে বিচার করলে তাঁকে সিদ্ধান্ত প্রণয়নের আদি তাত্ত্বিক বলে অভিহিত করা যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে ম্যাকিয়াভেলি (Niccolo Machiavelli) তাঁর *The Prince* নামক গ্রন্থে রাজপুত্র ও অন্যান্য নীতিনির্ধারককে উপদেশ দিয়েছেন যে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থসংরক্ষণের জন্য তাঁদের কী ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত।

প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নতুন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র অর্জনে কোন্ কৌশলসমূহ মিতব্যয়িতার দিক থেকে আকর্ষণীয়, তা নির্ণয়ের জন্য ষাটের দশকে সরকারি কার্যপরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, সিদ্ধান্ত প্রণয়ন পদ্ধতিটি কাজে লাগানো শুরু করেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এরপর তাত্ত্বিকগণ সংকটজনক পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত প্রণয়নের ব্যাপারটির উপর অধিক মনোযোগ দিতে থাকেন।

যেহেতু অর্থনীতি ও ব্যবসায় প্রশাসনের পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত প্রণয়নের কাঠামো উন্নয়নে প্রথমদিকে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন, তাই এখানে বেনথামীয় উপযোগবাদের (Benthamite utilitarianism) অনেক পূর্বানুমান (assumption) বিদ্যমান যা সামাজিক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে যুক্তি ও শিক্ষার উপর জোর

দেয়। এটা ধরে নেয়া হয় যে, যিনি সিদ্ধান্ত নেবেন, তিনি একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি, যিনি পরিষ্কারভাবে জানেন যে, তাঁর সামনে কী কী বিকল্প বিদ্যমান এবং এগুলো কী ফলাফল বয়ে আনবে তা হিসেব-নিকেশ করে যিনি অবাধভাবে মূল্যাবধারণের দিক দিয়ে কোন্‌টি অধিক গুরুত্ব পেতে পারে তা যথাযথভাবে নির্ণয়ে সক্ষম।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রণয়নকে একটি পদ্ধতি হিসেবে বর্ণনা করা যায়, যা পররাষ্ট্রনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনেকগুলো বিকল্প কার্যক্রম থেকে কোন্‌টি পছন্দ করবেন, সে-সম্পর্কে আলোকপাত করে। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই মনে করেন যে, সর্বোৎকৃষ্ট সিদ্ধান্ত হল সেটি, যা বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন। কিন্তু বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন বলতে কী বোঝায় এ নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক আছে। সহজভাবে বলতে গেলে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন বলতে বোঝায় অভীষ্ট লক্ষ্যের সাথে উপায়ের সংগতি রক্ষা করার সামর্থ্য। একই সাথে এটা নিশ্চিত করা যে, লক্ষ্য অর্জনের জন্য কার্যক্রম হাতে নিতে হয় এবং কিছুসংখ্যক লক্ষ্য অন্যগুলোর চেয়ে অধিকতর পছন্দনীয় বলে বিবেচিত হতে বাধ্য।

সিদ্ধান্ত প্রণয়নের ধারণাগত কাঠামো—বিভিন্ন মডেল

সিদ্ধান্ত প্রণয়নের ধারণাগত কাঠামো সম্পর্কে আলোকপাত করতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় রবিনসন (James Robinson) ও স্নাইডারের (Richard Snyder) বিখ্যাত উক্তি : 'সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনুসন্ধানের প্রধান উদ্দেশ্য হল সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া কেন ও কীভাবে সিদ্ধান্তের ফলাফলকে প্রভাবিত করে তা নির্ধারণ করা।'[১] অন্য কথায় বলা যেতে পারে যে, বিভিন্ন বহিঃউদ্দীপক সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়া এবং সেই সাথে সিদ্ধান্তকে কীভাবে প্রভাবিত করে সে-সম্পর্কে আলোচনা করাই সিদ্ধান্ত প্রণয়ন পদ্ধতির আলোচ্য বিষয়। এটা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ফলাফল আসবে কি না, তা নির্ধারণের ব্যাপারে চেষ্টা করে এবং সেই সাথে বিভিন্ন পরিস্থিতি, ব্যক্তিবর্গ ও সংগঠনের সমবায়ে বিভিন্ন নীতি উৎপাদিত হবে কি না তাও নির্ধারণ করতে সচেষ্ট হয়।[২] এ-বিষয়ে অবহিত হবার জন্য তাত্ত্বিকগণ অনেকগুলো সিদ্ধান্ত প্রণয়ন মডেল উদ্ভাবন করেছেন।

এভাবে সিদ্ধান্ত প্রণয়নের ধ্রুপদী মডেলে (classical model) যেহেতু এটা ধরে নেয়া হয় যে, নীতি-নির্ধারকগণ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, তাই এ-মডেল অনুযায়ী তাঁরা উপযোগিতা ও সম্ভাব্যতা এ-দুটো মৌল মাত্রা হিসেব করে স্বভাবতই ঐ ধরনের সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করবেন, যা প্রত্যাশিত উপযোগিতাকে সর্বোচ্চ মাত্রায় বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেয়।[৩] স্নাইডার মনে করেন, এটা ধরে নেয়া যেতে পারে যে, সিদ্ধান্তপ্রণেতাগণ গুরুত্বের দিক দিয়ে যেটি স্পষ্ট পছন্দনীয়, তার ভিত্তিতে কাজ করবেন, কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে, এ-ধরনের পছন্দ পুরোপুরিভাবে তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা নয় বরং তিনি যে-প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ করছেন তার নীতিমালা, দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে যারা জড়িত তাঁদের নিকট যে-তথ্য আছে, তার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে।[৪]

http://thejobstudy.com

সিদ্ধান্ত প্রণয়নকে যুক্তিসংক্রান্ত প্রণালী হিসেবে কল্পনা করা হলেও (যে-অর্থে মানুষ তার অভীষ্ট লক্ষ্য ঠিক করে এবং তা সর্বাধিকভাবে অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় উপায় অবলম্বন করে) হার্বার্ট সাইমন (Herbert Simon) স্মরণ করিয়ে দেন যে, মানুষ প্রায়শ সর্বাধিক মাত্রায় লক্ষ্য অর্জনে না গিয়ে (কারণ এ-ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য) শুধু 'সন্তোষজনক" একটি অবস্থায় পৌঁছাতে চায় অর্থাৎ ব্যবহারযোগ্য বিকল্পগুলোকে ক্রমানুযায়ী অথবা ক্রমোন্নতি অনুযায়ী সাজিয়ে এমন অবস্থায় আসতে চায়, যেখানে তাদের নির্দিষ্টসংখ্যক প্রয়োজনীয়তা মেটে।[৫] চার্লস লিন্ডব্লমও (Charles Lindblom) অনুরূপভাবে 'পূর্ণাঙ্গভাবে-যুক্তিসংক্রান্ত' মডেলের সম্ভাব্যতার বিষয়ে প্রশ্ন তুলে যুক্তি প্রদর্শন করেন, মানুষের পক্ষে শুধু যে এরূপ পদ্ধতি নিবিড়ভাবে অনুসরণ করাই দুঃসাধ্য তাই নয়, অনেক সময় তাদেরকে এ-মডেলের মূল পূর্বানুমানগুলোকে লঙ্ঘন করতে হয়।[৬] এভাবে 'সর্বোত্তম' নীতি যে সর্বাধিকভাবে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে, এমন কোনো কথা নেই, বরং যেটির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রণেতাগণ মনে করেন যে, পরিশেষে তাঁরা একমত হতে পারবেন সেটিই সাধারণত হয়ে থাকে।

সাইমন মনে করেন যে, তাঁরা সিদ্ধান্ত প্রণয়ন এককসমূহের বিকল্পগুলোকে অনুক্রমানুযায়ী পরীক্ষা করে দেখেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না নির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুযায়ী কোন একটিকে গ্রহণ করতে পারেন, অর্থাৎ তাঁরা অসন্তোষজনক সমাধানসমূহ বাতিল করতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁরা পর্যাপ্তভাবে কোন সন্তোষজনক সমাধানে একমত হতে পারেন।[৭] এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, তাঁর এ-তত্ত্বের জন্য সাইমন ১৯৭৮ সনে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। সাইমন ও লিন্ডব্লমের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সিদ্ধান্ত প্রণয়ন শুধু একটি বুদ্ধিগত পদ্ধতি নয়, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নীতিনির্ধারকদের অন্তর্দৃষ্টি, উপলব্ধি ও সৃষ্টিশীল স্বজ্ঞা, এটা সামাজিক ও আপাতদৃষ্টিতে প্রায় যান্ত্রিক পদ্ধতির একটি ব্যাপারও বটে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রণয়নের উপর প্রথম দিককার একজন বিশিষ্ট গবেষক স্নাইডার সিদ্ধান্ত প্রণয়ন পদ্ধতিতে অভিপ্রায়গত বিশ্লেষণকে একটি বিরাট নির্ণায়ক হিসেবে গুরুত্বারোপ করেন।[৮] তিনি বলেন যে, তাত্ত্বিকদের উচিত সিদ্ধান্ত-প্রণেতাদের ব্যক্তিগত অতীতের মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের অনুসন্ধানে না গিয়ে বরং তাঁদের কার্যাবলির সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে জানার জন্য প্রধানত সচেষ্ট থাকা।[৯]

স্নাইডার, ব্রুক (H. W. Bruck) ও স্যাপিনের (Burton Sapin) পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রণয়নের অধ্যয়নে তাঁরা ধরে নেন যে, আইনসম্মতভাবে যাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে জড়িত, শুধু তাঁরাই বিবেচিত হবে। সিদ্ধান্তসমূহের তুলনা ও ব্যাখ্যার জন্য তাঁরা তিনটি মাত্রার (dimension) উল্লেখ করেন। প্রতিটি মাত্রায় থাকবে একগুচ্ছ করে চলক, যেগুলো সিদ্ধান্ত প্রণয়ন সংক্রান্ত আচরণকে নির্ধারণ করবে। এর প্রথমটিকে বলা হয় 'যোগ্যতার পরিধি' (sphere of competence), যা সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রতিষ্ঠান অথবা এককের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করে। এখানে দেখা হয়, এটার গঠন মজবুত অথবা শিথিল কি না, এর পরিবর্তনের ক্ষমতা আছে কি না এবং এতে কোন পর্যায়ের

Go to Contents
http://thejobstudy.com

আমলাগণ উপস্থিত, ইত্যাদি। দ্বিতীয়টি 'যোগাযোগ ও তথ্য' (communication and information) গুচ্ছ নামে অভিহিত, যা কোন প্রতিষ্ঠানে কী তথ্য আসে এবং প্রতিষ্ঠানটি সে-তত্ত্ব গ্রহণের ব্যাপারে কতটুকু নমনীয়, তা নিয়ে আলোচনা করে। তৃতীয়ত, 'অভিপ্রায়মূলক' (motivational) চলকগুচ্ছ পুরো সিদ্ধান্ত প্রণয়ন এককটির উদ্দেশ্যাবলি, এর সাথে জড়িত সবার আদর্শ ও নৈতিক মান ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত।[১০]

১৯৬২ সনে কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্তসমূহ বোঝার সুবিধার জন্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আরেকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত গ্রাহাম এলিসন (Graham T. Allison) তিনটি 'ধারণাগত মডেল' উদ্ভাবন করেছেন, যা সঠিকভাবে পররাষ্ট্রনীতির কার্যাবলি ও সিদ্ধান্তসমূহ ব্যাখ্যার জন্য বিশেষ উপযোগী। তিনি তাঁর প্রথম মডেলটিকে 'যৌক্তিক কর্মক' মডেল (Rational Actor model) হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, অধিকাংশ পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষক মনে করেন এবং সরকারি আচরণকে যৌক্তিক কর্মক অথবা ধ্রুপদী মডেলের আলোকে ব্যাখ্যা করেন, যেখানে নীতি বাছাইকে অভিন্ন সরকারি কার্যাবলি হিসেবে দেখা হয়, যা কমবেশি অভিপ্রায়মূলক অর্থাৎ বিশেষ উদ্দেশ্যাবলি অর্জনের যৌক্তিক উপায় হিসেবে গ্রহণ করা হয়।[১১] আরও পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের মতো যৌক্তিক কর্মক মডেলেও ধরে নেয়া হয়, যে-কোন ব্যক্তি যত সীমাবদ্ধতার ভেতরেই বাছাই করতে বাধ্য হোন না কেন, তিনি তাঁর সামনে যে-বিকল্পগুলো পাবেন, সেগুলোকে সুবিধার ক্রমানুযায়ী সাজাতে এবং এগুলোর মধ্য থেকে সর্বোত্তমটিকে গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন। এভাবে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তাঁদের উদ্দেশ্যাবলিকে পরিষ্কাররূপে নির্ধারণ করতে ও তাঁদের সামনে যে-বিকল্পগুলো আছে, সেগুলোর প্রত্যেকটির সম্ভাব্য ফলাফর সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে পারে।[১২]

যৌক্তিক কর্মক মডেলে সরকারকে একক সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয় অর্থাৎ এখানে সিদ্ধান্ত প্রণেতাদের মতদ্বৈধকে অস্বীকার করা হয়। কিন্তু যেহেতু সরকার বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত, তাই তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ, অভীষ্ট লক্ষ্য ও মতামতও এতে প্রতিফলিত হয়। তাই সিদ্ধান্ত প্রণেতাগণ কদাচিৎ এক সুরে কথা বলেন। এ-সত্য মনে রেখেই এলিসন তাঁর দ্বিতীয় ও তৃতীয় মডেল উপস্থাপন করেছেন।

এলিসনের দ্বিতীয় মডেল 'প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি মডেল (Organizational Process model) নামে অভিহিত। এতে বলা হয় যে, সরকার গঠনকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সিদ্ধান্ত প্রণয়নের জন্য ঐ ধরনের তথ্যাদি সরবরাহ করবে, যা তাদের জন্য হিতকর এবং অনেক সময় প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহ চেপে যেতেপারে।[১৩] উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৬১ সনের পিগস উপসাগরে (Bay of Pigs) ব্যর্থ পরিণতির সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (CIA) কিউবার ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে ক্ষমতাচ্যুত করার সম্ভাব্য সাফল্য সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট কেনেডির নিকট ত্রুটিপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে।

http://thejobstudy.com

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আইনবই, পথপঞ্জি ইত্যাদি থাকে, যা নির্দেশ করে যে, ঐ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্য কীভাবে সম্পন্ন করা হবে। এলিসন তাঁর দ্বিতীয় মডেলটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে যথার্থই বলেছেন যে, পরের দিন কী ঘটবে, তার সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় আজ কী ঘটেছে তার মাধ্যমে।[১৪] এটা বস্তুতপক্ষে সতর্ক, ক্রমবর্ধমান মডেলের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এভাবে প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি মডেলটিকে তিনটি মূল বক্তব্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় : (১) সরকার গঠিত হয় কিছুসংখ্যক শিথিলভাবে একত্রীভূত প্রতিষ্ঠান দ্বারা; (২) সরকারি সিদ্ধান্ত ও আচরণকে বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন বাছাই নয়, বরং প্রচলিত নমুনামূলক আচরণ অনুযায়ী বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলো যেভাবে কার্য নির্বাহ করে সেভাবে বুঝতে হবে; এবং (৩) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান তার কর্মসূচি সহযোগে গতকাল যেভাবে আচরণ করেছে, আজ অনেকটা সেভাবে এবং আগামীকালও আজকের মতো আচরণ করবে।[১৫]

এলিসনের তৃতীয় মডেলটি, যা 'সরকারি দর কষাকষি' মডেল (Governmental Bargaining model) নামে পরিচিত, তা যৌক্তিক কর্মক মডেল থেকে অনেকটা ভিন্নধর্মী সিদ্ধান্ত প্রণয়নের চিত্র তুলে ধরে। এ-মডেলে বলা হয় যে, যে-সব ঘটনা ঘটে, তা বুদ্ধিগত বাছাই নয়, বরং সরকারি কাজে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিভিন্ন 'দর কষাকষি ক্রীড়া'-র ফল।[১৬] সরকারি রাজনীতি মডেলটি প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি মডেল থেকেও অনেকটা ভিন্ন এই কারণে যে, প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও স্বার্থকে ছাপিয়ে এখানে যে-কোন ব্যক্তি তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও সামর্থ্যের মাধ্যমে তাঁর পছন্দসই সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব খাটাতে পারেন। এভাবে এলিসনের তৃতীয় মডেলটি ব্যক্তির 'ক্ষমতা ও দক্ষতার প্রতি বিশেষ জোর দেয়। ব্যক্তির ক্ষমতা প্রধানত সরকারে তাঁর অবস্থানের উপর নির্ভর করলেও এমন অনেকে আছেন, যাঁরা নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও দক্ষতার মাধ্যমে এই ক্ষমতাকে বাড়াতে অথবা কমাতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সময় অনেকদিন যাবৎ উইলিয়াম রজার্স পররাষ্ট্র সচিব থাকা সত্ত্বেও জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার পররাষ্ট্রনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ে অবিসংবাদিতভাবে প্রেসিডেন্টের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। অনুরূপভাবে প্রেসিডেন্ট কেনেডির সময় প্রতিরক্ষা সচিব রবার্ট ম্যাকনামারা পররাষ্ট্র সচিব ডিন রাস্কের চেয়ে পররাষ্ট্রবিষয়ে অধিক কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছেন।

কিছুসংখ্যক পণ্ডিত প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি মডেলের সাথে সরকারি রাজনীতি মডেলকে একত্র করে 'আমলাতান্ত্রিক রাজনীতি' মডেল (Bureaucratic Politics Model) খুঁজে বের করেছেন, যা প্রতিষ্ঠান ও রাজনীতি উভয়ের কিছু কিছু উপাদান বজায় রাখে। আমলাতান্ত্রিক রাজনীতি মডেলকে পররাষ্ট্রনীতি পদ্ধতি সম্পর্কে তিনটি প্রশ্নের মাধ্যমে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যায় : কে অংশগ্রহণ করেন? অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক খেলোয়াড়ের অবস্থান কে নির্ণয় করেন? এই ভিন্ন অবস্থান কীভাবে একত্র হয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত ও কার্যে পরিণত হয়? প্রথম প্রশ্নটির উত্তরের ক্ষেত্রে ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়টির উত্তরের ক্ষেত্রে ভূমিকা এবং ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপাদানসমূহ

গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি উপাদানসমূহ, যেমন, যোগাযোগের লাইন ও গঠনপ্রণালী, প্রাতিষ্ঠানিক ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগ (hierarchy) ইত্যাদি ছাড়াও উপরের দুটো বিষয় তৃতীয় প্রশ্নটির উত্তরের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।[১৭]

আমলাতান্ত্রিক রাজনীতি মডেলে কোন বিশেষ অবস্থায় সরকার কী করে তা অনেকাংশে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের মধ্যকার দরকষাকষির ফল হিসেবে দেখা উচিত। এই খেলোয়াড়গণ সরকারের অভ্যন্তরে ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগের ভিত্তিতে অবস্থান করেন (ভূমিকাসংবলিত উপাদানসমূহ)। তাঁদের মধ্যে যে-দরকষাকষি হয়, তা নিয়মমাফিক প্রদক্ষিণ পথ অনুসরণ করে (ভূমিকা ও সরকারি উপাদানসমূহ)। পরিশেষে, এই দরকষাকষি এবং ফলাফল, সিদ্ধান্ত ক্রীড়া এবং কার্যাবলি ক্রীড়াসমূহ অনেকগুলো সীমাবদ্ধতা দ্বারা প্রভাবিত হয়, বিশেষত প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি (ভূমিকা) এবং খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক দক্ষতার (ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য) দ্বারা।[১৮]

আমলাতান্ত্রিক রাজনীতি মডেল অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রণয়নে কোন একক প্রতিষ্ঠান জড়িত থাকে না, যারা একসুরে কথা বলে, বরং এখানে অনেকগুলো একক থাকতে পারে, যেগুলোর মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান। এভাবে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত আসলে আমলাতন্ত্রের বিভিন্ন শাখার প্রতিনিধিদের মধ্যে দরকষাকষির ফল। এ-সকল আমলা, কোন দৃঢ় রণকৌশলমূলক সুচিন্তিত পরিকল্পনা নয়, বরং তাঁদের আমলাতান্ত্রিক স্বার্থ ও ব্যক্তিগত সুবিধাদির চিন্তা দ্বারা অধিক পরিচালিত হন। এ-মডেলে বলা হয় যে, সিদ্ধান্ত প্রণেতাদের মধ্যে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের ধারণা তাঁদের নিজস্ব আমলাতান্ত্রিক এককের জন্য মঙ্গলকর কি না, এ-ধরনের উপলব্ধি দ্বারা পরিশ্রুত হবার প্রবণতা দেখা যায়।[১৯] মরটন হালপেরিন (Morton Halperin) অনেকগুলো পররাষ্ট্রনীতিসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন, কীভাবে সরকারের অভ্যন্তরস্থ রাজনীতি এই সিদ্ধান্তসমূহকে প্রভাবিত করেছে।[২০] আমলাতন্ত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ফ্রান্সিস রুর্ক (Francis E. Rourke) নিউটনের গতিবিষয়ক প্রথম সূত্রের প্রতিধ্বনি করে বলেছেন যে, 'স্থির আমলাতন্ত্র স্থির থাকতে চায় এবং গতিশীল আমলাতন্ত্র গতিশীল থাকতে চায়।'[২১] যা হোক, জর্জের (Alexander L. George) মতে, আমলাতন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ বিরোধ ও দরকষাকষি অধিকতর শ্রেয় সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখতে পারে, যদি তাকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ ও সমাধান করা যায়।[২২] এর কারণ হিসেবে ইরভিং জেনিস (Irving Janis)-এর বক্তব্যের উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন, সিদ্ধান্ত প্রণেতাগণ যখন গ্রুপ হিসেবে কাজ করেন, তখন যে-সকল গ্রুপ নীতির ব্যাপারে ভিন্ন মতকে হয় সূক্ষভাবে, নয় প্রত্যক্ষভাবে নিরুৎসাহিত করে দ্রুত মতৈক্যে পৌঁছে, তখন তা নিম্নমানের সিদ্ধান্তে পর্যবসিত হয়।[২৩]

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সুবিধা-অসুবিধাসমূহের বিজ্ঞ যাচাইয়ের ভিত্তির উপর গড়ে ওঠা সিদ্ধান্ত প্রণয়নের ধ্রুপদী উপযোগবাদ কাঠামো ক্রমবর্ধমান সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। যেহেতু এটা সকল প্রকার সিদ্ধান্তকে ব্যাখ্যা করতে পারে না, তাই এর বিকল্প হিসেবে জন স্টেইনব্রুনার (John D. Steinbruner) 'সাইবারনেটিক প্যারাডাইম'

http://thejobstudy.com

(cybernetic paradigm) নামে সিদ্ধান্ত প্রণয়নের একটি নতুন মডেলের প্রস্তাব করেছেন।[২৪] উদাহরণস্বরূপ তিনি টেনিস খেলোয়াড়দের সাইবারনেটিক সিদ্ধান্ত প্রণেতা হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, টেনিস খেলোয়াড়গণ প্রত্যেকবারই যখন কোন বল মোকাবিলা করেন, তখন তাঁরা আগত বলের গতি ও দিকের গাণিতিক হিসাব না কষে (এত অল্প সময়ের মধ্যে এটা সম্ভব নয়) শত-সহস্র শটের মধ্যে তাদের সুবিধাজনক একটি শটকে বেছে নেন। ঐ স্বল্প সময়ে তাঁদের একমাত্র চিন্তা থাকে বলকে বিপক্ষের কোর্টে ফেরত পাঠানো। এভাবে সাইবারনেটিক সিদ্ধান্ত প্রণয়নের মডেল উপস্থাপনকারী পণ্ডিতদের মতে, সিদ্ধান্ত প্রণয়ন মোটামুটি সহজ কাজ এবং এ-জন্য তাঁদের প্রচেষ্টা থাকে কীভাবে গাণিতিক অথবা উপযোগের জঠিল হিসাবকে যতদূর সম্ভব এড়ানো যায়।

কিন্তু তবু এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক উপাদানসমূহ উভয়ই সিদ্ধান্ত প্রণয়নকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। সিদ্ধান্ত প্রণেতাদের ধ্যানধারণা ও বাস্তব জগতের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে। তবে এ-পার্থক্য যত কম হবে, সিদ্ধান্ত প্রণয়নপদ্ধতি তত উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হবে। সাধারণত বিষয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত প্রণেতাদের ধ্যানধারণা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। তাই বিষয় বিশ্লেষণ সিদ্ধান্ত প্রণয়ন তত্ত্ব উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

সংকটকালীন সিদ্ধান্ত

সাধারণত সংকটকালীন সিদ্ধান্ত, পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক সিদ্ধান্ত ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। সংকটকালীন সিদ্ধান্তে সচরাচর খুব কমসংখ্যক উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তপ্রণেতা জড়িত থাকেন। সংকট একটা বিশেষ অবস্থাকে নির্দেশ করে, যার মধ্যে কিছুসংখ্যক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে, যথা সীমাবদ্ধ অথবা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত সময়। সাধারণ প্রথানুসারে এই সময় খুবই সংক্ষিপ্ত। এ-ধরনের অবস্থার মধ্যে সিদ্ধান্তপ্রণেতাগণ এবং তাঁদের রাষ্ট্রের প্রতি বিরাট রকমের ভীতি অন্তর্ভুক্ত থাকে, অথবা সিদ্ধান্তপ্রণেতাগণ তাঁদের মৌল মূল্যবোধের প্রতি ভীতি উপলব্ধি করেন। কোন কোন পণ্ডিত সংকটের মধ্যে আকস্মিকতার চমককে অন্তর্ভুক্ত করেন। এভাবে সংকটজনক পরিস্থিতিকে ভীতি, সংক্ষিপ্ত অথবা সীমাবদ্ধ সময় এবং বিস্ময় দ্বারা বর্ণনা করা যায়।[২৫]

সংকটকালীন সময়ে সিদ্ধান্তপ্রণেতাগণ পীড়নের (stress) মধ্যে থাকেন এবং অত্যধিক তথ্যাদি পান, যা তাঁদেরকে হয় অধিক অথবা অল্প প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার দিকে পরিচালিত করে।[২৬] সংকট যত বাড়তে থাকে, সিদ্ধান্তপ্রণেতাগণ আরও বেশি করে মনে করতে থাকেন যে, তাঁদের নিজস্ব বিকল্পসমূহের সীমা তত বেশি গণ্ডিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং সংকট গ্রহণযোগ্য বিকল্পসমূহ সম্পর্কে তাঁদের উপলব্ধিগুলোকে খর্ব করে। একই সাথে সিদ্ধান্তপ্রণেতাগণ মনে করতে থাকেন যে, তাঁদের বিপক্ষের বিকল্পসমূহ অধিকভাবে বেড়ে যাচ্ছে।[২৭]

Go to Contents
http://thejobstudy.com

১৯১৪ সনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার অব্যবহিত পূর্বে ইউরোপের বৃহৎ শক্তিবর্গ যে-ধরনের সংকটে পতিত হয় এবং ১৯৬২ সনে সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুভাবাপন্ন নিকট প্রতিবেশী কিউবায় ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েনের বিষয় নিয়ে দুই পরাশক্তির মধ্যে যে-সংকটের সৃষ্টি হয়, এই উভয় পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যে-সকল তথ্যের আদান-প্রদান হয়েছে অধ্যাপক হলস্টি (Ole R. Holsti), নর্থ (Robert C. North), ব্রডি (Richard A. Brody) ও অন্যান্য পণ্ডিত সংকটকালীন সিদ্ধান্তপ্রণয়নকে ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে তা পরিমাপের প্রচেষ্টা নেন।[২৮] তাঁরা যে-মডেল উদ্ভাবন করেন, তা প্ররোচনা-প্রতিক্রিয়া মডেল (Stimulus-Response Model) নামে সুপরিচিত। বিষয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করে তার সাহায্যে এ মডেলকে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত প্রণয়ন, বিশেষত সংকটকালীন সিদ্ধান্তপ্রণয়ন সম্পর্কিত গবেষণায় তাঁরা একটি নতুন মাত্রা যোগ করেন। এ-নতুন ধরনের গবেষণাপদ্ধতিটি সিদ্ধান্ত প্রণয়ন এককগুলোর অভ্যন্তরভাগের চাইতে তাদের পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার উপর অধিক আলোকপাত করে থাকে।

স্টানফোর্ড গ্রুপ নামে পরিচিত এ-গবেষকগণ তাঁদের গবেষণায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনাকে কেন প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করলেন, তার কারণ খুঁজতে গেলে বলা চলে যে, এ-সম্পর্কে প্রচুর পরিমাণে সরকারি নথিপত্র প্রাপ্তিসাধ্য ছিল। তদুপরি এটা সংকট তীব্রভাবে বৃদ্ধি পাবার ক্ষেত্রে একটি ধ্রুপদী উদাহরণ হিসেবে বিবেচনার যোগ্যতা রাখে।

সুনির্বাচিত ব্রিটিশ, ফরাসি, রুশ, জার্মান ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সিদ্ধান্তপ্রণেতাগণ কর্তৃক লিখিত এই ঐতিহাসিক সরকারি নথিপত্রসমূহ থেকে বিষয় বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে প্ররোচনা-প্রতিক্রিয়া মডেলে ব্যবহারোপযোগী উপাত্ত আহরণ করে তাঁরা দেখিয়েছেন যে, যে-সকল সামরিক ঘটনা ১৯১৪ সনের সংকটের জন্য দায়ী, তার মূলে সিদ্ধান্তপ্রণেতাদের কোন্ ধরনের মানসিকতা কাজ করেছে এবং এ-সংকট নিরসনের জন্য তাঁদের সামনে কোন বিকল্প খোলা ছিল কি না। এ-সম্পর্কে ফারারের (L. L. Farrar, Jr.) অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন যে, রাষ্ট্রসমূহ যে-নিয়ম মেনে চলে, তার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ১৯১৪ সনের সংকট যৌক্তিক নীতি মডেলে প্রদত্ত বিবেচনার ন্যায়সংগত পরিণতি :

> প্রত্যেক রাষ্ট্রই তাই করেছে, যা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সিদ্ধান্তপ্রণেতাদের নিকট প্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল। সকলেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, কূটনৈতিক বিজয়, কূটনৈতিক পরাজয় ও যুদ্ধ—এর মধ্য থেকে যে-কোন একটি বেছে নিতে হবে। সবাই কূটনৈতিক বিজয়কে অধিকতর পছন্দনীয় মনে করতেন, কারণ এর মাধ্যমেই সম্ভব হত কোনরকম ঝুঁকি না নিয়েও যুদ্ধের পুরস্কার লাভ করা। কিন্তু কোন একটি রাষ্ট্র শুধু তখনই কূটনৈতিক বিজয় লাভ করতে পারে, যখন অন্য রাষ্ট্র কূটনৈতিক পরাজয় স্বীকার করে নেয়। সকলেই কূটনৈতিক পরাজয়কে প্রত্যাখ্যান করে, কারণ এর ফলে কোনরকম জয় অথবা পরাজয় ছাড়াই তাঁদেরকে সামরিক পরাজয়ের মূল্য দিতে হত। কূটনৈতিক বিজয় অসম্ভব ছিল, কারণ কূটনৈতিক পরাজয় ছিল অচিন্তনীয়, কিন্তু পক্ষান্তরে যুদ্ধ ছিল কল্পনাসাধ্য।

http://thejobstudy.com

ফলস্বরূপ, যখন কোন একটিকে বেছে নেয়া একান্ত প্রয়োজনীয় বলে প্রতিভাত হয়, তখন যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়।[২৯]

১৯৬২ সনের অক্টোবর মাসের ঘটনাবলি, যা প্রথমে তীব্র আন্তর্জাতিক সংকটের আকার ধারণ করে বিশ্বকে যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল, এবং অতঃপর যুদ্ধকে এড়ানো সম্ভব হয়েছিল, তাকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পূর্ববর্তী কয়েক সপ্তাহের সিদ্ধান্ত প্রণয়নের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যদিও উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্যের ব্যাপারটিও লক্ষণীয়। ১৯১৪ সনের সংকট ব্যাখ্যা করার জন্য উন্নীত মডেলের মতো একই ধরনের আন্তঃক্রিয়া মডেল ব্যবহার করে হলস্টি, ব্রডি ও নর্থ ১৯৬২ সনের কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট সযত্নে পরীক্ষা করেন। তাঁদের প্রচেষ্টা ছিল এটা দেখানো যে, সংকটকালীন কোন্ ধরনের আচরণ যুদ্ধে রূপ পরিগ্রহ করে (যেভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়) এবং কখন সংকট নিরসন সম্ভবপর হয় (যেমনটি হয়েছিল কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের ক্ষেত্রে)।

কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকটকালীন যে-সরকারি নথিগুলোর বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়, তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ১৫টি মার্কিন, ১০টি সোভিয়েত ও ১০টি কিউবান নথি। স্ট্যানফোর্ডের গবেষকগণ বিষয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখতে পান যে, ১৯১৪ সনের মতো ১৯৬২ সনেও পুরো সংকট পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত-সময়ের উপর এমন চাপ পড়ে, যা এড়ানো ছিল প্রায় অসাধ্য। তবু প্রেসিডেন্ট কেনেডি এমন কতগুলো পদক্ষেপ নেন, যা সময়ের চাপ থাকা সত্ত্বেও অবাধ আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করে। কেনেডি অনেকগুলো বিকল্প খুঁজে বের করতে সমর্থ হন এবং এ থেকে সর্বোত্তমটিকে সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করেন।[৩০]

১৯১৪ সনের সংকটের সময়কার অনেক সিদ্ধান্তপ্রণেতার সাথে ১৯৬২ সনের কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট চলাকালীন সিদ্ধান্তপ্রণেতাদের বিরাট পার্থক্য এইখানে যে, শেষোক্ত সময় সোভিয়েত নেতাগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্যাবলিকে ব্যাখ্যা করতে কীরূপ প্রবণতা দেখাতে পারেন, সে-ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ যথেষ্ট চিন্তা করেছেন ও সূক্ষ্মানুভূতি দেখিয়েছেন।[৩১] ক্রেমলিনের নেতৃবৃন্দ যে ভুল উপলব্ধি করতে পারেন, এ-ধরনের সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ড কেনেডি ও অন্যরা যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। এমনকি প্রেসিডেন্ট কেনেডি পুনরায় স্মরণ করেছিলেন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল প্রতিটি দেশ কর্তৃক অন্য দেশসমূহের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করা। এটা এড়ানোর জন্য তাই ক্রেমলিনের নেতৃবৃন্দকে তাঁদের নীতি পুনর্মূল্যায়নের সময় ও সুযোগ উভয়ই দেয়া হয়েছিল।[৩২] সোভিয়েত ইউনিয়নও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এহেন আচরণের প্রতিদানে যথেষ্ট সদিচ্ছার পরিচয় দেয়।

এভাবে ১৯১৪ সনের সংকটের সাথে ১৯৬২ সনের সংকটের তুলনামূলক আলোচনায় কমপক্ষে দুটো বিষয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে : প্রথমত, শেষোক্ত সময় দুই পরাশক্তির সিদ্ধান্তপ্রণেতাগণ একে অপরের মনোভাবকে অধিক সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, এবং দ্বিতীয়ত, তাঁরা ১৯১৪ সনের সিদ্ধান্ত প্রণেতাদের চেয়ে

সিদ্ধান্তসময় বর্ধিতকরণের ক্ষেত্রে অধিক সংযমের পরিচয় দিয়ে সংকট নিরসনে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন।

উপসংহার

তিন দশক পূর্বে জেমস রবিনসন হতাশা ব্যক্ত করে বলেছিলেন যে, সংকটসম্পর্কিত কোন তত্ত্ব নেই।[৩৩] কিন্তু ইতোমধ্যেই স্টানফোর্ডের পণ্ডিতগণ বিষয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করে সেগুলোকে যথাযথ মডেলে ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে, কী কারণে কোন কোন সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করে যুদ্ধে রূপ নেয় এবং কিছুসংখ্যক অহিংসভাবে নিরসন করা সম্ভব হয়। তাঁদের এই গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল সংকটকালীন সিদ্ধান্তপ্রণেতাদের অন্তর্দৃষ্টি জোগাবে যে, এ-রকম পরিস্থিতিতে তাঁদের কী করা উচিত। এভাবে আশা করা যায় যে, বিষয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করে তা যথাযথভাবে ব্যবহার করে অদূর ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পণ্ডিতগণ সংকটকালীন সিদ্ধান্ত গ্রহণসম্পর্কিত পরিপূর্ণ তত্ত্ব উদ্ভাবনে সমর্থ হবেন।

পাদটীকা

১. James A. Robinson and Richard C. Snyder, 'Decision Making in International Politics,' in Herbert C. Kelman (ed.), *International Behavior : A Social Psychological Analysis* (New York : Holt, Rinehart, and Winston, 1965), p. 456. Quoted in Michael P. Sullivan, *International Relations : Theories and Evidence* (New Jersey : Prentice-Hall, Inc, 1976), p. 66.
২. ঐ।
৩. James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *Contending Theories of International Relations* (New York : Harper & Row, 1981), p. 477.
৪. দেখুন, ঐ।
৫. Herbert A. Somon, *Models of Man : Social and Rational* (New York : Wiley, 1957), Quoted in Sullivan, *op. cit.*, pp. 69-70.
৬. Charles E. Lindblom, 'The Science of Muddling Through', *Public Administration Review 19* (Spring, 1959), pp. 79-88. Also in *Ibid.*, p. 70.
৭. Herbert A. Simon, *Administrative Behavior* (New York : Macmillan, 1959); 'A Behavioral Midel of Rational Choice', *Quarterly Journal of Economics*, LXIX (February 1955), pp. 99-118; and 'A Behavioral Model of Rational Choice', in Simon (ed.) *Models of Man. ... op. cit.*, pp. 241-260. Quoted in Dougherty and Pfaltzgraff, *op. cit.*, p. 479.
৮. Quoted in *Ibid.*, p. 474.
৯. *Ibid.*, p. 475.
১০. See Sullivan, *op. cit.*, pp. 68-69.
১১. Dougherty and Pfaltzgraff *op. cit.*, p. 480.

Job Study
To make you prepared & confident
http://thejobstudy.com

১২. ঐ।
১৩. Bruce Russett and Harvey Starr. *World Politics : The Menu for Choice* (New York : W. H. Freeman & Co., 1989), p. 266.
১৪. ঐ, পৃ. ২৭৩।
১৫. ঐ।
১৬. ঐ, পৃ. ৭২।
১৭. ঐ, পৃ. ২৭৮।
১৮. ঐ।
১৯. Dougherty and Pfaltzgraff, *op. cit.*, p. 472.
২০. ঐ।
২১. ঐ, পৃ. ৪৭৩।
২২. ঐ, পৃ. ৪৭৪।
২৩. Irving Janis, *Victims of Groupthink : A Psychological Study of Foreign Policy Decisions and Fiascos* (Boston : Houghton Miffin, 1972). See K.J. Holsti, *International Politics : A Framework for Analysis* (New Jersey : Prentice-Hall, 1988), p. 288.
২৪. Dougherty and Pfaltzgraff, *op. cit.*, p. 483.
২৫. Russett and Starr, *op. cit.*, p. 274.
২৬. ঐ, পৃ. ৩১৪।
২৭. ঐ, পৃ. ৩১৬।
২৮. See, Ole R. Holsti, 'The 1914 Crisis', *American Political Science Review* 59 (June 1963); Ole R. Holsti, *Crisis, Escalation, War* (Montreal : McGill-Queens University Press, 1972); Ole R. Holsti, Richard A. Brody and Robert C. North, 'Measuring Affect and Action in International Reaction Models : Empirical Materials from the 1962 Cuban Crisis,' in James N. Rosenau (ed.), *International Politics and Foreign Policy : A Reader in Research and Theory* (New York : The Free Press 1969); etc. See also, Sullivan, *op. cit.*, pp. 82-86, 288.
২৯. L.L. Farrar, Jr., 'The Limits of Choice : July 1914 Reconsidered", *The Journal of Conflict Resolution* XVI (March 1972), p. 20. Quoted in Dougherty and Pfaltzgraff, *op. cit.*, p. 492.
৩০. Holsti, *op. cit.*, p. 288.
৩১. ঐ, পৃ. ২৮৯।
৩২. ঐ।
৩৩. James A. Robinson, 'An Appraisal of Concepts and Theories' in Charles F. Hermann (ed.), *International Crises : Insights from Behavioral Research* (New York : The Free Press, 1972), p. 27; Qouted in Dougherty and Pfaltzgraff, *op. cit.*, p. 496.

Go to Contents
http://thejobstudy.com

বিংশ অধ্যায়

পার্শ্বীয় চাপ তত্ত্ব

THE THEORY OF LATERAL PRESSURE

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসচর্চার প্রারম্ভে আমরা দেখতে পাই যে, দুটি ভিন্নধর্মী ধারায় এখানে তত্ত্ব উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। কল্পনাবাদী (idealist) ধারার অনুসারীরা মনে করতেন যে, পৃথিবীকে কী উপায়ে আরও সুন্দর করা যায়। আর অন্য ধারার অনুসারীরা, যাঁরা বাস্তববাদী (realist) নামে পরিচিত, তাঁরা পৃথিবী যেভাবে আছে, তার উপর কাজ চালিয়ে যাবার পক্ষপাতী ছিলেন। ক্রমে ক্রমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যখন পরিপূর্ণ অধীতব্য বিষয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, তখন পণ্ডিতগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্পর্ককে, বিশেষ করে কেন তাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দেয়, তা উত্তমরূপে বোঝার জন্য তত্ত্ব উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করেন। তাঁরা ধরে নেন যে, যুদ্ধের অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের বিশেষ কোন এক সময় বিশেষ কী কারণগুলো দিয়ে বিশেষ রাষ্ট্রীয় আচরণকে ব্যাখ্যা করা যায়, সে-সম্পর্কে তাঁরা তত্ত্ব উদ্ভাবনের কাজে নিয়োজিত হন। এ-ব্যাপারে তাঁরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেন, কিন্তু যতই তাঁরা অগ্রসর হতে থাকেন, ততই তাঁরা দেখতে পান যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কোন বিক্ষিপ্ত বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়—এর মাধ্যমে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের একটি রূপরেখা পাওয়া যেতে পারে। পরিশেষে তাঁরা বিভিন্ন শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ে জাতীয় শক্তির বৃদ্ধি ও বহির্বিশ্বে সম্প্রসারণের ভূমিকাসম্পর্কিত এক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, যা বর্তমানে "পার্শ্বীয় চাপ তত্ত্ব' নামে সমধিক পরিচিতি। এই তত্ত্বের মূল বিষয়বস্তু হল, যখন কোন রাষ্ট্রের দ্রুত জাতীয় উন্নতি ঘটে, তখন স্বভাবতই তা সম্প্রসারণ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব ও আক্রমণ ইত্যাদির জন্ম দেয়।

পার্শ্বীয় চাপ তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল যে যদি কোন দেশের উল্লম্বিকভাবে উন্নয়ন ঘটে (vertically develop) তবে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে এর অনুভূমিক প্রভাব (horizontal influence) ছড়িয়ে পড়বে।

http://thejobstudy.com

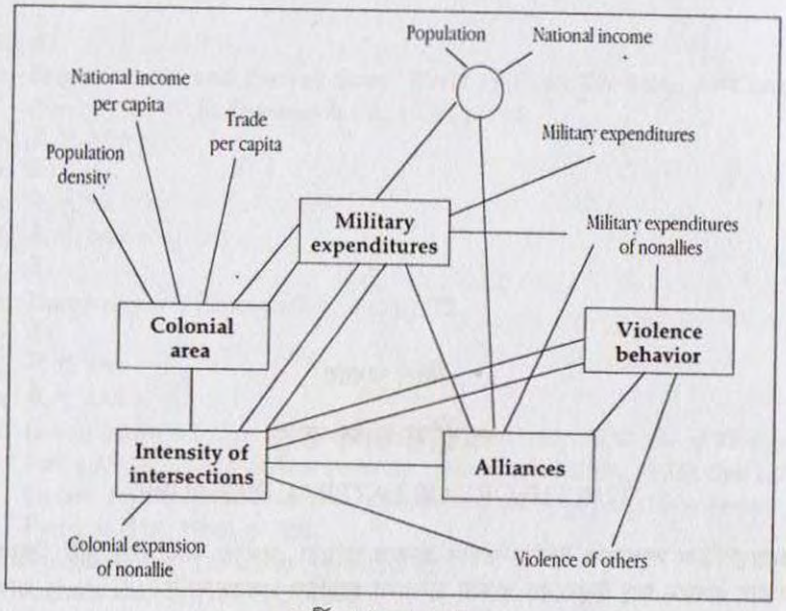

পার্শ্বীয় চাপ তত্ত্বের মডেল
Source : Russett and Starr, *op. cit.*, p. 344.

এই তত্ত্বের প্রারম্ভেই দেখানো হয়েছে, মানুষের সাথে পৃথিবী ও তার সম্পদরাজির সম্পর্ক। যখন কোন রাষ্ট্রের জনগণ দ্রুত বাড়তে থাকে, তখন স্বভাবতই তাদের বেঁচে থাকার জন্য অধিক সম্পদের দরকার হয়, অর্থাৎ ঐ রাষ্ট্রের সম্পদের উপর দাবি বাড়তে থাকে। যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ঐ রাষ্ট্রের জনগণের জ্ঞানবিজ্ঞান ও দক্ষতা বাড়তে থাকে, তখন তাদের বাড়তি দাবি পূরণের জন্য তারা তৎপর হয়ে ওঠে। যদি নিজেদের রাষ্ট্রের মধ্যে তারা সে-দাবি পূরণে ব্যর্থ হয়, তবে তারা অন্য দেশের দিকে নজর দেয়। যদি অন্য দেশের মাধ্যমে তারা সহজে সে-দাবি পূরণ করতে পারে তো ভালো, নতুবা তারা জোর করে সে-দাবি পূরণের প্রয়াস পায়। এ-জন্য তাদের দরকার হয় অধিক ক্ষমতা (capability) অর্জন করা। যখন দুই বা ততোধিক বৃহৎ শক্তি এভাবে বহির্বিশ্বে তাদের বাড়তি দাবি পূরণে লিপ্ত হয়, তখন সমূহ সম্ভাবনা থাকে যে, তাদের স্বার্থের সংঘাত (conflict of interest) ঘটবে এবং এই জাতিগুলো একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। তাই দেখা যায়, যখন কোন জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা সামরিক শক্তি এবং প্রভাব বৃদ্ধি পায়, তখন সে অন্য আরেকটি জাতির নিকট নতুন নতুন দাবি উত্থাপন করে এবং তার নেতাদের প্রচেষ্টা থাকে ঐ দাবি পূরণে সাফল্য লাভের জন্য অধিক ক্ষমতা অর্জন করা। ক্ষমতা অর্জনের ব্যাপারে তারা হয় নিজেদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে, অথবা বন্ধুরাষ্ট্রের সাথে মৈত্রীজোট (alliance) গঠন করে। আর দাবি পূরণের ব্যাপারে তারা উপনিবেশ (colony) স্থাপনের আশ্রয় নেয় এবং এ-কাজে তাদেরকে প্রায়শই অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে স্বার্থের সংঘাতে লিপ্ত হতে

হয় এবং এর ফলে তারা আক্রমণমূলক আচরণ (violence behaviour) প্রদর্শনে বাধ্য হয়।

পার্শ্বীয় চাপ তত্ত্ব উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে এর দুই প্রধান প্রবক্তা রবার্ট নর্থ (Pobert C. North) ও নাজলি শুক্রি (Nazli Choucri) উপনিবেশের আয়তন ও জনসংখ্যাকে পার্শ্ববর্তী চাপের অভিব্যক্তি হিসেবে প্রকাশ করে দেখতে পান যে জার্মানি ১৮৮২ সাল থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত যে সাতগুণ উপনিবেশ বিস্তৃত করতে পেরেছিল, তা তার নিজস্ব জনগণ ও এলাকা, প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি ও সামরিক ক্ষমতার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়।[১] নাজলি শুক্রি ও রবার্ট নর্থ তাঁদের পরবর্তী পুস্তকে পার্শ্বীয় চাপ তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ ধারণাগত মডেল ও গাণিতিক মডেল চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন।[২] নিচে এ-সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

ধারণাগত মডেল (The Conceptual Model)

মডেলের উপাদানসমূহ (Components of the mode)	যুক্তিসিদ্ধআলোচনা (Description rationale)	পরিমাপ (Measure)[ক]
বিস্তৃতি [=পার্শ্বীয় চাপ] Expansion [= Lateral pressure]	জনগণ ও প্রযুক্তিবিদ্যার বৃদ্ধির ফলে যে-দাবির সৃষ্টি হয়, তা দেশের বাইরেও বিভিন্ন কার্যকে প্ররোচিত করে।	উপনিবেশ এলাকা (Colonial area)
স্বার্থের দ্বন্দ্ব (Conflict of interest [= intensity of intersections])	বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দেশগুলো তাদের ভৌগোলিক সীমারেখার বাইরে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে যা আক্রমণে রূপ নিতে পারে।	বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে উপনিবেশসংক্রান্ত ব্যাপারে দ্বন্দ্বের metricized পরিমাপ।
সামরিক ক্ষমতা (Military capability)	প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই সামরিক প্রতিষ্ঠান থাকে; এগুলো অনেক সময় অভ্যন্তরীণ উন্নতি ও অন্য দেশের সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে প্রতিযোগিতার ফলে বৃদ্ধি পায়।	সামরিক ব্যয় (Military budgets)
মৈত্রীজোট (Alliance)	জাতিসমূহ অন্যান্যের তুলনায় তাদের শক্তি, সম্পদ ও ক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মৈত্রীজোটে আবদ্ধ হয়।	মোট মৈত্রীজোট (Total alliances)
আক্রমণমূলক আচরণ (Violence behaviour)	জাতিসমূহের বৃদ্ধি সামরিক ক্ষমতা ও মৈত্রীজোটের কারণে আন্তর্জাতিক আক্রমণে লিপ্ত হয়।	অন্যান্য জাতির প্রতি আক্রমণমূলক কার্যাবলির metricized পরিমাপ।[খ]

http://thejobstudy.com

ক. প্রত্যেক জাতির জন্য উপাত্ত নেয়া হয়েছে এবং ১৮৭০ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত, বাৎসরিক ভিত্তিতে সমষ্টিকরণ (aggregated) করা হয়েছে।

খ. যেগুলোকে লক্ষ্যজাতি হিসেবে (target nations) গণ্য করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে ঐ সময়কার ছয়টি বৃহৎ শক্তি ছাড়াও অন্যান্য রাষ্ট্র অন্তর্ভুক্ত।

Source : *Nations in Conflict*, p. 25.

গাণিতিক মডেল (Mathematical Model)

উপনিবেশ এলাকা = $\alpha_1 + \beta_1$ (জনসংখ্যার ঘনত্ব) + β_2 (মাথাপিছু জাতীয় আয়) + β_3 (মাথাপিছু বাণিজ্য) + β_4 (সামরিক ব্যয়) + μ_1

স্বার্থের দ্বন্দ্বের গভীরতা = $\alpha_2 + \beta_5$ (উপনিবেশ এলাকা) + β_6 (সামরিক ব্যয়) + β_7 (অমিত্রদের উপনিবেশ এলাকা) + β_8 (আক্রমণমূলক আচরণ) β_9 (অন্যদের আক্রমণ) + μ_2

সামরিক ব্যয় = $\alpha_3 + \beta_{10}$ (সামরিক ব্যয় $t-1$) + β_{11} (অমিত্রদের সামরিক ব্যয়) + β_{12} (স্বার্থের দ্বন্দ্বের গভীরতা) + β_{13} (উপনিবেশ এলাকা) + β_{14} (জনগণ × জাতীয় আয়) + μ_3

মৈত্রীজোট = $\alpha_4 + \beta_{15}$ (সামরিক ব্যয়) + β_{16} (স্বার্থের দ্বন্দ্বের গভীরতা) + β_{17} (অমিত্রদের সামরিক ব্যয়) + β_{18} (জনগণ × জাতীয় আয়) + μ_4

আক্রমণমূলক আচরণ = $\alpha_5 + \beta_{19}$ (স্বার্থের দ্বন্দ্বের গভীরতা) + β_{20} (সামরিক ব্যয় + β_{21} (অমিত্রদের সামরিক ব্যয়) + β_{22} (মৈত্রীজোট) + β_{23} (অন্যদের আক্রমণ) + μ_5

যেখানে,

উপনিবেশ এলাকা = হাজার বর্গমাইল।

জনগণ = নিজস্ব জনগণ, হাজারে।

জনগণের ঘনত্ব = নিজের জনগণকে নিজের আয়তন (হাজার বর্গমাইল) দিয়ে ভাগ।

জাতীয় আয় = হাজার আমেরিকান ডলারে, ১৯০১—১৯১০ = ১০০ নির্ধারিত মান অনুযায়ী।

বাণিজ্য = আমদানি ও রপ্তানির যোগফল, হাজার আমেরিকান ডলারে, ১৯০১—১৯১০ = ১০০ নির্ধারিত মান অনুযায়ী।

সামরিক ব্যয় = স্থল ও নৌবাহিনীর বরাদ্দের যোগফল, হাজার আমেরিকান ডলারে, ১৯০১—১০১০ = ১০০ নির্ধারিত মান অনুযায়ী।

অমৈত্রী = ডামি চলক (dummy variable) যেখানে দুটি রাষ্ট্র মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ না থাকলে ১, আবদ্ধ থাকলে ০।

মৈত্রীজোট = রীতিমাফিক (formal) মৈত্রীজোটের সংখ্যা।

আক্রমণমূলক আচরণ = metricized চলক (১ হতে ৩০ পর্যন্ত) যা অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতি কর্মক রাষ্ট্রের (actor state) আক্রমণমূলক আচরণের সবচেয়ে বেশি গভীরতা বর্ণনা করবে।

অন্যদের আক্রমণ = metricized চলক (১ হতে ৩০ পর্যন্ত) যা কর্মক রাষ্ট্রের প্রতি অন্যান্য রাষ্ট্রের আক্রমণমূলক আচরণের সবচেয়ে বেশি গভীরতা বর্ণনা করবে।

স্বার্থের দ্বন্দ্বের গভীরতা = metricized চলক (১ হতে ৩০ পর্যন্ত) যা বিশেষভাবে কর্মক রাষ্ট্র ও অন্য বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে আক্রমণের গভীরতা হিসেবে দেখাবে।

জনগণ × জাতীয় আয় = নিজের জনগণ ও জাতীয় আয়ের পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল ফলাফলকে বোঝানোর জন্য গুণনশীল চলক।

$\alpha_1 \ldots \alpha_5$ = স্থির সংখ্যা (constant term)।

$\mu_1 \ldots \mu_5$ = ভুল সংখ্যা (error term)।

Source : *Nations in Conflict*, p. 169.

উক্ত মডেলটি তাঁরা উপাত্ত সংগ্রহের পর যথোপযুক্ত পরিসংখ্যানমূলক পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেছেন। এভাবেই পার্শ্বীয় চাপ তত্ত্বের মাধ্যমে তাঁরা দেখিয়েছেন যে, কোন বৃহৎ শক্তির মৌলিক বৈশিষ্ট্যে যদি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে, তবে তা অন্যান্য রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তার আচরণকে প্রভাবিত করবে এবং সেই সাথে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে নিজেদের সম্পর্কে সঠিক পরিবর্তন আনয়ন করবে। একটি জাতির জনসংখ্যা, প্রযুক্তিবিদ্যা, উৎপাদন অথবা সামরিক শক্তি বৃদ্ধি এভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপায়ে প্রভাবিত করতে পারে। যেহেতু কোন দেশের বাহ্যিক আচরণকে (external behaviour) তার জনসংখ্যা, প্রযুক্তিবিদ্যা, সামরিক শক্তির বৃদ্ধি এবং সেই সাথে বিভিন্ন সম্পদের উপর তার দখল ইত্যাদি দ্বারা অনেকাংশে ব্যাখ্যা করা যায়, সুতরাং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব প্রয়োজনীয় 'সামাজিক শিক্ষণে'র (social learning)[৩] মাধ্যমে এ-ব্যাপারে সরকারি নীতি কী হওয়া উচিত, সে-সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারে।

Go to Contents
http://thejobstudy.com

পাদটীকা

১. See Robert C. North and Richard Lagerstrom, *War and Domination : A Theory of Lateral Pressure* (New York : General Learning Press, 1971), p. 16.

২. Nazli Choucri and Robert C. North, *Nations in Conflict : National Growth and International Violence* (San Francisco : W. H. Freeman & Co., 1975).

৩. দেখুন, North and Lagerstrom, *op. cit.*, p. 18.

http://thejobstudy.com

Job Study
To make you prepared & confident

একবিংশ অধ্যায়

পররাষ্ট্রনীতি

FOREIGN POLICY

পররাষ্ট্রনীতি কী (What is foreign policy)?

পররাষ্ট্রনীতি বলতে কী বোঝায়, তা জানার জন্য আমাদেরকে 'পররাষ্ট্র' (foreign) ও 'নীতি' (policy) এ-দুটি শব্দের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে। 'নীতি' বলতে সাধারণত আমরা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রণীত কার্যাবলিকে বুঝি। অধ্যাপক প্যাডেলফোর্ড (Norman J. Padelford), লিংকন (George A. Lincoln) ও অলভির (Lee D. Olvey) মতে, 'নীতি হল কোন প্রক্রিয়ার সম্যক ফল, যার মাধ্যমে উদ্দশ্যাবলি অর্জন ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কোন রাষ্ট্র তার বিস্তৃতভাবে চিন্তিত লক্ষ্য ও স্বার্থকে সুনির্দিষ্ট কার্যে পরিণত করে' (Policy is the overall result of the process by which a state translates its broadly conceived goals and interests into specific courses of action in order to achieve its objectives and preserve its interests.)[১]। কোন রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ নীতিকে দু ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা, 'অভ্যন্তরীণ নীতি' (domestic policy) ও 'পররাষ্ট্রনীতি' (foreign policy)। ধারণাগত দিক থেকে (conceptually) দেখতে গেলে বলা যায় যে, পররাষ্ট্রনীতি হল কোন রাষ্ট্রের জাতীয় নীতির সেই অংশ, যা বহির্বিশ্বের সাথে যুক্ত। এ-সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে উনবিংশ শতাব্দীর প্রুশিয়ার বিখ্যাত কূটনীতিক ও রাজনীতিবিদ বিসমার্ক (Prince Otto von Bismarck) চমৎকারভাবে বলেছেন, অভ্যন্তরীণ নীতির সম্প্রসারণই হল পররাষ্ট্রনীতি (The extension of domestic policy is foreign policy.)। পররাষ্ট্রনীতির একটি কার্যকর সংজ্ঞার (operational definition) জন্য আমরা বলতে পারি, পররাষ্ট্রনীতি হল কোন রাষ্ট্রের সে-সব কার্যের ধারা, যা সে-দেশ তার রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সংরক্ষণের কারণে তার সীমারেখার বাইরে অবস্থিত অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য সম্পাদন করে থাকে।

পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে নিহিত থাকে দীর্ঘকালব্যাপী অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে স্থায়ী স্বার্থ, যা কোন দেশ সবসময়ই সংরক্ষণ করতে ও সেই সাথে বাড়াতে চেষ্টা করে এবং সাময়িকভাবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে উদ্ভূত কোন ব্যাপারে ঐ দেশের নীতির বিশেষ ঘোষণা, যা সে-দেশের মূল স্বার্থের সাথে জড়িত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আরববিশ্বের যে-কোন দেশের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক তার স্থায়ী স্বার্থের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসরাইলের আক্রমণে অথবা অন্য কোন কারণে যদি আরববিশ্বে বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তবে সে-ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নীতি কী হবে, তা সাধারণত আমাদের দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করে থাকেন। এ-ক্ষেত্রে মন্ত্রীমহোদয়ের ঘোষণা বাংলাদেশের মূল জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

এভাবে পররাষ্ট্রনীতির রণকৌশল নির্ধারণ যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তা হল জাতীয় স্বার্থের দীর্ঘকালীন উপলব্ধি এবং এগুলো সম্মুখপানে এগিয়ে নিতে যে শক্তি প্রয়োজন তার আলোকে গৃহীত স্বল্প-মেয়াদি কর্ম-পরিকল্পনা।

উক্ত আলোচনার মাধ্যমে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, জাতীয় স্বার্থ পুরণই পররাষ্ট্রনীতির প্রধান উদ্দেশ্য। বাস্তবিকপক্ষে, জাতীয় স্বার্থই হল মূল ভিত্তি, যার উপর কোন দেশের পররাষ্ট্রনীতি গড়ে ওঠে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের বেলায়ও এ-কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। এখন দেখা যাক, জাতীয় স্বার্থ বলতে আমরা কী বুঝি এবং আমাদের বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি এবং মূলনীতিসমূহ কী কী।

জাতীয় স্বার্থ কী (What is national interest)?

প্রত্যেক দেশই যে তার পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে কতগুলো বাস্তব উদ্দেশ্য, যেগুলোকে জাতীয় স্বার্থ হিসেবে অভিহিত করা হয়, অর্জনের প্রচেষ্টা চালায়, তা আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তিনজন বিখ্যাত ব্যক্তির উক্তি থেকে অনুধাবন করতে পারি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন নেতৃস্থানীয় ভূ-রাজনীতিবিদ (geopolitician) আলফ্রেড মাহান (Alfred T. Mahan) চমৎকারভাবে বলেছেন যে, 'জাতীয় স্বার্থ পররাষ্ট্রনীতির জন্য শুধু বৈধই নয়, মৌলিক উদ্দেশ্যও বটে। যে-কোন সরকারের কাছ থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে জাতীয় স্বার্থ ছাড়া অন্য কারণে কার্য সম্পাদনের আশা করা নিষ্ফল' (Self-interest is not only a legitimate but a fundamental cause for foreign policy; it is vain to expect governments to act continuously on any other ground than national interest.)[২]। প্রাক্তন মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব চার্লস ইভানস হিউজ (Charles Evans Hughes) ১৯২২ সনে যথার্থই বলেছিলেন যে, "পররাষ্ট্রনীতি বিমূর্ত কোন কিছুর উপর গড়ে তোলা হয় না। এটা জরুরি প্রয়োজন অথবা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রগাঢ়ভাবে বৈশিষ্ট্যময় কোন কিছু থেকে উৎসারিত জাতীয় স্বার্থের বাস্তব ধারণার ফল" ('Foreign policies are not built upon abstractions. They are the

http://thejobstudy.com

result of practical conceptions of national interest arising from some exigency or standing out vividly in historical pespective.")।[৩] অন্যদিকে পররাষ্ট্রনীতিতে জাতীয় স্বার্থের ভূমিকার উপর অবিস্মরণীয় বক্তব্য প্রদান করেছেন প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামারস্টোন (Lord Palmerston)। তিনি যথার্থই বলেছেন, 'আমাদের কোন শাশ্বত মিত্র নেই এবং আমাদের কোন চিরস্থায়ী শত্রুও নেই। আমাদের স্বার্থই হল শাশ্বত ও চিরস্থায়ী এবং সে-স্বার্থকে অনুসরণ করাই হল আমাদের দায়িত্ব' (We have no eternal allies and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perprtual and those interests it is our duty of follow.)[৪]।

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, জাতীয় স্বার্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা (concept), যা পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের সময় প্রত্যেক দেশের নীতিনির্ধারকদের বোঝা এবং সেই সাথে প্রতিফলন ঘটানো উচিত। এখন দেখা যাক জাতীয় স্বার্থ বলতে আমরা কী বুঝি। রস্তোর (W. W. Rostow) ভাষায়, 'জাতীয় স্বার্থ হল এমন একটি ধারণা, যা সমস্ত জাতি পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে নিজের সুবিধায় কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে' (National interest is the conception which nations apply in trying to influence the world environment to their advantage.)[৫]। এটাকে কোন জাতির লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা যায়, যা আদায় করার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রই সবসময় ব্যস্ত থাকে। এই লক্ষ্যগুলো ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও কতগুলো লক্ষ্য, যেমন রাষ্ট্রের আত্মরক্ষা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ইত্যাদি সবসময়ই সব রাষ্ট্রের জন্য অপরিবর্তিত থাকে। জাতীয় স্বার্থ সাধারণত দু রকমের হতে পারে। যথা, মুখ্য স্বার্থ (primary interests) ও গৌণ স্বার্থ (secondary interests)। কোন রাষ্ট্রের মুখ্য স্বার্থগুলো চিরস্থায়ী এবং সেগুলোকে যে-কোন মূল্যে সংরক্ষণ করা প্রত্যেক দেশের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু বর্তমান পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে কোন রাষ্ট্র তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক অথবা মতবাদগত অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে সমধর্মী স্বার্থের বিনিময়ে তার গৌণ স্বার্থের ব্যাপারে প্রয়োজনবোধে আপোস করতে পারে, যদিও সেই স্বার্থ সে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করবে না।

বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ কী এ-বিষয়টি আমাদের দেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি আলোচনার সময় পরিস্ফুট হবে।

বাংরাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি (The aims and objects of the foreign policy of Bangladesh)

আগেই বলা হয়েছে, যে-কোন দেশ বহির্বিশ্বের কাছ থেকে তার উদ্দেশ্যাবলি অর্জনের জন্য তার পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করে থাকে। বাংলাদেশও এই প্রচলিত রাষ্ট্রীয় নিয়মের বাইরে নয়। তবে ব্যক্তিজীবনের ক্ষেত্রে যেটা সত্যি, রাষ্ট্রীয় জীবনের ক্ষেত্রেও সেটা

Go to Contents
http://thejobstudy.com

সমানভাবে প্রযোজ্য। ব্যক্তিজীবনের ব্যাপারে আব্রাহাম মাসলো (Abraham H. Maslow) মানুষের সফল জীবন ধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় পাঁচটি চাহিদাকে গুরুত্বের ক্রমানুযায়ী (hierarchy of needs) সাজিয়েছেন। এগুলো হল : (১) শারীরিক প্রয়োজন, (২) নিরাপত্তার প্রয়োজন, (৩) ভালবাসা, (৪) মর্যাদা ও সম্মান, এবং (৫) কীর্তি ("i. physical needs, ii. safety needs, iii. love, iv. prestige and respect, v. achievement.")। ব্যক্তিজীবনকে অতিক্রম করে বিশ্ব পরিসরে এগিয়ে গেলে রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতির সার্বিক উদ্দেশ্যাবলিকে নিম্নে প্রদত্ত গুরুত্বের ক্রমানুযায়ী সাজানো যায় :

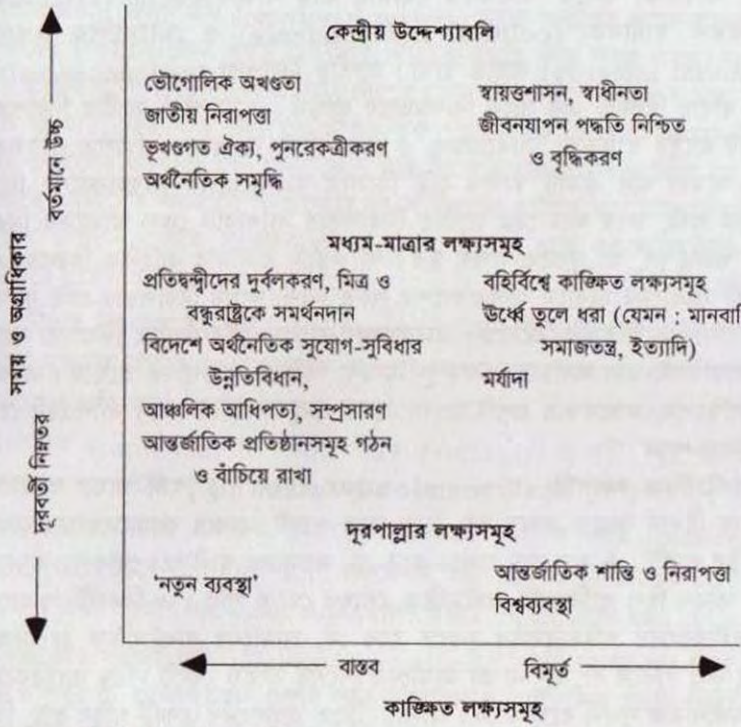

Source : Holsti, *op. cit.*, p. 124.

তবে বাংলাদেশ ভৌগোলিক আয়তনের দিক থেকে একটি ক্ষুদ্র, প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের নিরিখে দরিদ্র এবং ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামরিক সামর্থ্যের বিবেচনায় অনুন্নত ও দুর্বল রাষ্ট্রবিধায় দেশটি পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি নির্ধারণের সময় অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী হতে পারে না। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলিকে আমরা নিম্নরূপে বর্ণনা করতে পারি :

http://thejobstudy.com

১. আত্মরক্ষা,
২. অর্থনৈতিক অগ্রগতি,
৩. অন্য রাষ্ট্রের তুলনায় নিজের জাতীয় শক্তিকে রক্ষা ও প্রয়োজনবোধে বৃদ্ধি করা,
৪. নিজস্ব মতবাদে দৃঢ় থাকা, ও
৫. জাতীয় মার্যাদা বৃদ্ধি করা।

আত্মরক্ষা (Self-Preservation) : অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশের বেলায়ও এ-কথা অতিশয় সত্যি যে, আত্মরক্ষা হল আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ। কোন রাষ্ট্রের আত্মরক্ষা বলতে সাধারণত বোঝায় তার সার্বভৌমত্ব (sovereignty), রাজনৈতিক স্বাধীনতা (political independence) ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা (territorial integrity) বজায় রাখা। জাতীয় নিরাপত্তা (national security) অক্ষুণ্ন রাখার বিষয়টি এর সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। বস্তুতপক্ষে জাতীয় নিরাপত্তার ধারণাটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার সম্মিলিত প্রতিফলন মাত্র। আমরা যদি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তবে আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার ব্যাপারটি কেন আমাদের নিকট অধিক গুরুত্বপূর্ণ, তা বুঝতে সক্ষম হব। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের পরও বাংলাদেশের নিরাপত্তার প্রতি বহুবার বিভিন্ন দিক থেকে হুমকি এসেছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা বজায় রাখা বাস্তবিকই তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এ-কথা অতি সত্যি যে, আত্মরক্ষার প্রশ্নটি বাংলাদেশের জন্য অপর যে-কোন ব্যাপারের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে।

অর্থনৈতিক অগ্রগতি (Economic advancement) : যদি আমরা আমাদের নিরাপত্তা বিধান করতে সক্ষম হই, তবে তার পরেই আসবে আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রশ্নটি। এ-কথা মনে রাখতে হবে যে, আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল পাকিস্তানি অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তি। এ-বিষয়টি আমাদের নীতিনির্ধারকদের পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে যে, আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোনই মূল্য থাকবে না, যদি না তা আমাদের দেশের কয়েক কোটি দরিদ্র নাগরিকদের জন্য অর্থনৈতিক সুফল বয়ে আনে। আপাতদৃষ্টিতে বাংলাদেশ একটি গরিব রাষ্ট্র, কিন্তু তবুও এর মধ্যে যে-সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, তা যদি আমাদের সিদ্ধান্তগ্রহণকারীরা উপযুক্তভাবে কাজে লাগাতে পারেন, তবে তা অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের জন্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বলে আনতে সক্ষম হবে। বর্তমানে আমাদের যা দরকার, তা হল সহজ শর্তে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ এবং তা যথার্থ উন্নয়নের জন্য কাজে লাগিয়ে আমাদের উৎপাদন বাড়ানো এবং এভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করা। একই সাথে এ-দিকেও লক্ষ রাখতে হবে যাতে আমাদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বিদেশে উপযুক্ত বাজার পায়।

জাতীয় শক্তি সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি (Safeguarding as well as augmenting national power) : বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির আরেকটি প্রধান উদ্দেশ্য হল আমাদের জাতীয় শক্তি সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা। জাতীয় শক্তি বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে আমাদের দেশের সার্বিক ক্ষমতা, যা আমাদের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। জাতীয় শক্তি হল অনেকগুলো উপাদানের যোগফল। ঐগুলোর মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ, খাদ্য ও জ্বালানি উৎপাদন উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেন সে উল্লিখিত সম্পদরাজির উপর তার পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে এবং সেই সাথে তার সমুদ্রের তলদেশ ও অভ্যন্তরীণ জলসীমার (territorial waters) মধ্যে অবস্থিত সম্পদসহ অন্যান্য সম্পদের উপর যে-কোন রকম বৈদেশিক দাবিকে নস্যাৎ করে দিতে পারে। আমাদের নিজস্ব জাতীয় সম্পদের দাবিদার কোন দেশের কোন প্রকার চাপের মুখে আমরা কখনও নতি স্বীকার করব না। এইসাথে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, আমাদের কোন সিদ্ধান্তগ্রহণের ব্যাপারে যেন অন্য কোন রাষ্ট্র কোন প্রকার প্রভাব খাটাতে না পারে। এভাবে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি প্রণেতাদের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব হবে আমাদের জাতীয় শক্তির উপাদানগুলোকে সংরক্ষণ এবং সময় ও সুযোগ বুঝে এগুলোকে বৃদ্ধি করার ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালানো।

নিজস্ব মতবাদে দৃঢ় থাকা (Ideology) : বর্তমান বিশ্বে প্রত্যেক রাষ্ট্রই কোন-না-কোন মতবাদ অনুসরণ করে থাকে অথবা কমপক্ষে প্রচলিত যে-কোন দল-ভারী মতবাদের প্রতি তার সমর্থন ঘোষণা করে। বাংলাদেশের ব্যাপারে বলা যায় যে, সে ধনতান্ত্রিক (capitalist) বা সমাজতান্ত্রিক (socialist) এ-দুটি পরস্পরবিরোধী মতবাদের কোনটিই পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করে না—বরঞ্চ সে অধিকাংশ আফ্রো-এশীয় দেশের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে জোটনিরপেক্ষ নীতি (non-aligned principles) মেনে চলে। বাংলাদেশ সবসময়ই চায় যাতে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর মধ্যকার একতা বজায় থাকে এবং এ-আন্দোলন উত্তরোত্তর জোরালো হয়।

জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধি (National prestige) : মানুষ যেমন শুধু ভাত খেয়ে বাঁচতে পারে না, তেমনি কোন দেশই তার আত্মরক্ষা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিয়েই সুখী হতে পারে না। সে চায় বৃহৎ রাষ্ট্রীয় পরিবারে মার্যাদাসহকারে বেঁচে থাকতে। একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের পর তাকে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে প্রধানত এ-কারণে যে, তার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অতি শোচনীয়। এ-অবস্থায় তাকে সাময়িকভাবে পরনির্ভরশীল হতে হয়েছে এবং এ-জন্য আমাদেরকে তলাবিহীন ঝুড়ি ইত্যাদি অবমাননাকর মন্তব্য সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু এটা চিরদিনের জন্য চলতে পারে না। সুতরাং বাংলাদেশ যাতে তার মর্যাদা বজায় রেখে বহির্বিশ্বে একটি সুন্দর ভাবমূর্তি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে, সে-ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালানো আমাদের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য।

http://thejobstudy.com

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিসমূহ (Principels of the foreign policy of Bangladesh)

বাংলাদেশ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (Untied Nations) সদস্য। সে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনেরও সদস্য। সুতরাং সে স্বভাবতই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ (Charter) ও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের মূলনীতিসমূহ (Principls of the Non-aligned Movment) মেনে চলে। এ ছাড়াও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান মূলনীতিটি বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান অতি চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আমাদের একটি ক্ষুদ্র দেশ, কারও প্রতি বিদ্বেষ নয়, আমরা চাই সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব (We are a small country, we want friendship with all and malice towards none.)[৬]। তাঁর এই উক্তির মধ্যেই আমাদের পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য নিহিত। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান দিকগুলো নিম্নরূপ :

১. সকলের প্রতি বন্ধুত্ব, কারও প্রতি বিদ্বেষ নয় : যেহেতু একটি গরিব দেশ হিসেবে বাংলাদেশ তার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল, সেহেতু বাংলাদেশ বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে কোন একটির পক্ষাবলম্বন করে অন্যটির বিরাগভাজন হতে চায় না। এর চেয়েও বড় কথা হল যে, এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের পর বাংলাদেশ চায় না যে, সে কোন বৃহৎ শক্তির ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

২. অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা : এ-মূলনীতিটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সনদের ২(৪) ধারার [Article 2(4)] সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৩. অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে (domestic affairs) হস্তক্ষেপ না করা : এ-মূলনীতিটিও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সনদের ২(৭) ধারার [Article 2(7)] উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে ২ ও ৩ নম্বর মূলনীতি দুটি রাষ্ট্রীয় আচরণের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আদর্শের বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

৪. বিশ্বশান্তি : বাংলাদেশ যে শান্তি কামনা করে, তা ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে শেখ মুজিবুর রহমান দেশের মাটিতে পা রাখার সাথে সাথেই ব্যক্তি করেছিলেন। তখন তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, 'আমি বাংলাদেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড হিসেবে দেখতে চাই' [I would like it [Bangladesh] to become the Switzerland of the East.)[৭]। এ-ব্যাপারে অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ যথার্থই বলেছেন যে, 'বাংলাদেশ শুধু শান্তির উদ্দেশ্যেই শান্তি চায় না, এর আরও কারণ হল তার জাতীয় উন্নতি ও নিরাপত্তার ব্যাপারে সুপরিকল্পিত বিবেচনা' (Bangladesh desires peace not only for the sake of peace but also for the strategic consideration of national development and security.)[৮]। বাংলাদেশ কর্তৃক অন্বেষিত শান্তির এই মূলনীতির কয়েকটি তাৎপর্য আছে। প্রথমত, বাংলাদেশ

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে (peaceful co-existence) বিশ্বাস করে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ যে-কোন বিবাদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার (peaceful settlement of disputes) পক্ষপাতী। এবং তৃতীয়ত, বাংলাদেশ চায় যে, যে-কোন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন শান্তিপূর্ণ উপায়ে হবে (peaceful change)। এই প্রসঙ্গে এ-কথাও সবসময় মনে রাখতে হবে যে, বাংলাদেশ কখনও বিশ্বের কোন রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকি প্রদর্শন না করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর।

Go to Contents
http://thejobstudy.com

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন (Formulation of the foreign policy of Bangladesh)

যে-কোন দেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন একটি কঠিন কাজ। এ-ব্যাপারে অনেকগুলো বিষয়, যেমন পররাষ্ট্রনীতির উপাদানসমূহ, অভ্যন্তরীণ অবস্থা, আন্তর্জাতিক পরিবেশ, ইত্যাদি বিবেচনা করতে হয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে প্রথমেই আসে এর উপাদানসমূহ। পররাষ্ট্রনীতির উপাদানসমূহ প্রকৃতপক্ষে সেগুলো, যা জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এটা একটি দেশের ক্ষমতার সাথেও সম্পর্কযুক্ত। পরবর্তী বিবেচনার বিষয়টি হল অভ্যন্তরীণ নিয়ামক। এর দুটি ভাগ আছে, যথা, অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও অভ্যন্তরীণ নীতি। পরিশেষে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির যে-কোন সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক সিস্টেমের গঠনপ্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত। আমরা এখন এ-বিষয়গুলো একে একে আলোচনা করব।

পররাষ্ট্রনীতির উপাদানসমূহ (Elements of foreign policy) : একটু আগেই বলা হয়েছে যে, পররাষ্ট্রনীতির উপাদানসমূহ হল সেগুলো, যা জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক। পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে আমরা জাতীয় শক্তির উপাদানগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করতে হলে সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদের ঐসব উপাদানের আলোকে বাংলাদেশের জাতীয় শক্তি সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা থাকতে হবে।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বনাম পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য (Capability versus policy goals) : এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান যে, বাংলাদেশের জাতীয় শক্তিই আমাদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত করে। এখন পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করতে হলে আমাদের সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদের যা গুরুত্বপূর্ণ করণীয়, তা হল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাথে পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলির সামঞ্জস্য বিধান করা অর্থাৎ আমাদের ক্ষমতা অনুযায়ী লক্ষ্য নির্ধারণ করা। যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য সুষম (balanced) থাকে, তখন তাকে আমরা বিজ্ঞ নীতি (rational policy) বলি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এটা সম্ভব নাও হতে পারে। এ-রকম ক্ষেত্রে ক্ষমতা অথবা লক্ষ্যের পরিবর্তন আবশ্যক হয়। যদি ক্ষমতার পরিমাণ লক্ষ্যের চেয়ে বেশি হয়, তবে সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারীদের সামনে একটি পথই খোলা থাকে এবং তা হল পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রসারিত করা। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামরিক

http://thejobstudy.com

শক্তি বৃদ্ধির ফলে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এবং সে তখন বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়নের মাধ্যমে তার লক্ষ্যকে প্রসারিত করেছিল। কিন্তু সচরাচর এর উল্টোটাই পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ কোন রাষ্ট্র তার ক্ষমতার চেয়ে বেশি পরিমাণে লক্ষ্য নির্ধারণ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ আমরা পাকিস্তানের প্রাথমিক সময়কে ধরতে পারি। এরূপ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারীদের সামনে দুটি পথ খোলা থাকে—লক্ষ্য কমানো অথবা ক্ষমতা বাড়ানো। পাকিস্তান দ্বিতীয় পথটি বেছে নিয়েছিল অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সামরিক ও অন্যান্য চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তার ক্ষমতাকে বাড়ানোর প্রয়াস পেয়েছিল। যা হোক, আমাদের পররাষ্ট্রনীতি প্রণেতাদের এ-বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখা উচিত।

অভ্যন্তরীণ নিয়ামক (Domestic factor) : যেহেতু কোন রাষ্ট্রের জাতীয় নীতি হচ্ছে পররাষ্ট্রনীতি ও অভ্যন্তরীণ নীতির মিলিত ফল, সেহেতু এগুলো একে অপরের পরিপূরক। পররাষ্ট্রনীতি সাধারণত অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অধ্যাপক প্যাডেলফোর্ড, লিংকন ও অলভি বলেছেন, 'যদি জাতীয় নীতির আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার আবহাওয়ায় অর্জনের ইচ্ছা থাকে, তবে পররাষ্ট্রনীতি ও অভ্যন্তরীণ নীতিকে অবশ্যই একে অপরের সহায়ক হতে হবে' (Foreign and domestic policy must be mutually supporting if national policy aspirations are to be achieved in an atmosphere of political stability.)[৯]। কিন্তু মনে হয়, এ-কথাটি বাংলাদেশের মতো আর কোথাও অধিক সত্য নয়। এর কারণ হল যে, বাংলাদেশের বার্ষিক জাতীয় বাজেটের ৬০% ও উন্নয়ন বাজেটের ৯০% বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। এ-জন্য প্রতিবছরই অভ্যন্তরীণ নীতিনির্ধারকগণ কোন বিশেষ আর্থিক বছরে কী পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য দরকার হবে, সে-ব্যাপারে পররাষ্ট্র দফতরের কর্মকর্তাদের অবহিত করেন এবং তাঁরা তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করেন।

কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিও (domestic politics) পররাষ্ট্রনীতিকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে। পররাষ্ট্রনীতি প্রণেতাদেরকে নীতি নির্ধারণের সময় অবশ্যই অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থা, জনগণের মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি বোঝার চেষ্টা করতে হবে। যদি তাঁরা এ-ব্যাপারটি অবহেলা করেন, তবে পরবর্তী নির্বাচনে তাঁদের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে। এটা গণতান্ত্রিক দেশের (democratic countries) জন্য যেমন সত্য, তেমনি সর্বাত্মক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার (totalitatian system) দেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ সে-ক্ষেত্রে পরবর্তী পার্টি কনভেনশনে তাঁদের পরাজয়ের সম্ভাবনা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, পাকিস্তানে কোন সরকারই হয়তো একদিনের জন্যও ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে না, যদি তারা কাশ্মিরে পাকিস্তানের দাবি ছেড়ে দেয়। এভাবেই গণচীনের কোন নেতাই রাশিয়ার প্রতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের ভাব দেখাতে সাহসী হত না, কারণ ভয় ছিল যে, তাঁকেও হয়তো লিন পিয়াওয়ের ভাগ্য বরণ করতে হতে পারত। বাংলাদেশের ব্যাপারে বলা যায় যে, আমাদের সরকারের

জনগণের সেই মনোভাবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, যা আমাদের জাতীয় রাজনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এ-ব্যাপারে অধ্যাপক নর্থএজ (F. S. Northedge) চমৎকারভাবে বলেছেন, 'পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন অভ্যন্তরীণ দিককে এমনভাবে চিত্রিত করে, যাতে সরকারের বিভিন্ন উপাদান ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে গৃহীত অনেকগুলো আপোস ও সমন্বয়সাধন হতে পারে' (The formation of foreign policy represents on its domestic side, a continuous series of compromises and adjustments between the different elements of government and social structure.)[১০]।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি (The international environment) : আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও কোন দেশের পররাষ্ট্রনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে। আন্তর্জাতিক সিস্টেমের গঠন, অথবা অন্য কথায় বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন, কোন দেশের পররাষ্ট্রনীতির বিশেষ উদ্দেশ্যের সহায়কও হতে পারে, আবার স্বাধীনভাবে যে-কোন নীতি অনুসরণের প্রতিবন্ধকও হতে পারে। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমরা কোন কোন বৃহৎ শক্তির যে-বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলাম, তার কারণ ছিল প্রধানত বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই। বর্তমানে যদি আমরা ভারত ও বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের (bilateral relations) কথা ধরি, তবে দেখতে পাব যে, এ-ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এ-দুটি দেশের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, গণপ্রজাতান্ত্রিক চীন, এমনকি পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কও যথেষ্ট প্রভাবশালী নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে।

অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে, পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের সময় যে-বিষয়গুলো সম্পর্কে বিবেচনা করা দরকার তা হল :

১. কোন রাষ্ট্রের নিজের ক্ষমতা ও উদ্দেশ্যাবলি ও সেইসাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও উদ্দেশ্যাবলি সম্পর্কে উপাত্ত (data) সংগ্রহ ও এগুলোর যথাযথ মূল্যায়ন।
২. কোন রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও দুর্বলতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে অনেকগুলো সম্ভাব্য বিকল্পের মধ্য থেকে সর্বোত্তমটিকে নীতি হিসেবে নির্বাচন।
৩. নীতি প্রণয়নের পর সেটিকে বাস্তবে রূপদান করার (implement) ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।[১১]

পাদটীকা

১. Norman J. Padelford, George A. Lincoln and Lee D. Olvey, *The Dynamics of International Politics* (New York : Macmillan Publishing Co., Inc., third edition, 1976), p. 201.
২. দেখুন. Norman J. Padelford and George A. Lincoln, *The Dynamics of International Politics* (New York : The Macmillan Co., 1962), p. 234.
৩. Quoted in Padelford, Lincoln and Olvey, *op, cit.*, p. 204.

http://thejobstudy.com

৪. দেখুন, Padelford and Lincoln, *op. cit.*, p. 234.
৫. দেখুন, ঐ, পৃ. ২৩৩।
৬. *The Times* (London), জানুয়ারি ১৫, ১৯৭২।
৭. *The Bangladesh Observer* (ঢাকা), জানুয়ারি ১৪, ১৯৭২।
৮. Emajuddin Ahamed, 'Bangaldesh and the Policy of Peace and Nonalignment', *Asian Affairs*, Vol. III, No. 2 (June, 1981), p. 126.
৯. Padelford, Lincoln and Olvey, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩।
১০. F. S. Northedge, 'The Nature of Foreign Policy', in F.S. Northedge (ed.), *The Foreign Policies of the Powers* (London : Faber and Faber, 1968), p. 27.
১১. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে সার্বিকভাবে এবং পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন বিষয়ে বিশেষভাবে জানার জন্য দেখুন, Md. Abdul Halim, "Foreign Policy : A Review', in A. M. Chowdhury and Fakrul Alam (Eds.), *Bangladesh on the Threshold of the Twenty-First Century* (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 2002), pp. 575-598, এবং Md. Abdul Halim, "Strategy, Geopolitcs and Bangladesh Foreign Policy," in Abul Kalam (ed.), *Bangladesh : Internal Dynamics and External Linkages* (Dhaka : UPL, 1996), pp. 195-210.

Go to Contents
http://thejobstudy.com

দ্বাবিংশ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক সমাজের মাধ্যম ও প্রতিষ্ঠান

THE INSTRUMENTS AND AGENCIES OF INTERNATIONAL SOCIETY*

আন্তর্জাতিক সমাজ এবং এর সদস্যসমূহ (International Society and its Members)

পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে আমরা আন্তর্জাতিক সিস্টেম তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখানে বলা প্রয়োজন যে, আন্তর্জাতিক সিস্টেম শুধু তার সদস্যদের আন্তঃক্রিয়ার যোগফলের সমষ্টিই নয়, এটা রাষ্ট্রীয় আচরণের উপযোগী কতগুলো আদর্শ উন্নয়নেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা সমসাময়িক বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত কতগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক সমাজ অনেকগুলো জাতিরাষ্ট্রের সমবায়ে গঠিত। যদি আমরা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে (United Nations Organization) মাপকাঠি হিসেবে ধরি, তবে আমরা দেখতে পাই যে, এ-মুহূর্তে (২০০৪ সনের মাঝামাঝি) এর মোট সদস্যসংখ্যা হচ্ছে ১৯১।

এ-কথা বলাই বাহুল্য যে, আন্তর্জাতিক সিস্টেম গঠনকারী রাষ্ট্রসমূহ সমমর্যাদার অধিকারী হলেও শক্তি ও সামর্থ্যের দিক থেকে তাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক বৃহৎ শক্তি (Great Power) হিসেবে স্বীকৃত এবং ঐগুলোর মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো আবার পরাশক্তি (superpower) নামে অভিহিত। বাকিগুলোর মধ্যে অনেকে মধ্যম শক্তি (Medium Power) এবং অধিকাংশই ক্ষুদ্র

* বর্তমান অধ্যায়টি লেখার ব্যাপারে আমি জোসেফ ফ্রাঙ্কেলের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (Joseph Frankel, *International Relations*, London : Oxford University Press, 1969) বইয়ের সপ্তম অধ্যায়, পৃ. ১৩৯-১৫২ থেকে বিশেষভাবে সাহায্য নিয়েছি।

http://thejobstudy.com

শক্তি (Small Power) হিসেবে পরিগণিত হয়। যেহেতু মর্গেনথুর বাস্তববাদী তত্ত্ব থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রই তার নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সর্বদা সচেষ্ট এবং তারা এ থেকে কখনও বিচ্যুত হয় না, সুতরাং এটা ধরে নেয়া যেতে পারে যে, গোটা আন্তর্জাতিক সমাজব্যবস্থা ও আলাদা আলাদা রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে স্বার্থের মিল সর্বাবস্থায় পরিলক্ষিত না হওয়াই স্বাভাবিক এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তাই-ই ঘটে। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, ইউরোপীয় কনসার্টের (Concert of Europe) বৃহৎ শক্তিগুলোর নিজ নিজ ভূমিকা ও সামাজিক ভূমিকার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। প্রায়শই দেখা যায় যে, কোন রাষ্ট্র যে-সামাজিক ভূমিকা পালনের ভান করে, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির নামান্তরমাত্র।

এভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভণ্ডামিকে স্বীকার করে নিয়েও আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা (international order) রক্ষার জন্য বৃহৎ শক্তিবর্গের সহযোগিতার প্রয়োজন এবং যদি এ-ধরনের কোন রাষ্ট্রের মৌলিক স্বার্থকে (vital interest) আঘাত করে, তবে এটা সম্ভবত কার্যকর হবে না। একটি বিশেষ রাষ্ট্রের মৌলিক স্বার্থবিরোধী কোন কাজ ঐ রাষ্ট্রটি যে-সিস্টেমের অধীনে বিরাজ করে, তার স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে না। কারণ এ-ক্ষেত্রে ঐ সিস্টেমটিই মূল্যহীন হয়ে পড়বে। অন্যদিকে যদি একবার রাষ্ট্রসমূহ আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখাকে নিজেদের মৌলিক স্বার্থ হিসেবে গ্রহণ করে, তবে তারা সংকীর্ণ স্বার্থ ও মূল্যবোধকে (value) বিসর্জন দিয়ে অনেক দূর অগ্রসর হতে পারবে।

আন্তর্জাতিক সিস্টেম পরিচালনার (operation) ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে, তত্ত্বগত দিক থেকে সমস্ত রাষ্ট্রকে সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে একই চোখে দেখা হয় যেন তারা গুরুত্বপূর্ণ সবদিক থেকে সমান বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তারা যে শুধু শক্তির দিক থেকে ভিন্ন তাই নয়, তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সংগঠন, মতবাদ ও আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে তারা যে-দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, তাতেও তাদের মধ্য পার্থক্য বিদ্যমান। তবে অন্য আরেকটি দিকে তাদের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়ার এবং তা হল এই যে, তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চায়। এরূপ অবস্থায় তাদের সবার উপর সমভাবে প্রযোজ্য এমন সুদূরপ্রসারী আচরণবিধি (code of behaviour) চাপিয়ে দিলে তা কতদূর কার্যকর হবে বলা মুশকিল। যদি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালন উপযোগী কোন আদর্শ (norm) গ্রহণ করার পর কোন বিশেষ একটি রাষ্ট্র তা ভঙ্গ করে, তবে তার সুফল থেকে সবাই বঞ্চিত হবে। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি যে, যদি আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কোন নিরস্ত্রীকরণ (disarmament) ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং কোন একটি বৃহৎ শক্তি এ-বিষয়টি অমান্য করে প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা সাধনে সক্ষম এমন অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন ও মজুদ করতে থাকে, তবে ঐ সার্বজনীন প্রচেষ্টাটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

এরূপ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, বর্তমান পৃথিবীতে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো আমাদের দেশের অতীত দিনের রাজা-বাদশাহদের মতো আচরণ

করে। তারা যে সর্বজনস্বীকৃত আচরণবিধি গ্রহণ করবে এটা আশা করা বাতুলতা মাত্র। ফলে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্র, যেগুলো কম শক্তিশালী, সেই অতীত দিনের দীনহীন প্রজার মতো শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর, বিশেষত বর্তমানে যে-পরাশক্তিটি টিকে আছে, তার মর্জির উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। তবে এটা সবারই উপলব্ধি করা উচিত যে, অতীতের রাজা-বাদশাহদের শান-শওকত কালের নিয়মে বিলীন হয়ে গেছে। ঠিক একইভাবে ক্ষুদ্র শক্তিগুলোর স্বার্থবিরোধী কাজ করে বৃহৎ শক্তিগুলো আর অধিককাল টিকে থাকতে পারবে না। ইতোমধ্যেই আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শক্তিগুলোর মধ্যে ঐক্যের বন্ধন দেখতে পাচ্ছি। রাজনৈতিক দিক দিয়ে তারা জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের (Non-aligned movement) সদস্য এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তারা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাণিজ্য ও উন্নয়নসংক্রান্ত সম্মেলনের (United Nations Conference on Trade and Development, সংক্ষেপে UNCTAD) সাথে জড়িত এবং এভাবে ৭৭-জাতি গ্রুপের (Group of 77) মাধ্যমে তারা নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা বাড়িয়ে চলেছে। তারা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, পূর্ব-পশ্চিমের বিভেদের (Division of the world between the East and the West) খেলায় ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে উত্তরের বিরুদ্ধে দক্ষিণের সংগ্রাম (Struggle of the South against the North) চালিয়ে যাওয়াই হল তাদের প্রধান কর্তব্য এবং এর মধ্যেই নিহিত আছে তাদের কল্যাণের চাবিকাঠি।

রাষ্ট্রীয় আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী আদর্শসমূহ (Norms Regulating the Behaviour of States)

এ-কথা সর্বজনবিদিত যে, কোন সমাজব্যবস্থাই তার সদস্যদের আচরণের উপর কিছু আদর্শসংবলিত সামাজিক বিধিনিষেধ আরোপ করা ছাড়া চলতে পারে না। যদি প্রত্যেকেই নিজ হাতে আইন তুলে নেয়, তবে অরাজকতার সৃষ্টি হয় এবং সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক সমাজব্যবস্থার জন্যও এ-কথাটি সমভাবে প্রযোজ্য। কারণ আন্তর্জাতিক সমাজ জাতীয় সমাজেরই বৃহত্তর রূপ, যেখানে ব্যক্তির পরিবর্তে রাষ্ট্রই এর সদস্য এবং এটা একটু শিথিলভাবে সংঘবদ্ধ।

যদিও সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আইনগত কাঠামোই হল সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা, তবু মানুষের আচরণ প্রায়শই অন্য কতগুলো অবিধিবদ্ধ আদর্শ, নৈতিকতা যেমন, প্রথা (custom), শিষ্টাচার (etiquette), অথবা প্রচলিত রীতি (fashion) দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। কোন কোন চিন্তাবিদ সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শগুলো, যেমন আইন ও নৈতিকতাকে কতগুলো অতিমানবীয় নীতিমালা থেকে আহরণ করার পক্ষপাতী হলেও এগুলো এবং অন্যান্য আদর্শকে সামাজিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য দরকারি বলে ব্যাখ্যা করা যায়। মোটামুটিভাবে আমরা বলতে পারি যে, সমস্ত বিধির প্রকৃতিকে তাদের সামাজিক গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে হবে এবং সাথে সাথে এটাও জানানো দরকার যে, এগুলো অমান্য করলে কী ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। যদি কোন বিধির সামাজিক গুরত্ব

http://thejobstudy.com

সামান্য হয়, তবে কেউ এগুলো ভঙ্গ করলে তাকে সামাজিক নিন্দার পাত্র হতে হয়। আবার যদি কোন প্রতিষ্ঠানের বা অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অনুযায়ী বিশেষ ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ দরকার হয়, তবে সে-ধরনের পোশাকপরিচ্ছদ পরিধান করে না গেলে তাকে সেখানে ঢুকতে দেয়া নাও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ আমরা কোন কূটনৈতিক সমাবেশের উল্লেখ করতে পারি। সেখানে কী ধরনের পোশাক পরিধান করে যেতে হবে, তা সাধারণত নিমন্ত্রণপত্রে উল্লেখ থাকে।

সামাজিক অনুশাসন ভঙ্গকারীর শাস্তি সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়, যে-অনুপাতে তা অন্যদেরকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত আদর্শ দেশের আইনে লিপিবদ্ধ থাকে এবং সেগুলো ঐ রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ প্রবর্তন করে থাকে। যদি কেউ সেগুলোকে বাধাদান করে অথবা অমান্য করে, তবে দেশের সরকার তাকে শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সমাজব্যবস্থার মতো আন্তর্জাতিক আদর্শের পরিধি ও প্রকৃতি আন্তর্জাতিক সমাজের প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী করে নির্ধারিত হলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতির কারণে কোন বিধি ভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রসমূহের ঐকমত্য (consensus) অপেক্ষা তাদের নিজেদের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

যেহেতু রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়া বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যকার আন্তঃক্রিয়ার চেয়ে অনেক কম বৈচিত্র্যময়, সুতরাং আন্তর্জাতিক সমাজের প্রথাসমূহ ও প্রচলিত রীতিসমূহ (conventions) বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যকার আন্তঃক্রিয়া থেকে কম জটিল ও বৃহদাকার। সাধারণত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীল সময়ে এগুলোকে মোটামুটিভাবে মেনে চলা হয়, কিন্তু কোনরকম বিপ্লব ও গণ্ডগোলের সময় এগুলোকে ইচ্ছাকৃত এবং দারুণভাবে অমান্য করা হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ১৯৮৯ সনে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানের মাধ্যমে আগের পূর্ব ও পশ্চিমের মতাদর্শের দ্বন্দ্বের (ideological conflict) আপাত-পরিসমাপ্তি ঘটলেও উত্তর ও দক্ষিণের অসমতা (inequality between the North and the South) ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। বর্তমান শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে ভিন্নমুখী সাংস্কৃতিক পটভূমি নিয়ে অনেক নতুন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আবির্ভূত হয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে গত শতাব্দীর ইউরোপীয় কূটনীতির ঐতিহ্যে গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক সামাজিক কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।

আন্তর্জাতিক নৈতিকতা (International Morality)

নৈতিকতা (morality) বলতে সাধারণত যা বুঝায় তা হল কোন কাজটি করা সঠিক এবং যার মধ্যে নিহিত আছে যে কোন কাজটি করা অনুচিত, সে সম্পর্কে সুবিবেচনা।[১]

আন্তর্জাতিক নৈতিকতার সম্প্রসারণই বিশ্ব জনমত (world public opinion)। বিশ্ব জনমত গঠনে যে বিষয়টি সবচেয়ে জরুরি তা হল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংঘটিত

বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে একই রকম দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা।[২] কেবল বিশ্বের জনগণ যদি তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যসমূহকে একক ও অভিন্ন বলে বিবেচনা করে তবে তা অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের দিকে পরিচালিত হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে এটা কদাচিৎ ঘটে যার ফলস্বরূপ আন্তর্জাতিক নৈতিকতা একটি দ্ব্যর্থক বাক্যাংশে পরিণত হয়েছে। কারণ, প্রথমত, এর অর্থ কখনও পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয় নি এবং দ্বিতীয়ত, পণ্ডিতগণ ব্যক্তিগত ও আন্তর্জাতিক নৈতিকতার আদর্শ সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত একমত হতে পারেন নি। ম্যাকিয়াভেলির অনুসারী এক শ্রেণির চিন্তাবিদ আন্তর্জাতিক নৈতিকতার অস্তিত্বকে পুরোপুরি অস্বীকার করেন; আবার কান্টের অনুসারিগণ আন্তর্জাতিক নৈতিকতাকে ব্যক্তিগত নৈতিকতার সাথে এক করে দেখেন। তবে অধিকাংশ চিন্তাবিদই আন্তর্জাতিক নৈতিকতাকে স্বীকার করে নেন, কিন্তু একই সাথে এটাকে ব্যক্তিগত নৈতিকতা থেকে ভিন্নরূপে দেখার পক্ষপাতী।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বাস্তববাদী চিন্তাভাবনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, যদিও প্রত্যেক দেশের রাজনীতিকরাই বারংবার বলে থাকেন যে, তাঁরা নৈতিক নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত, তবু আমরা এটাকে সহজে মেনে নিতে পারি না। কারণ প্রায়শই দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রেই তথাকথিত নৈতিকতার অন্তরালে নিহিত থাকে তাঁদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থপরতা। যদি কোন রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের বৈধ অধিকারকে অস্বীকার করে নিজের জন্য কোন কিছু দাবি করে, তখন সে আত্মপক্ষ সমর্থনের ক্ষেত্রে নৈতিকতাকে সুবিধাজনকভাবে কাজে লাগাতে প্রয়াস পায়। আবার অন্যদিকে কোন বিশেষ সময় বিরাজমান স্থিতাবস্থায় অসন্তুষ্ট রাষ্ট্রসমূহ এটাকে সংশোধনের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক নৈতিকতার আশ্রয় নেয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি, ভার্সাই চুক্তির (Treaty of Versailles, 1919) সংশোধনকামী জার্মান জাতি এটাকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী শক্তিসমূহের নৈতিকতাবিরোধী এবং জোর করে চাপিয়ে দেয়া একটা দলিল বলে মনে করত। একইভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিধিমতে প্রতিষ্ঠিত সীমারেখাকে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের (right of national self-determination) ভিত্তিতে প্রশ্ন করা যেতে পারে।

যাই হোক, এর অর্থ এই নয় যে, আন্তর্জাতিক নৈতিকতাকে অস্বীকারকারী ম্যাকিয়াভেলিই সঠিক। যদিও আন্তর্জাতিক নৈতিকতার ব্যাপ্তি সম্পর্কে কোন ঐকমত্যে পৌঁছা এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয় নি, তবু রাষ্ট্রের সংকীর্ণ স্বার্থপরতা আদায় করার কাজে এটাকে সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। বর্তমান যুগে, বিশেষত আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক আমলে ইউরোপীয় শক্তিসমূহের স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত অনেক আন্তর্জাতিক সীমারেখাকে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে সংশোধনের দাবিকে নৈতিকভাবে ন্যায়সঙ্গত বলে মেনে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু কোন রাষ্ট্র যদি অন্যায়ভাবে অর্থাৎ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধ আদায়ের উদ্দেশ্যে অন্য রাষ্ট্রের কোন ভূভাগ দাবি করে অথবা অতিরিক্ত প্রভাব সৃষ্টির চেষ্টা করে, তবে তাকে সমর্থন করা যায় না। এটা আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে, 'রাষ্ট্রীয় আচরণকে প্রভাবিত করার জন্য কিছু নৈতিক আদর্শকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে—এ-আচরণকে নৈতিকতার আলোকে

http://thejobstudy.com

উপলব্ধি এবং মূল্যায়ন করা হয়' (.. moral norms must be accepted as an influence upon the behaviour of states : this behaviour is perceived and evaluated in moral terms.)[৩]।

বর্তমানে কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপারে এবং রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে আগেকার মতো সুস্পষ্ট নির্ধারিত সীমারেখা নেই। উনবিংশ শতাব্দীতে শুধু রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইনের আওতাভুক্ত ছিল এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রজাবর্গের আচরণসংক্রান্ত ব্যাপারগুলো নিজ নিজ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে পরিগণিত হত। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে নাৎসিদের বর্বরোচিত আচরণ এবং যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন (violation of human rights)-কাজের সাথে জড়িত দোষী ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক আইনের আওতাভুক্ত করে ফেলেছে।

একই সাথে ব্যক্তি হিসেবে বিভিন্ন রাজনীতিকের নৈতিক ভাবাবেগকেও আমাদের মনে রাখতে হবে। এটা আমরা বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে পারি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে-রাষ্ট্র নৈতিকতার বাইরে কোন কাজ করার চেষ্টা করে না। আবার অন্যদিকে আমরা ড. রাইনহোল্ড নিইবুর (Dr. Reinhold Niebuhr)-এর যুক্তির সাথে একমত হয়ে বলতে পারি যে, 'মানুষ নিজের নৈতিক বিধিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি পর্যন্ত প্রসারিত করা দূরে থাক, সে সবসময় চেষ্টা করে এই রাজনীতিকে তার নিজস্ব নীতিহীন প্রবৃত্তির নির্গমপথ হিসেবে ব্যবহার করতে' (far from extending their moral rules to international politics, men tend to use these politics as an outlet for their immoral propensities.)[৪]।

কান্টের উক্তি হল যে, আন্তর্জাতিক নৈতিকতা ব্যক্তিজীবনকে পরিচালিত করার উপযোগী নৈতিকতার সাথে অভিন্ন এবং এটা কোন রাষ্ট্র বা ব্যক্তির কী করা উচিত, সে-সম্পর্কে ধারণা দেয়। এটা সত্যি যে, রাষ্ট্র কোন ব্যক্তি নয় এবং রাষ্ট্র পরিচালনাকারী ব্যক্তিবর্গের সর্বপ্রধান চিন্তা হল রাষ্ট্রের সুবিধা বাড়ানো। এ-ব্যাপারে নৈতিককতা তার আচরণে শুধু অস্পষ্ট সংশোধনীয় দিক্‌নির্দেশ দিতে পারে। এর বাইরে মানুষের কল্যাণের জন্য চিন্তাভাবনা—হোক সে অন্য দেশের বাসিন্দা—সর্বসম্মতভাবে গৃহীত আন্তর্জাতিক নৈতিকতার আদর্শ হিসেবে এখনও পরিপূর্ণভাবে গড়ে উঠতে পারে নি। তাই দেখা যায় যে, পৃথিবীর কোন অঞ্চলে কোন দৈবদুর্বিপাক দেখা দিলে অনেক রাষ্ট্রই তার সাহায্যের হাত প্রসারিত করে বটে, তবু এখনও পর্যন্ত অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রগুলোর ভাগ্যোন্নয়নের কাজে সহায়তা দান করার মতো নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে কোন উন্নত দেশ নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে আসে নি।

আন্তর্জাতিক আইন (International Law)

আন্তর্জাতিক আইনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ওপেনহাইম (L. Oppenheim) বলেছেন যে, 'যে-চিরপ্রচলিত সামাজিক বিধিসমূহকে সভ্য রাষ্ট্রগুলো তাদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক

বজায় রাখার ব্যাপারে বৈধভাবে অবশ্যপালনীয় বলে মনে করে, সেগুলোকে আন্তর্জাতিক আইন হিসেবে অভিহিত করা হয়' (International law may be defined as the body of customary and conventional rules which are considered legally binding by civilized states in their intercourse with each other.)[৫]। কোন দেশের অভ্যন্তরে ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ আদর্শগুলো যেভাবে 'নাগরিক আইনে' (municipal law) লিপিবদ্ধ থাকে, ঠিক সেভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করার উপযোগী আদর্শগুলো আন্তর্জাতিক আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবু নামের সামঞ্জস্য তাদের প্রকৃতির অভিন্নতা নির্দেশ করে না। আন্তর্জাতিক আইন এক ভিন্নধর্মী সামাজিক প্রেক্ষাপটে কাজ করে এবং এটা কোন সামাজিক ঐকমত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় অথবা এর আমান্যকারীকে শাস্তি প্রদান করার জন্য এখানে কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ নেই। তাই অস্টিনের (John Austin) সংজ্ঞা অনুসারিগণ একে পুরোপুরিভাবে 'আইন' হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেন। বস্তুতপক্ষে 'আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রের উপর নয় বরং রাষ্ট্রের মধ্যে কার্যকর আইন' (international law is not a law above state but one between them.)[৬]। এর অমান্যকারীর বিরুদ্ধে কার্যকর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা নেই। আন্তর্জাতিক আইনের এই ভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ করলে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও আন্তর্জাতিক আইন ব্যবস্থা যৌক্তিকভাবে অসংগত। রাষ্ট্রসমূহ যথার্থভাবে সার্বভৌম এবং এর উপর কোন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থাকতে পারে না, কাজেই তাদেরকে আইনের শাসনে বাঁধা সম্ভব নয়, অথবা যদি এ-ধরনের অস্তিত্ব থাকে, তবে রাষ্ট্রসমূহ পরিপূর্ণভাবে সার্বভৌম নয়। এই আপাত অসঙ্গতিকে 'সম্মতি তত্ত্ব' (theory of consent) দ্বারা দূর করা হয়েছে, যেখানে বলা হয় যে, আন্তর্জাতিক আইনের আদর্শগুলোর অবশ্যপালনীয় বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক স্পষ্ট অথবা মৌনভাবে গ্রহণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, আন্তর্জাতিক আইনের সত্যিকার প্রকৃতি হল সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ ও আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা।

সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক আইনের আদর্শসমূহকে নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। প্রথমত, এমন কিছু আইন আছে যেগুলোকে সোয়ার্জেনবার্গার (Georg Schwarzenberger) 'শক্তির আইন' (law of power) হিসেবে অভিহিত করেছেন। এগুলোর আওতায় পড়ে সেই বিধিগুলো, যা শক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামো বজায় রাখতে চায়। উদাহরণস্বরূপ আমরা ঐ আদর্শগুলোর উল্লেখ করতে পারি, যা রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, শান্তিচুক্তি, সীমারেখা, বিভিন্ন মৈত্রীচুক্তি ইত্যাদিকে নিশ্চিত করতে সচেষ্ট। তারপর আসে 'পারস্পরিক আদান-প্রদান সংক্রান্ত আইন' (law of reciprocity), যেগুলো রাষ্ট্রের অপেক্ষাকৃত কম রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সাথে জড়িত ব্যাপারগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। এ-সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহ সাধারণত

http://thejobstudy.com

বিনিময়ে কিছু সুবিধা পাবার জন্য নিজ স্বার্থকে অন্য রাষ্ট্রের স্বার্থের সাথে খাপ খাওয়ানোর ব্যাপারে ইচ্ছুক থাকে। আন্তর্জাতিক আদর্শের সংখ্যাধিক্য এখানেই পরিলক্ষিত হয়, যা অনেকগুলো বিষয়, যেমন কূটনৈতিক সুযোগসুবিধা (diplomatic immunities), বহিঃসমর্পণ (extradition), বাণিজ্য ও যাতায়াত ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে। পরিশেষে আমরা 'আন্তর্জাতিক সামাজিক আইনে'র (international community law) কথা উল্লেখ করতে পারি, যা এখন পর্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। উদাহরণস্বরূপ দাসব্যবসায়, বিদেশে নারীপাচার ইত্যাদির মতো জঘন্য কাজ নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা সকলের প্রশংসার দাবি করতে পারে। এ ছাড়াও বর্তমান পৃথিবীতে মৌলিক মানবাধিকার রক্ষার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ ১৯৪৮ সনের ১০ ডিসেম্বর সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (Universal Declaration of Human Rights) গ্রহণ করেছে। ঠিক এর আগের দিন অর্থাৎ ৯ ডিসেম্বর তারিখে ঐ একই সংস্থা গণহত্যা নিবারণসংক্রান্ত চুক্তিটি (Convention on Genocide) সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন করেছে। এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, আন্তর্জাতিক সামাজিক আইন ধাপে ধাপে উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

অন্য অনেক আদর্শবাদী ব্যবস্থার মতো আন্তর্জাতিক আইনের মধ্যে নিহিত আছে প্রাকৃতিক নিয়মের কতগুলো মূলনীতি, কিন্তু এর অগ্রগতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক সমীক্ষা করলে দেখা যায় যে, এটা মূলত গড়ে উঠেছে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি থেকে। আন্তর্জাতিক সমাজব্যবস্থা যদিও পুরোপুরিভাবে বিকেন্দ্রিক এবং এর কোন আইনপ্রণয়নকারী পরিষদ নেই, তবু এখানে 'চুক্তিপত্রের পবিত্রতা' (*pacta sunt servanda*) রক্ষা করার মতো মৌলিক নিয়মকানুন আছে, যা রাষ্ট্রসমূহকে পারস্পরিক লেনদেনসংক্রান্ত বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আইন উন্নয়নের ব্যাপারে সাহায্য করে। একইসাথে আবার এই ব্যবস্থাও আছে যে, যদি কোন 'গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার পরিবর্তনে'র ফলে (*rebus sic stantibus*) কোন চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রের পক্ষে এর কোন ধারা মেনে চলা সম্ভব না হয়, তবে এ ব্যাপারে তার উপর জোর করা চলবে না। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যদিও অনেক সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে 'গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার পরিবর্তনের ব্যাখ্যা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়, তবু কদাচিৎ কোন রাষ্ট্র ইচ্ছাকৃতভাবে এ-নিয়মটিকে একটি সুযোগ হিসেবে ব্যবহারের প্রয়াস পায়।

উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে, পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনের গুরুত্বকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করলেও উন্নয়নশীল দেশগুলো সনাতন আন্তর্জাতিক আইনের কিছু কিছু ধারা নিয়ে স্বভাবতই ততটা সন্তুষ্ট নয়। আমরা এর কারণ হিসেবে টোকিওতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকালে প্রখ্যাত ভারতীয় আইনবিদ্ রাধাবিনোদ পাল প্রদত্ত ভিন্নমতের (dissenting opinion) উল্লেখ করতে পারি, যেখানে তিনি যথার্থই বলেছেন যে, এ-সকল দেশের উচিত নয় 'ঐ সকল আন্তর্জাতিক আইনের ধারাগুলোতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকা, যেগুলোর সৃষ্টির ব্যাপারে তাদের হাত ছিল না এবং যেগুলো প্রায়শ তাদের স্বার্থের পরিপন্থী হিসেবে কাজ করে' (The developing nations ought not to be bound by rules of international law which they have not helped to create and which very often ran counter to their interests.)[৭]।

Go to Contents
http://thejobstudy.com

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (International Institutions)

আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যে-ভূমিকা পালন করে, এখানে শুধু সে-আলোকেই ঐ প্রতিষ্ঠানগুলো বিবেচিত হবে।

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, প্রতিষ্ঠান শব্দটি এমন কতগুলো এডহক ব্যবস্থাদি, যা আন্তর্জাতিক সম্মেলনকে অন্তর্ভুক্ত করে কোন বিশেষ ব্যাপার মীমাংসার সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু এ-নামটি সার্বক্ষণিকভাবে কার্যরত সংস্থাসমূহের জন্য বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়।

বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় ১২০০ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আছে, যার অধিকাংশই বেসরকারিভাবে কাজ করে। এর অনেকগুলোরই রাজনীতির সাথে কোন সরাসরি যোগাযোগ নেই। এর মধ্যে ১৫০টির মতো প্রতিষ্ঠান সরকারি। অর্থাৎ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার এগুলোর সাথে যুক্ত। এর মধ্যে কতগুলো আবার রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং শুধু এগুলো সম্বন্ধেই আমরা আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করার উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয় জাতিসংঘ (The League of Nations)। কিন্তু এটা তার প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়, যার ফলে আমরা দেখতে পাই যে, ঠিক দুই দশক পরেই শুরু হয় আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মারাত্মক ধ্বংসলীলা মানবসমাজকে আরেকবার ভাবিয়ে তোলে এবং বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এ-যুদ্ধ চলাকালেই ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে যুদ্ধের অভিশাপ থেকে বাঁচিয়ে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং একইসাথে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নতুন করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations Organisation) গড়ে তোলেন। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই এর সদস্য এবং এর আদর্শ মূলনীতিসমূহ মেনে চলার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন অঙ্গ (organs) নানা ধরনের কার্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ ছাড়াও এর অধীনে অনেকগুলো বিশেষ সংস্থা (specialized agencies) অনেকগুলো বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে কার্য সম্পাদন করে থাকে।

এই প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এগুলো কতটুকু কার্যকর ভূমিকা পালন করে, তা জানতে হলে ইতিহাসের আলোকে আমাদের তা বিচার করতে হবে। বাস্তবিক পক্ষে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিগত প্রায় এক শতাব্দীতে প্রবলভাবে আলোড়ন সৃষ্টিকারী শক্তি ও ধ্যানধারণাকে অনেকাংশে চিত্রিত করে।

http://thejobstudy.com

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও আন্তর্জাতিক আইনের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র আছে। যদিও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গঠন করা হয়েছে এবং রাজনীতিকরাই এগুলোর পরিচালনার সাথে জড়িত, তথাপি এগুলোর আইনগত দিককে অগ্রাহ্য করা চলে না। এ-ব্যাপারে আমরা যে-কোন প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারার আইনগত ব্যাখ্যাসংক্রান্ত বিষয়টির উল্লেখ করতে পারি।

এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বৈত ভূমিকা সংক্রান্ত মৌলিক সমস্যাটি, যা তত্ত্বগতভাবে না হলেও বাস্তবে অনেক সময় অসঙ্গতির সৃষ্টি করে। এ-ব্যাপারটি পরিষ্কার করে বলতে গেলে একদিকে আমরা দেখি যে, প্রতিষ্ঠানসমূহ কতগুলো আন্তর্জাতিক উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী যা আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার সহায়ক। অন্যদিকে সদস্যরাষ্ট্রসমূহ কতগুলো বিশেষ স্বার্থ নিয়ে এ-প্রতিষ্ঠানগুলোতে যোগদান করে এবং চায় যে, এগুলো পূর্ণ হোক অথবা অন্তত যেন লঙ্ঘিত না হয়। আদর্শগতভাবে এখানে স্বার্থের মিল থাকা উচিত, কারণ যে-কোন প্রতিষ্ঠানে সহযোগিতা রাষ্ট্রের স্বার্থসিদ্ধির সুযোগকে বাড়িয়ে তোলে, যার ফলে তার আনুষঙ্গিক অসুবিধাগুলোর দরুন যে-ক্ষতি হয়, তা পূরণ করে নেয়া সম্ভব হয়। তবে সবসময় এটা নাও হতে পারে। বর্তমান পৃথিবীতে বৃহৎ শক্তিবর্গ, বিশেষত যে-পরাশক্তিটি টিকে আছে, তাদের আগ্রাসী নীতির জন্য অথবা আন্তর্জাতিক সমাজদেহে দুষ্টক্ষত হিসেবে বিবেচিত কোন কোন রাষ্ট্রকে নৈতিক সাহায্যদানের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে তীব্র আলোচনার সম্মুখীন হলেও এগুলোকে তাদের স্বার্থের পরিপন্থী মনে না করে অন্যায্য কাজের তিক্তফল হিসেবে মেনে নেয়।

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বৈত ভূমিকাকে আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা রক্ষাকারী ও সদস্যদের জাতীয় নীতি বাস্তবায়নকারী—এই উভয় উপায় হিসেবে বিচার করতে গেলে আমাদের উচিত আন্তর্জাতিক রাজনীতির তিনটি পরিধি, যেগুলো শক্তির আইন, পারস্পরিক আদান-প্রদানসংক্রান্ত আইন ও আন্তর্জাতিক সামাজিক আইন দ্বারা পরিচালিত হয়, সেগুলো সম্বন্ধে বিবেচনা করা। আন্তর্জাতিক আইনের মতো প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রেও সাফল্য নির্ভর করে শক্তির রাজনীতি থেকে তাদের দূরত্বের সরাসরি অনুপাতের উপর। অন্য কথায় বলা যায় যে, প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন রাষ্ট্রের শক্তির অবস্থানকে যত কম প্রভাবিত করবে, ঐ রাষ্ট্রসমূহ প্রতিষ্ঠানগুলোতে সম্ভবত তত বেশি সহযোগিতা দান করবে। এ-জন্যই আমরা দেখতে পাই যে, কূটনীতিকদের সুযোগসুবিধা প্রদানসংক্রান্ত ব্যাপারটি যুদ্ধকে বিধিবর্হিভূত করা থেকে অনেক রাষ্ট্রের নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য। অনুরূপভাবে, জাতিসংঘের বিভিন্ন কার্যের একটি বিবরণী তৈরি করলে দেখা যাবে যে, শান্তিরক্ষার তুলনায় অরাজনৈতিক অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এটি বেশি সাফল্য লাভ করেছে। এ-ধরনের অভিজ্ঞতা থেকেই জন্মলাভ করেছে 'শান্তির সামাজিক পথ' (functional approach to peace) তত্ত্ব, যে-কারণে আমরা দেখতে পাই, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের তুলনায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council) বিশ্বশান্তি আনয়নের মহান দায়িত্ব অধিক সচারুরূপে পালন করেছে।

পারস্পরিক আদান-প্রদানসংক্রান্ত আইন ও আন্তর্জাতিক সামাজিক আইনের আওতাধীন বিষয়াবলির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য নির্দেশ করা কঠিন। কারণ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় যখন একটি বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছে, তখনই সেটি আন্তর্জাতিক সমাজের প্রাথমিক ধ্যানধারণার জন্ম দেয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি যে, বাণিজ্য চুক্তিতে প্রদত্ত পারস্পরিক সুযোগসুবিধার ব্যাপারটি সৎ প্রতিবেশীসুলভ মৌলিক মনোবৃত্তির সৃষ্টি করে, যা পূর্বেকার শুল্ক ও বাণিজ্যসংক্রান্ত সাধারণ চুক্তির (General Agreement on Tariffs and Trade, সংক্ষেপে GATT) অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কতগুলো সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জনের ফল ও একই সাথে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রদায়সুলভ বন্ধন জোরদার করার কাজে নিয়োজিত শক্তি হিসেবে নিবেদিত।

পাদটীকা

১. Cantor, *op. cit.*, p. 302.
২. *Ibid.*, p. 291.
৩. Joseph Frankel, *International Relations* (London : OUP, 1969), p. 145.
৪. দেখুন, ঐ. পৃ. ১৪৫-৪৬।
৫. দেখুন, Palmer and Perkins, *op. cit.*, p. 226.
৬. Frankel, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬।
৭. দেখুন, Palmer and Perkins, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯।

http://thejobstudy.com

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

বিশ্বায়ন

GLOBALIZATION

আন্তর্জাতিক অর্থনীতির বিশ্বায়ন[১] অর্থবহ পরিমাণে পাশ্চাত্যে নব্য-উদারবাদী (neoliberal) চিন্তাধারার পুনর্জাগরণের সাথে যুগপৎভাবে সঙ্ঘটিত হয়। গত শতাব্দীর সত্তর ও আশির দশকে ব্রিটেন ও বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'নতুন ডানপন্থীদের' ('New Right') রাজনৈতিক বিজয় কেইনসিয়ানবাদকে (Keynesianism), যেটা ছিল অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ সমর্থনকারী প্রথম সুসঙ্গত দর্শন, উপেক্ষা করে অর্জিত হয়েছিল। কেইনসিয়ান সূত্র অনুযায়ী, বাণিজ্য কালচক্রকে (business cycle) সুষম করতে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় সামাজিক ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে ও পূর্ব নিয়োগ বজায় রাখতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ কাম্য। নব্য-উদারবাদীগণ, যারা সর্বদা 'বাজার শক্তি'কে ('market forces') অবাধভাবে কাজ চালিয়ে যেতে দিতে ও অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রকে যতটুকু সম্ভব নিম্ন পর্যায়ে ভূমিকা পালন করতে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন, আধুনিক কল্যাণকর রাষ্ট্রকে 'পিছু হটে যেতে' ('roll back') দিতে ইচ্ছুক ছিলেন, এবং এ প্রক্রিয়ায় যুদ্ধোত্তর সময়ব্যাপী অধিকাংশ পাশ্চাত্য রাষ্ট্রে যে সামাজিক গণতান্ত্রিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে থাকেন।

পাশ্চাত্যের সরকারগুলোর দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতার প্রতি অধিকতর, এবং কল্যাণ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি নিস্পৃহ মনোভাবমূলক মতাদর্শগত পক্ষপাতিত্বপূর্ণ আচরণের কারণে বিশ্বায়নের শক্তিসমূহ, বিশেষভাবে আর্থিক ব্যাপারে ও মুদ্রা বাজারের নিয়ন্ত্রণমুক্তিকে সম্মুখপানে এগিয়ে নেবার অগ্রাধিকার, বাজারকে নিয়ন্ত্রিত করতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রচণ্ডভাবে হ্রাস পায়, এমনকি তা প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি হয়।

Go to Contents
http://thejobstudy.com

এতদ্‌সত্ত্বেও বিশ্বায়নকে নিয়ে উদারবাদী ও পরিসংখ্যানবিদগণ মোটামুটি এক গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কে লিপ্ত। প্রথমোক্তগণ বিশ্বাস করেন যে এটা মূলগতভাবে পুঁজিবাদের একটি নতুন পর্যায়, কিন্তু শেষোক্তগণ ও ধরনের দাবির ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেন। উদারবাদীগণ অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনা ও সংগঠিত করতে জাতীয় সীমানার ক্রমবর্ধমানভাবে অপ্রাসঙ্গিকতার প্রতি সকলের সৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁদের আকর্ষণের মূল কেন্দ্রবিন্দু হল অবাধ বাণিজ্যের প্রসারণ, জাতীয় সীমানা অতিক্রম করে কার্য পরিচালনাকারী কর্পোরেশনসমূহর (Transnational Corporations, সংক্ষেপে TNC) জন্য এগুলোকে কার্যপরিচালনা করতে দিবার অনুমতিদানকারী দেশের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি ও সেখানকার জাতীয় আইনগত প্রক্রিয়ার থেকে নিষ্কৃতি পাবার সামর্থ্যদান। এবং জাতীয় ও ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ থেকে পুঁজিকে অবাধ করে দেয়া। অন্যদিকে, সন্দেহবাদীগণ দাবি করেন যে বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে (যেটা একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেও চালু আছে) বিশ্ব উনবিংশ শতাব্দীর চেয়ে কম অবাধ ও বিশ্বায়িত। তাঁরা স্মরণ করিয়ে দেন যে বিশ্ব অর্থনীতির আকারের সাথে বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমাণকে তুলনা করলে দেখা যায় যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অনুপাত ১৯১৪ সনে যা ছিল তখনও তাই আছে। একই সাথে তাঁরা এটাও স্বীকার করেন যে উনিশ শত সত্তরের দশকের শুরুর দিকে ব্রেটন উডস্ ব্যবস্থা (Bretton Woods system) ভেঙে পড়ার সময় থেকে স্বল্প-মেয়াদি ফট্‌কামূলক পুঁজির স্থানান্তরের যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটেছে তা জাতীয় সরকারসমূহের পরিকল্পনা প্রণয়নের বাছাই ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে।

আন্তর্জাতিক অর্থনীতির বিশ্বায়নের ফলে দেখা যায় যে অনেক উন্নয়নশীল দেশে, যে অঞ্চলগুলোতে কম মজুরিতে অসংখ্য শ্রমিক পাওয়া যায় ও কাঁচামালের সহজলভ্যতা আছে, বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো (Multinational Corporations, সংক্ষেপে MNC) শিল্প-কারখানাসমূহ বিস্তৃত করেছে। এগুলোর মালিকানার অধিকারী ও সেইসাথে সদর দফতরসমূহ যেখানে অবস্থিত সেই পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশগুলোর প্রত্যাশা যে উন্নয়নশীল দেশসমূহ তাদের দেয়া মুক্ত বাজার ব্লুপ্রিন্ট, যা জনসাধারণ্যে 'ওয়াশিংটন ঐকমত্য' ('Washington Consensus')[২] নামে পরিচিত, অনুসরণ করে নিজস্ব অর্থনীতিকে বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্তকরণ, আর্থিক ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণমুক্তি, সরকারি ব্যয় ও বাজেটের ঘাটতি কমানো, সরকারি-মালিকানাধীন কল-কারখানাসমূহকে ব্যক্তি-মালিকানায় ছেড়ে দেয়া, বিদেশী পণ্যের উপর শুল্ক-ধার্যের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা ও সাবসিডি প্রদানের বিলুপ্তিকরণ, রপ্তানিমুখী অর্থনীতি গড়ে তোলা ইত্যাদি কার্যক্রম হাতে নিবে, অন্যথায় জরুরি প্রয়োজনীয় সাহায্য ও অর্থ-কড়ি আটকিয়ে রাখার ঝুঁকির সম্মুখীন হবে। এভাবে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির খেলায় নেতৃস্থানীয় খেলোয়াড়গণ (অর্থাৎ পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশসমূহ) যে অবাধ বাণিজ্যের প্রবক্তা হিসেবে নিজেদের জাহির করে সেখানে তারা এর বিনিময়স্বরূপ নিজেরা তাদের দেশকে উন্নয়নশীল দেশসমূহের পণ্যের জন্য উন্মুক্ত করে দেয় না, এবং তার চেয়েও

http://thejobstudy.com

অধিক পরিতাপের বিষয় হল যে এ কম শক্তিশালী খেলোয়াড়দের, যেগুলোকে তাদের আজ্ঞাধীন রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়, অর্থনৈতিক উন্নয়নকে নিয়ন্ত্রিত করতে এটাকে মতাদর্শগত অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে।

বিশ্বায়নের বর্তমান পর্যায়ে জাতীয় অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বকে অনেকটা বিসর্জন দিতে হয়েছে, তবে যেখানে পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশগুলো তা করেছে আগ্রহের আতিশয্যে, কিন্তু উন্নয়নশীল দেশসমূহ তা দিতে নারাজ হওয়া সত্ত্বেও তাদের নিকট থেকে এটা প্রায় জোর করে কেড়ে নেয়া হয়েছে। সার্বভৌম শক্তি এখন বণ্ডের অধিকারী, তহবিল ব্যবস্থাপক, মুদ্রা ব্যবসায়ী, ফাট্‌কাবাজ এবং বহুজাতিক ব্যাংক ও বীমা কোম্পানির হাতে চলে গেছে। এর ফলাফল হয়েছে যে বিশ্ব অর্থনীতি আন্তর্জাতিক রণকৌশলগত পরিবেশ সদৃশ হয়েছে। চরিত্রগত দিক থেকে এটা অরাজক অবস্থায় পৌঁছেছে এবং এর পরিণতিস্বরূপ অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য প্রতিযোগিতা রণকৌশলগত নিরাপত্তা অন্বেষণের মত তীব্র আকার ধারণ করেছে।[৩]

কক্স (Robert W. Cox) যেভাবে উল্লেখ করেছেন, অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের কয়েকটি ফলাফল হল এটি ধনী ও দরিদ্রকে দুটো বিপরীত মেরুতে বিভক্ত করেছে, সামাজিক ক্ষেত্রে সদাচার প্রদর্শনকে ক্রমবর্ধমানভাবে বিরল করে তুলেছে, সুশীল সমাজের (civil society) অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে এবং এর পরিণতিতে অপাংক্তেয় অনুভূতি দ্বারা তাড়িত রাজনৈতিক নেতৃত্বের উত্থান ঘটছে যারা মনে করেন যে তাঁরা সাধারণ জনগণের স্বার্থ ও অভিমতকে প্রতিনিধিত্ব করছেন। চরম ডানপন্থী এ সকল নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য হল বিদেশীদের সম্বন্ধে ভীতি ও ঘৃণা ছড়ানো এবং বর্ণবাদী গ্রুপসমূহকে মদদ দান করা যা সুস্থ জীবনযাপনের পথে চরম অন্তরায়।[৪]

বর্তমান বিশ্বে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া, যা তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশকে গ্রাস করে ফেলার উপক্রম করেছে, এ প্রক্রিয়াটিকে এ গ্রন্থের সর্বশেষ অধ্যায়ে এসে শুধু তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হবে।[৫]

সমসাময়িক অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, যার মাধ্যমে বিশ্বায়ন নামক আপাত-আকর্ষণীয় প্রক্রিয়াটি সম্ভবপর হয়েছে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করছে এবং বাস্তববাদী চিন্তাধারাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে কিছুসংখ্যক চ্যালেঞ্জ রাখছে। বর্তমান অধ্যায়ের শুরুতেই যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ্বায়নের সেই বিভিন্ন কার্যক্রমকে উনিশ শত সত্তরের দশক থেকে নব্য-উদারতাবাদের প্রাধান্য এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির পড়ন্ত অবস্থায় পতিত হওয়া এ উভয়ের নজির হিসেবে দেখা হয়।

অধিকন্তু, বহুজাতিক কর্পোরেশন ও বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্প্রদায়ের মত অরাষ্ট্রীয় কর্মকদের (non-state actors) ক্রমাগত গুরুত্ব অর্জন সম্পর্কে বলা যায় যে সেগুলো শুধু যে জাতীয় অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বকে বিপদ্‌গ্রস্ত করছে তাই নয়, উদারতাবাদীদের মতে সেগুলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিসমূহের ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক নির্ভরশীলতা (interdependence) এবং এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের শান্তিপূর্ণকরণেও নজির। অনেক উদারতাবাদীর নিকট বিশ্বায়ন 'রাষ্ট্রীয় সীমানাবিহীন

বিশ্ব' ('borderless world')-এর অনুকূল পূর্বলক্ষণ যেটাকে প্রতিনিধিত্ব করে তা হল কূটনীতির প্রকৃতিকে পরিবর্তনের সাথে সাথে আন্তর্জাতিক সিস্টেমের কাঠামোকেই রূপান্তরিত করে ফেলা।

এতে আশ্চার্যান্বিত হবার কিছু নেই যে এ অগ্রগতিসমূহ ও এগুলোকে বেড়ে উঠতে যে ধ্যান-ধারণাসমূহ সাহায্য করে সেগুলো বাস্তববাদী চিন্তাধারাকে বিরাট রকমের চ্যালেঞ্জ জানায়। যা হোক, মাত্র অতি সম্প্রতি ওয়াল্টয (Kenneth Waltz), ক্রেসনার (Stephen Krasner) ও জিলপিনের (Robert Gilpin) মত নব্য-বাস্তববাদীগণ নব্য-উদারবাদী এ চ্যালেঞ্জের জবাব দিয়েছেন। তাঁদের খণ্ডনকারী যুক্তিতে কয়েকটি পৃথক উপাদান আছে, কিন্তু এগুলোকে ক্রেসনারের এ দাবি দিয়ে সংক্ষিপ্তরূপে প্রকাশ করা যায় যে, "বিশ্বায়ন যে সুসম্বদ্ধভাবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে ধ্বংসসাধনের চেষ্টা করছে অথবা নীতি ও কাঠামোসমূহকে সমপ্রকৃতির পথে চালিত করেছে এমন নজির নেই। বস্তুত, বিশ্বায়ন ও রাষ্ট্রীয় কর্মতৎপরতা যুগপৎভাবে অগ্রসর হয়েছে" ("there is no evidence that globalization has systematically undermined state control or led to the homogenisation of policies and structures. In fact, globalization and state activity have moved in tandem.")।[৬]

প্রথমত, অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন কতটুকু পরিমাণে সত্যিকারভাবে একটি বিশ্ব প্রপঞ্চ সে ব্যাপারে নব্য-বাস্তববাদীগণ সন্দেহপ্রবণ। বিশ্বায়নের শক্তিসমূহ দ্বারা যে তুলনামূলকভাবে অক্ষত রয়ে গেছে বিশ্বের এ রকম অঞ্চলের নিদর্শন হিসেবে তাঁরা আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, রাশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থান নির্দেশিত করেন। বিশ্বায়নের অভিজ্ঞতা সর্বাধিক পরিমাণে হয়েছে পাশ্চাত্য জগতে।

দ্বিতীয়ত, যদি বাণিজ্য ও পুঁজির সঞ্চালনকে মোট জাতীয় আয়ের (Gross National Product, সংক্ষেপে GNP) শতকরা কত ভাগ সে হিসেবে মাপা হয়, তবে বিশ্বে অর্থনৈতিক পারস্পরিক নির্ভরশীলতার পর্যায় ১৯৯৯ সনে যতটুকু তা ১৯১০ সনে যা ছিল আসন্নভাবে তার সমান।[৭] যদি পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে শ্রমের সহজ চলাচলের সূচক দ্বারা মাপা হয় তবে সংখ্যাটি এমনকি নিচে নেমে আসে, এবং তা আরও অধিক নিচে নেমে আসে যদি এটাকে রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সামরিক নির্ভরতা দ্বারা মাপা হয়। সুতরাং যদি দাবি করা হয় যে সমসাময়িক বিশ্বে অর্থনৈতিক পারস্পরিক নির্ভরশীলতা অভূতপর্যায়ে পৌঁছেছে তবে তা নব্য-বাস্তববাদীদের মনে তেমন প্রভাব ফেলে না। তাঁদের এটা স্বীকার করে নিতে আপত্তি নেই যে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে উন্নতি ঘটেছে তার ফলে বিশেষভাবে অর্থ বাজার সত্যিকারভাবে বিশ্বায়নের আওতায় এসেছে। এর পরিণতিস্বরূপ, এ ক্ষেত্রটিতে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও নিয়ন্ত্রণের হ্রাস হয়েছে। যা হোক, তাঁরা এ দিকটিকেও নির্দেশিত করেন যে আর্থিক বাজার বর্তমানে যতটুকু একীভূত (integrated) ১৯০০ সনেও কমপক্ষে হলেও ততটুকুই ছিল। তার চেয়েও বড় কথা হল যে সমগ্র বিশ্বের অর্থনৈতিক উৎপাদনের শতকরা অংশ হিসেবে উনবিংশ শতাব্দীতে পুঁজির স্থানান্তর বর্তমান পর্যায়ের চেয়ে অনেক বৃহত্তর ছিল।

http://the obstudy.com

তৃতীয়ত, শুধু বাজার অর্থনীতির মডেল টিকিয়ে রাখার পর্যায়ে সমৃদ্ধির জন্ম দিবে বলে উদারতাবাদীদের যে দাবি তার জবাবে ওয়াল্টয তাঁদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে উনিশ শত ত্রিশ ও পঞ্চাশের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রবৃদ্ধির হার ছিল বিশ্বের সর্বাধিকগুলোর অন্যতম এবং একইভাবে ঐ শতাব্দীর সত্তর ও আশির দশকে জাপানের ক্ষেত্রেও তদ্রুপ ছিল যখন ব্যবসাদারী মনোবৃত্তিসম্পন্ন (mercantile) আইন-দ্বারা এক সংস্থাভুক্ত হবার মডেল চালু ছিল। ঐতিহাসিকভাবে, 'একই আকার-বিশিষ্ট ব্যবহার্য জিনিস সকলের ক্ষেত্রেই মানানসই হবে' ('one size fits all') এরূপ ধারণা যেভাবে সত্যি প্রমাণিত হয়নি সেভাবে রাজনৈতিক অর্থনীতির অনুরূপ মডেল, যাকে বর্তমানে 'ওয়াশিংটন ঐকমত্য' বলা হয়, অর্থনৈতিক আধুনিকায়ন অথবা সাফল্যজনক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য একমাত্র অনুসরণীয় পথ হতে পারে না।

নব্য-উদারবাদীদের পরিসংখ্যানগত উপাত্ত-বিরোধী মনোভাব গ্রহণকেও ন্যায্য প্রতিপন্ন করা কঠিন। তাঁরা এ সত্যটি ভুলে যান অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে অগ্রাহ্য করেন যে নির্দিষ্ট সীমারেখা দ্বারা আবেষ্টিত সার্বভৌম রাষ্ট্রই অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উচ্চ পদমর্যাদাকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে সর্বোত্তম সংগঠন।

নব্য-বাস্তববাদীগণ উদারতাবাদীদের স্মরণ করিয়ে দেন যে অধিকতর পছন্দযোগ্য রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের ধরন হিসেবে জাতি-রাষ্ট্রের কোন গুরুতর প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। শুধু জাতি-রাষ্ট্রই এখনও পর্যন্ত তার নাগরিকদের রাজনৈতিক আনুগত্য আকর্ষণ করতে অথবা তাদের মধ্যকার বিরোধসমূহে বিচারপূর্বক রায় দিতে পারে। এবং সমস্ত সম্প্রদায়কে আন্তর্জাতিক আইনের বাধ্যবাধকতার অধীন করতে জাতি-রাষ্ট্রেরই একচেটিয়া কর্তৃত্ব আছে। ক্রেসনার যেভাবে চমৎকার যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, জাতি-রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের সকল গঠনমূলক অংশ বিশ্বায়নের নিকট সমানভাবে অসহায় নয় যে সহজে আঘাত পেয়ে সেগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাবে।[৮]

চতুর্থত, কিছুসংখ্যক উদারবাদী আমাদের যতটা বিশ্বাস করতে বলেন অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ততটা বিশ্বায়িত নয়। বৃহত্তম অর্থনীতিসমূহ তাদের অধিকাংশ বাণিজ্য নিজেদের অভ্যন্তরীণ বাজারেই পরিচালনা অব্যাহত রেখেছে। উদারহণস্বরূপ মার্কিন অর্থনীতি শতকরা ৯০ভাগ পণ্য ও সেবা রপ্তানি বাজারে পাঠানোর জন্য নয়, বরং মার্কিনিদের নিজেদের ভোগের জন্য উৎপাদন করে। ইউরোপের নেতৃস্থানীয় অর্থনীতিসমূহের জন্যও সংখ্যাটি অনুরূপ এবং যদি কোথায় সম্পদ, ব্যবস্থাপনা, মালিকানা, সদর দফতর এবং গবেষণা ও উন্নয়নের (Research and Development, সংক্ষেপে R & D) জন্য অর্থ বরাদ্দ প্রধানত অবস্থিত এ পরিভাষা অনুসারে বিচার করা হয় তবে দেখা যায় যে বহুজাতিক কর্পোরেশনসমূহকে প্রথমে যতটা বিশ্বায়িত বলে মনে করা হয় সেগুলো ততটা বিশ্বায়িত নয়। জনসাধারণ্যে সেগুলো সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করা হয় তা সত্ত্বেও এগুলো অনেকাংশে নিজভূমে শিকড় গেড়ে আছে।

পরিশেষে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে উপযোগী অবস্থায় রূপায়িত করতে সকলে তাঁদের নিকট থেকে যেটা প্রত্যাশা করে সে অনুযায়ী নব্য-বাস্তববাদীগণ রাষ্ট্রসমূহের

Go to Contents
http://thejobstudy.com

সামরিক শক্তিকে আরও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেন। এ সম্পর্কে ওয়াল্টয যথার্থই বলেছেন যে, "আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আড়াআড়িভাবে একটির সাথে অন্যটি অথবা সেগুলোকে ছাপিয়ে গিয়ে কার্যসম্পাদনকারী অর্থনৈতিক শক্তিসমূহ দিয়ে নয়, তাদের মধ্যকার সামর্থ্যের পার্থক্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়।" ("The most important events in international politics are explained by differences in the capabilities of states, not by economic forces operating across states or transcending them.")।[৯] গত শতাব্দীর প্রথম দিককার উঁচু পর্যায়ের অর্থনৈতিক পারস্পরিক নির্ভরশীলতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে প্রতিরোধ করতে পারেনি। একইভাবে, ঐ শতাব্দীর শেষ দিকে যুগোশ্লাভিয়ার ভাঙনের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক সংহতি দিয়ে সে ভাঙনকে প্রতিরোধ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। যখন যুদ্ধকে বাধা দানের ব্যাপারটি চলে আসে তখন নব্য-বাস্তববাদীদের কোন সন্দেহ থাকে না যে পরস্পরের সাথে ভাগাভাগি করে নেয়া অর্থনৈতিক স্বার্থাবলির চেয়ে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র অধিকতর কার্যকর। ওয়াল্টয তাই মনে করেন যে "সামর্থ্যের অসম বণ্টন আন্তর্জাতিক রাজনীতি অনুধাবনের চাবিকাঠি হিসেবে এখনও বিরাজমান" ("The uneven distribution of capabilities continues to be the key to understanding international politics.")।[১০]

পাদটীকা

১. এ অধ্যায়টি লেখার ব্যাপারে আমি মূলত Scott Burchill, *et al.*-এর গ্রন্থটির উপর নির্ভর করেছি।
২. 'ওয়াশিংটন ঐকমত্যের' দ্বারা সাধারণত কি বুঝানো হয় তা জানার জন্য দেখুন, মোঃ আবদুল হালিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ১৩৪-১৩৬।
৩. *cf :* John T. Rourke, *International Politics on the World Stage* (Dushkin/Mcgraw. Hill, Sixth Edition, 1997), p. 78.
৪. Richard Devetak, "Critical Theory," in Burchill, *et al. op., cit.*, p. 170.
৫. বিশ্বায়নের অন্যান্য দিক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য দেখুন, হালিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ১৫৫-১৬৫।
৬. Quoted by Scott Burchill, "Realism and Neo-realism," in Burchill, *op. cit.*, p. 95.
৭. *Ibid.*, p. 96.
৮. *Ibid.*
৯. Quoted in *Ibid.*, p. 97.
১০. Quoted in *Ibid.*

http://thejobstudy.com

Job Study
To make you prepared & confident

গ্রন্থপঞ্জি

BIBLIOGRAPHY

১. Graham T. Allison, *Essence of Decision : Explaining the Cuban Missile Crisis* (Boston : Little, Brown, 1971).
২. Scott Burchill, *et al.*, *Theories of International Relations* (New York : Palgrave, 2nd. edition, 2001).
৩. Robert D. Cantor, *Contemporary International Politics* (St. Paul : West Publishing Co., 1986).
৪. Nazli Choucri and Robert C. North, *Nations in Conflict : National Growth and International Violence* (San Francisco : W.H. Freeman & Co., 1975).
৫. Inis L. Claude, Jr., *Power and International Relations* (New York : Random House, 1962).
৬. Karl Deutsch, *The Analysis of International Relations* (New Jersey : Prentice-Hall, 1968).
৭. Adi H. Doctor, *International Relations : An Introductory Study* (New Delhi : Vikas Publications, 1969).
৮. Jack Donnelly, *International Human Rights* (Boulder, Colorado : Westriew Press, 2nd edition, 1998).
৯. James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, *Contending Theories of International Relations* (New York : Harper & Row Publishes, Inc., 2nd edition, 1981).
১০. V.V. Dyke, *International Politics* (New York : Appleton Century Crofts, 1957).
১১. Joseph Frankel, *International Relations* (London : Oxford University Press, 1969).
১২. Frederick A. Hartman, *The Relations of Nations* (New York : Macmillan, 1962).
১৩. Stanley Hoffmann (ed.), *Contemporary Theory in Inernational Relations* (New Jersey : Prentice-Hall, 1967).

Go to Contents
http://thejobstudy.com

১৪. K. J. Holsti, *International Politics : A Framework for Analsis* (New Jersey : Prentice-Hall, Fifth Edition, 1988).
১৫. Francis W. Hoole and Dina A. Zinnes (eds).), *Quantitative International Politics : An Appraisal* (New York : Praeger Publisher, 1976).
১৬. Russell Warren Howe, *Weapons : The International Game of Arms, Money and Diplomacy* (New York : Doubleday & Co. Inc., 1980).
১৭. Morton Kaplan, *Systems and Process in International Politics* (New York : Wiley, 1957).
১৮. Charles W. Kegley and Eugene R. Wittkopf, *World Politics : Trend and Transformation* (New York : St. Martin's Press, Fifth edition, 1995).
১৯. R. C. Kent and G. P. Nielsson (eds.), *The Study and Teaching of International Relations* (London : Frances Pinter [Publishers] Ltd. 1980).
২০. Robert Keohane and Joseph S. Jye. Jr., *Power and Interdependence* (Boston : Little, Brown, 1977).
২১. Klaus Knorr and James N. Rosenau (eds.), *Contending Approaches to International Politics* (Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 1969).
২২. Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions* (Chieago : University of Chicago Press, 1962).
২৩. Walter LaFeber, *America, Russia and the Cold War, 1945-1996* (The McGraw-Hill Co., Inc., eighth edition, 1997).
২৪. Charles O. Lerche, Jr., *Principles of International Politics* (New York : Oxford University Press, 1956).
২৫. Charles O. Lerche, Jr. and Abdul A. Said, *Concepts of International Politics* (New Delhi : Prentice-Hall of India Private Ltd., 1972).
২৬. Robert J. Lieber, *Theory and World Politics* (Cambridge, Massachusetts : Winthrop Publishers, Inc., n. d.).
২৭. William H. Meyer, *Human Rights and International Political Economy in Third World Nations* (Westport, Connecticut : Praeger, 1998).
২৮. Karen Mingst, *Essentials of International Relations* (New York : W.W. Norton & Co., 1999).
২৯. Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations : The Struggle for Power and Peace* (Calcutta; Scientific Book Agency, 1969).
৩০. J. A. Naik, *A Textbook of International Relatons* (Delhi : The Macmillan Company of India Ltd., 1978).
৩১. Robert C. North and Richard Lagerstrom, *War and Dominaton : A Theory of Lateral Pressure* (New York : General Learning Press, 1971).
৩২. F. S. Northedge (ed.), *The Foreign Policies of the Powers* (London : Faber & Faber, 1968).
৩৩. A. F. K. Organski, *World Politics* (New York : Knopf, 1968).

http://thejobstudy.com

৩৪. Norman J. Padelford and George A. Lincoln, *International Politics* (New York : The Macmillan Co., 1954).
৩৫. Norman J. Padelford, George A. Lincoln and Lee D. Olvey, *The Dynamics of International Politics* (New York : Macmillan Co., 1976).
৩৬. Norman D. Palmer and Howard C. Perkins, *International Relations : The World Community in Transition* (Calcutta : Scientific Book Agency, 1970).
৩৭. Frederic S. Pearson and J. Martin Rochester, *International Relations : The Global Condition in the Late Twentieth Century* (New York : McGraw-Hill Publishing Co., 2nd edition, 1998).
৩৮. Dennis Pirages, *Global Technopolitics : The International Politics of Technology and Resources* (Pacific Grove, California : Brooks/Cole Publishing Co., 1989).
৩৯. James N. Rosenau (ed.), *International Politics and Foreign Policy : A Reader in Research and Theory* (New York : The Free Press, 1969).
৪০. James N. Rosenau, (ed.). *In Search of Global Patterns* (New York : The Free Press, 1976).
৪১. James N. Rosenau, Vincent Davis and Maurice East (eds.), *The Analysis of International Politics* (New York : The Free Press, 1972).
৪২. Bruce Russett and Harvey Starr, *World Politics : The Menu for Choice* (San Francisco : W. H. Freeman & Co., 3rd edition, 1989).
৪৩. Abdul A.Said (ed.), *Theory of International Relations : The Crisis of Relevance* (New Delhi : Prentice-Hall of India Private Ltd., 1969).
৪৪. Georg Schwarzenberger, *Power Politics* (New York : Frederick A. Praeger, 1951).
৪৫. J. David Singer (ed.), *Quantitative International Politics : Insights and Evidence* (New York : The Free Press, 1968).
৪৬. Richard C. Snyder, H. W. Bruck and Burton Sapin (eds.), *Foreign Policy Decision-Making* (New York : Free Press of Glencoe, 1963).
৪৭. Michael P. Sullivan, *International Relations : Theories and Evidence* (New Jersey : Prentice-Hall, 1967).
৪৮. Raymond Tanter and Richard H. Ullman (eds.), *Theory and Policy in International Relations* (Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 1972).
৪৯. Paul Viotti and Mark Kauppi, *International Relations Theory* (New York : Macmillan Publishing Co., 1987).
৫০. Quincy Wright, *The Study of International Relations* (New York : Appleton Century Crofts, 1955).

Go to Contents
http://thejobstudy.com

Job Study
To make you prepared & confident